আশাপূর্ণা দেবী

সেরা ছয়টি উপন্যাস

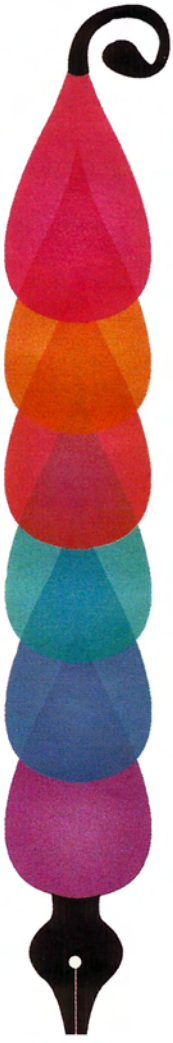

সেরা
ছয়টি উপন্যাস

সেরা
ছয়টি উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

সম্পাদনা
নূপুর গুপ্ত

সাহিত্যম্ ।। কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

সাহিত্যমের নব সংযোজন

গত ২০০৮ সালে যে লেখিকার জন্মশতবর্ষের সূচনা হয়েছিল, সেই শুভসূচনার শুভলগ্ন লেখিকার রচনার উৎসমুখ যেন উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। যার ফলে ২০০৯ সাল থেকে অবিরল ধারায় তাঁর রচনা সংকলন প্রকাশ হয়ে চলেছে।

সাহিত্যম্ প্রকাশন সংস্থা এই কৃষ্টির সামিল হয়ে উপন্যাস ও ছোট গল্পের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে তাঁরা ছ'খানি উপন্যাস নিয়ে আর একটি সংকলনের প্রয়াস করেছেন। উপন্যাসগুলি হল— বিবাগী পাখি; শুধু তারা দু'জন; নতুন প্রহসন; ততোধিক; দুই নায়িকা এবং কুমিরের হাঁ।

এইগুলির মধ্যে বিবাগী পাখি ও কুমিরের হাঁ প্রকাশিত হয় ১৯৬৮তে। দুই নায়িকা ও শুধু তারা দু'জন সংকলনে। নতুন প্রহসন ও ততোধিক যুগলবন্দী নামক গ্রন্থে ১৯৬৬তে।

উল্লিখিত উপন্যাসগুলি পুনরায় প্রকাশ করে সাহিত্যম্ প্রকাশন সংস্থা পাঠকের কাছে নতুন করে পরিতৃপ্তির আয়োজন করেছে।

আশা করা যায় পাঠকদের ভালো লাগবে।

ধন্যবাদান্তে—

নূপুর গুপ্ত

২৭.০৬.২০১১
১৭ কানুনগো পার্ক, গড়িয়া
কলকাতা-৮৪

সূচিপত্র

বিবাগী পাখি	...	...	৯
শুধু তারা দু'জন	...	...	৫৫
নতুন প্রহসন	...	...	৮৭
ততোধিক	...		১২৫
দুই নায়িকা	...	...	১৫৯
কুমিরের হাঁ	...	...	২০৫

বিবাগী পাখি

মেয়েটার বয়েস বছর চোদ্দ-পনেরোর কম নয়, কিন্তু খাটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের কারসাজিতে অধিকারী তাকে 'দশে' নামিয়েছে।

তবু যেটুকু সন্দেহ আসতে পারত, সেটুকুও মেরে নেওয়া হয়েছে কোমরে ওই চওড়া জরির কোমরবন্ধটাকে কষে বেঁধে দিয়ে। ওটার জন্যেই বিশেষ করে বালিকা বালিকা লাগে। তা ছাড়া ভঙ্গিটাও লিলির নিতান্তই বালিকাসুলভ। যেন মনটাকেও সে ওই খাটো স্কার্ট, আঁটো জ্যাকেট আর চওড়া কোমরবন্ধের দেওয়ালের মধ্যে আটকে রেখেছে। পুরনো কালের চীনের মেয়েদের লোহার জুতোয় পা আটকে রাখার মতো।

অধিকারীকে সবাই 'অধিকারীমশাই' বললেও 'ভবানী অপেরা'র অধিকারী কুঞ্জলাল দাস সেই সম্বোধনটাকে খুব না-পছন্দ করে। বলে, 'মিস্টার দাস বললে কি হয়? কি হয়?'

হ্যাঁ, 'মিস্টার' শব্দটা বিশেষ পছন্দ কুঞ্জলালের। কারণ নিজেকে সে 'প্রোপ্রাইটার' বলে থাকে। তা বলবার অধিকার তার নেই তা নয়।

প্রোপ্রাইটার দাসের 'ভবানী অপেরা' শুধু মফস্বর শহরেই 'নাম' কিনে বেড়ায় না, কলকাতার যাত্রা প্রতিযোগিতার উৎসবে এসেও নাটক দেখিয়ে মেডেল নিয়ে যায়।

পৌরাণিক পালার দিকে মন নেই কুঞ্জর, সামাজিক নাটক নামায় সে। সমাজের সর্ববিধ অনাচার কদাচারকে লোকের সামনে তুলে ধরে তার ওপর চাবুক মেরে দেখাতে চায় কুঞ্জ, কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে সমাজ, কী পরিমাণ দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছে দেশ?

তাই কুঞ্জর পালাগুলির নাম সাধারণত এই ধরনের হয়—'ভণ্ডামীর মুখোস', 'একেই কি বলে দেশসেবা?', 'দুঃখীর রক্ত', 'নিরন্নের কান্না', 'চাবুক', 'কষাঘাত' ইত্যাদি।

কুঞ্জ অধিকারী যে কতবড়ো বুকের-পাটাওয়ালা লোক একথা টের পাওয়া যায় ওই সব পালা দেখলে। রাজা-উজির থেকে শুরু করে, দারোগা, দেশ নেতা, কালোবাজারী বা অসতী নারী, সব্বাইকে এক তরোয়ালে কাটে কুঞ্জ, এক চাবুকে দাগে। কাউকে রেয়াত করে না।

শোনা যায় কোথায় নাকি কোন্ বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে একখানা পালা নামিয়েছিল কুঞ্জ, যার নাম ছিল 'দুঃশাসন' এবং যার নায়ক ছিল এক পুলিশ ইনস্পেক্টর। সাদা বাংলায় দারোগাবাবু।

বলা বাহুল্য সে নাটকে দারোগাবাবুদের প্রীত হবার মতো উপকরণ ছিল না। আর ভাগ্যের খেলায় সেখানে দর্শকের আসনে এক দারোগাবাবু উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ওই উদ্যোক্তাদের কোনো মাননীয় আত্মীয়, আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

'দুঃশাসন' নামটি শুনেই তিনি মহাভারতের পৃষ্ঠায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও ভয়ঙ্কর একটি 'রক্তপান উৎসব'-এর অপেক্ষায় স্পন্দিত হচ্ছিলেন। কিন্তু অভিনয় শুরু হতেই কেমন যেন চাঞ্চল্য অনুভব করতে থাকেন দারোগাবাবু, তারপর মাঝপথে হঠাৎ 'রে রে' করে তেড়ে ওঠেন। আর সেই 'রে রে' করার প্রতিক্রিয়ায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের অভাব প্রায় পূর্ণ হয়।

দারোগাবাবুর চিৎকার, সমবেত জনগণের প্রবল প্রতিবাদ, আর শিশুকুলের কান্না, সব মিলিয়ে সে একেবারে কেলেঙ্কারি চরম। দারোগাবাবু দাপিয়ে বেড়ান—'আমি ওই অধিকারী শা-কে অ্যারেস্ট করব, ওকে আমি ঘানি টানাব, ওকে ওর বাবার বিয়ে দেখাব, ওর 'যাত্রাপালা' করে বেড়ানো জন্মের

শোধ ঘোচাব', ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ একজন ক্ষমতামদমত্ত ব্যক্তির আগুন-জ্বলে-ওঠা মাথায় যা যা বলা সম্ভব সবই বলে চলেন। ওদিকে নাটক পণ্ড হওয়ায় অগণিত অসহিষ্ণু দর্শক হই-চই করতে থাকে।

কিন্তু সহসা এক নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে।

বুক ভর্তি মেডেলে সুসজ্জিত গর্বদৃপ্ত প্রোপ্রাইটার কুঞ্জ দাস এসে কথার ভণিতায় একেবারে ঠাণ্ডা করে দেয়।

কুঞ্জ দাস এসে দাঁড়ায়, তার বুকের উপরকার মেডেলগুলো আলোয় ঝকমকিয়ে ওঠে, আর পিছন থেকে একটা লোক সেই আদ্যিকালের গ্রামোফোনের চোঙ একটা বাড়িয়ে ধরে কুঞ্জর মুখের কাছে।

কুঞ্জ তার ভিতর থেকে আবেদন জানায়, 'গরিবের মা-বাপ দারোগাসাহেব, অ্যারেস্টই করুন, আর ফাঁসিই দিন, কোনো আপত্তি নেই, দয়া করে শুধু আপনার সামনে একখানা প্রশ্ন নিবেদন করতে দিন।'

হঠাৎ এই বাজখাঁই নিবেদনে গোলমালটা উদ্দামতা হারায়, কৌতূহলী জনতা কান খাড়া করে সেই 'প্রশ্নখানি'-র আশায়। দারোগাবাবুও হঠাৎ একটু থিতিয়ে যান। আর 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস'-এর চোঙ বলে চলে, 'অপরাধটা আমার কোথায় বলতে পারেন আজ্ঞে? মানছি আমার নাটকে একজন পাজী বদমাস ঘুষখোর দারোগার চরিত্র-চিত্রণ করা হয়েছে। যে লোকটা হাতে-পাওয়া ক্ষমতাবলে যত পারছে বেআইনী কাজের সাহায্য করে তার বিনিময়ে মোটা মোটা টাকা উৎকোচ নিচ্ছে। আছে আমার নাটকে এমন চরিত্র। কিন্তু বাবুমশায়, বলুন একবার, সেই লোক কি আপনি? আপনার চরিত্র কি এত নীচ? বলুন? বলুন, আমার 'দুঃশাসন'কে দেখে কি আপনার নিজের প্রতিবিম্ব বলে মনে হচ্ছে? তা যদি হয়, আমাকে এখুনি গুলি করুন, মানীলোকের মানের ক্ষতি করেছি, এই ভেবে কান মুলতে মুলতে মরব।

কিন্তু বাবুমশায়, আমার প্রশ্নখানার জবাব দিয়ে তবে গুলি করতে হবে। বলুন নাটকের এই চরিত্র আপনকার প্রতিবিম্ব বলে মনে হচ্ছে?

বক্তব্য এবং বক্তব্যের ভাষায় দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে। আর দারোগাবাবুর মুখ লাল হয়ে ওঠে?

কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনে ডাকহাঁকটা সামলাতে হয় তাঁকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বলেন তিনি, 'আমার কথা হচ্ছে না, কিন্তু এভাবে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরের গায়ে কালি ছিটানো মানেই পুলিশ জাতটাকে অপমান করা।' স্বজাতি প্রেমবিগলিত দারোগাবাবু কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তোলেন। বলেন, 'সেই অবমাননার অপরাধে তোমার নামে চার্জ আনব আমি।'

তথাপি কুঞ্জ দাস ভয়ে ভীত হয় না।

কুঞ্জ দাস আবার চোঙের পিছনে মুখ রাখে, আর চোঙের মুখে খন্‌খনে গলায় বলে চলে, 'চার্জ আপনি আমার নামে একটা কেন, একশোটা আনতে পারেন বাবুমশায়, আপনিই যখন ইনচার্জ, চার্জের ভাঁড়ারটাই তো আপনকার হাতে। কিন্তু তাহলেও আবার একখানা প্রশ্ন রাখতে হয় বাবুমশায়। প্রশ্নখানা হচ্ছে, অধম কুঞ্জ দাসকে চার্জে ফেলার আগে এ প্রমাণটা দিতে পারবেন কি 'সমগ্রো' পুলিশ বিভাগে কোথাও ঘুষ নেওয়া নেই, চোর বদমাসদের সাহায্য করা নেই, গাঁটকাটা, পকেটমারদের সহায়তা করা নেই?...জবাবটা স্যর দিতেই হবে।...তারপর আমি আছি, আপনি আছেন, আর আপনার চার্জ আছে।'

দারোগাবাবুর মাথার মধ্যে সমুদ্র-রোল। দারোগাবাবুর কানের মধ্যে হাসির কল-কল্লোল। এই ভণিতা, এই বাক্‌চাতুরী, এর সঙ্গে লড়তে পারবেন তিনি? পারতেন, শুধু 'দুজনে মুখোমুখি' হলে,

মাথার ঘিলু বার করে দিতেন অধিকারীর। কিন্তু এখানে সহস্র লোক। আর অন্তরলোকে অনুভব করতে পারেন, সেই সহস্রের ঊনসহস্রই অধিকারীর পক্ষে।

কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে থাকা চলে না? দারোগাবাবু তাই যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে বলে ওঠেন, 'এক-আধটা বেচাল লোক সর্বত্রই থাকে অধিকারী, কাজেই তামা-তুলসী নিয়ে শপথ করতে পারিনে। তথাপি আমি নিশ্চয়ই আপত্তি তুলব, এভাবে যাত্রা-থিয়েটারের মধ্যে সেই একজনকে টেনে এনে 'ইয়ে' করা। কথা জোগায় না বলেই 'ইয়ে' দিয়ে সারেন দারোগাবাবু। তারপর চেঁচিয়ে বলেন, 'থানায় তোমায় যেতেই হবে।'

'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস'-এর চোঙ্ আবার খনখনিয়ে ওঠে, 'সে তো বুঝতেই পারছি স্যর! আপনকার যখন হুকুম। তবে এটাই বুঝছি না স্যর, আমার এই নাটকে এই যে একটা অতি কুচরিত্র মেয়েছেলের পার্ট রয়েছে, যে নাকি নিজের স্বামীকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করছে, কই তাকে দেখে তো এখানের এই শত শত মা-লক্ষ্মীদের মধ্যে কেউ আপনার মতো ক্ষেপে উঠলেন না? কই বলে উঠলেন না তো—'যেহেতু ও মেয়েছেলে, সেই হেতু আমাদের গায়ে অপমানের কালি এসে লেগেছে!' তবে সাধ্যমতো বলি—বলবেন কেন? ওনারা—আমাদের সতীসাধ্বী মা-জননীরা জানেন, নাটক-নবেলের কাজই এই! মন্দকে চোখে ধরিয়ে দেওয়া। পাপকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা! ওনারা ওই বদ মেয়েছেলেটাকে মোটেই 'স্ব-জাতি' বলে মনে করছেন না। তাই ওনারা নীরবে নাট্যদৃশ্য দেখছেন! তা সে যাক—এখন বলুন বাবুমশায়, নাটক বন্ধ করে এই দণ্ডে আপনকার সঙ্গে থানায় যেতে হবে, না নাটকটা আজ্ঞে শেষ করে যাব? তবে পালিয়ে আমি যাব না। বলুন, এখন আপনার কী আদেশ?'

দর্শককুল এতক্ষণ যাত্রাপালার বদলে তর্জার লড়াইয়ের আস্বাদ অনুভব করে চুপ করে ছিল। এবার তুমুল হট্টগোল ওঠে, 'নাটক হোক! পালা চলুক!'

দারোগাবাবু এই উন্মত্ত গণদেবতার দিকে তাকান, তারপর 'আচ্ছা ঠিক আছে—' বলে গট গট করে বেরিয়ে যান।

তুমুল হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে আবার ভাঙা-পালা জোড়া লাগে। দর্শকরা হাততালি দিয়ে দিয়ে হাতে ব্যথা ধরিয়ে ফেলে।

বলাবাহুল্য পরে দারোগাবাবু তাকে 'দেখে নেবার' চেষ্টাই আর করেননি।

এই। এই বুকের পাটা আর বাক্‌চাতুরীর জোরেই কুঞ্জ দাস দলের লোকগুলোকে মুঠোয় পুরে রেখেছে। নচেৎ—জগতের যত 'শাসন-শোষণ-নিপীড়ন'-এর দৃশ্য তুলে তুলে সমাজের চৈতন্য করিয়ে দিতে আসে বলেই যে কুঞ্জ নিজে ওই দোষগুলির বাইরে, তা নয়। দলের লোকদের উপর কুঞ্জর ব্যবহার দারোগার বাবা-সদৃশ। তবে মারধর করে না সে।—কাউকেই না।

ওই লিলিটা তো সেই তিন চার বছর বয়েস থেকে অধিকারীর কবলে, বলুক দিকি মার কোনোদিন খেয়েছে? অধিকারীর শাসননীতি অন্য ধরনের। সে হাতে মারে না, ভাতে মারে। খেতে না দেওয়া হচ্ছে তার প্রধান শাসন। তাছাড়া—খাটানো। সেও এক রকম শাসন। যে যেদিন অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তার ওপর দলের সমস্ত লোকের রান্নার ভার পড়ে, কাঠ কাটা, জল তোলা, বাসন মাজার ভার পড়ে। বামুনের ছেলে হলেও রেয়াত নেই।

ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে কেউ প্রতিবাদ তুললে, কি গোঁজ হয়ে থাকলে, অধিকারী তার মিষ্টমধুর বচন ঝাড়ে।—

'বামুনের ছেলে? অ্যাঁ, কী বললি? বামুনের ছেলে? ওরে বাপধন, সেই দৈব ঘটনাটা এখনও মনে রেখেছিস? ভুলে যা বাপ ভুলে যা! মনে রাখলে শুধু যন্ত্রণা। ওরে তুই যে একদা বামুনের ঘরে জন্মেছিলি, সেটা সেরেফ দৈবাতের ঘটনা। মানুষের পেটে কখনও কখনও যেমন তে-পয়ে জীব

জন্মায়, একটা মাথা দুটো ধড়, আজব প্রাণী জন্মায়, তেমনি!...'বামুনের ছেলে! বাসন মাজব না—' শুনে হাসিতে যে পেট গুলিয়ে উঠছে রে! বলি—জাত তোর এখনও আছে? বামুনের ছেলের যা যা কত্তব্য করিস সব? ত্রিসন্ধে গায়ত্রী? স্বপাক হব্বিষ্যি? বল? বল বাপ!'

আশ্চর্য! তথাপি রাগ করে চলে যাওয়ার ঘটনা প্রোপ্রাইটার কুঞ্জ দাসের দলে বিরল ঘটনা! ওই বাক্য সুধা পানের পর অপরাধী ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়ে অধিকারীর নির্দেশিত কাজই করে। টিকেও যায়।

তবে শাস্তিস্বরূপ দৈবাৎ ভাত বন্ধ করলেও এমনিতে কুঞ্জর এখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা দস্তুরমতো ভালো! আর সে খাওয়ায় পক্ষপাতিত্ব নেই। অধিকারী নিজে যা খায়, শতরঞ্জি গুটোবার চাকর কেষ্ট বাগ্দীও তাই খায়।

ওই যে লিলি, যাকে না কি সবাই ব্যঙ্গ করে বলে থাকে, অধিকারীর 'পুষ্যিপুত্তুর', তারও ওই একই বরাদ্দ। ভালো আয়োজন হল তো 'ভালো', আর সুবিধে অসুবিধেয় আয়োজন খারাপ হলে 'খারাপ'।

আদুরে খুকি লিলি কোনো কোনো দিন আদুরে গলায় বলে, 'চচ্চড়ি আমি খাব না।' ডাল ভাত আমার বিচ্ছিরী লাগে, আমি শুধু মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।'

অধিকারী তার জোড়া বেণীর একটাকে টেনে তাকে কাছে নিয়ে এসে বলে, 'বুঝলাম, খাবে। ডালভাত তোমার রোচে না, তাই শুধু মাছের ঝোল ভাত খাবে। কিন্তু বলতো যাদু, কেন তা খাবে? কিসের দাবিতে? সবাই যা করছে, তুমি তাই করছ! মাঝে মাঝে পার্ট করছ, আর কি? আর কিছু নয়। তবে? ভাবছ যে অধিকারীর আদুরী আমি, আমার জোর বেশি, কেমন? ভুল! ভুল মাইডিয়ার, একেবারে ভুল! এই প্রোপ্রাইটার কুঞ্জ দাসের কাছে একচোখোমি পাবে না, সব সমান! তুমি এখনও পর্যন্ত চুল গুটিয়ে ছেলে সাজছ, তোমার দক্ষিণে কম। যখন চুল এলিয়ে হিরোয়িন সাজবে, তখন দক্ষিণে বাড়বে। ব্যস্!'

তবে মন ভালো থাকলে আর সময় থাকলে যখন পাকা চুল তুলতে ডাকে লিলিকে, তখন একটু প্রশ্রয় দেয়। চোখ বুজে বুজেই বলে, 'এবারে পুজোয় কি নিবি বল? আনারসী শাড়ি? ঘুন্টিদার জুতো? লাল রিবন? আচ্ছা আচ্ছা, হবে।'

আবার কোনো সময় গল্পও করে কুঞ্জ লিলির সঙ্গে। 'কেষ্টা হতভাগা কতবড়ো হতভাগা জানিস? সেদিন নাকি শতরঞ্জির ওপর কোন্ বাবু ভাইয়ের একখানা মানিব্যাগ পড়ে ছিল, ছোঁড়া নাকি সেটা বিপিন সরকারের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছে! দেখ তবে কতবড়ো মুখ্যু আর হতভাগা! নিয়ে নিতিস, কে দেখত শুনি?'

লিলি ঠিকরে উঠে বলে, 'ভগবান দেখত।'

'ভগবান! ও বাবা! সে লোকটা আবার দেখতে পায় নাকি? সে তো বোবা কালা অন্ধ রে!'

'কক্খনো না, ভগবান সব দেখে! এই যে তুমি সবাইকে এত কষ্ট দাও, ভগবান নিশ্চয় দেখতে পায়।'...আহ্লাদী! আহ্লাদী বলেই এতটা বলতে সাহস পায়।

তা এ রকম সময় কুঞ্জ দাস বিশেষ শাসন করে না। হয়তো শুধু বলে, 'পায়? দেখতে পায়? তবে তো তোকে কাল উপোস করিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিতে হয়।'

লিলি উত্তেজিত গলায় বলে, 'কেন? কেন শুনি? আমার সঙ্গে কি?'

অধিকারী মোলায়েম গলায় বলে, 'ভগবান তো দেখবে? দেখে আমার কি শাস্তি করে, সেটাই দেখতে চাই।'

লিলি রেগে বলে, 'শাস্তি কি আর এ জন্মে হয়? পরের জন্মে হবে শাস্তি।'

'পরের জন্মে?' অধিকারী হা হা করে হেসে উঠে বলে, 'তবে নির্ভয় রইলাম। পরের জন্মে তো

গরু গাধা ঘোড়া ছাগল এই রকমই একটা কিছু হবই, মনিবে পিটুনি দিয়ে দিয়ে খাটিয়ে নেবে, এ তো পড়েই আছে।'

লিলি গম্ভীরভাবে বলে, 'ভালো কাজ করলে আসছে জন্মে বামুন হতে পারতে তুমি।'

'বামুন? ওরে সর্বনাশ।' কুঞ্জ দাস কানে হাত দেয়, 'তা হলে তো কাজের ছায়া মাড়ানো বন্ধ করতে হয়।'

'বামুনের ওপর তোমার অ্যাতো রাগ কেন বল তো? অধিকারীর পাকা চুল তোলার শেষে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে, লিলি আদুরে গলায় বলে, 'সবাই বলে তুমি নাকি বামুন বেছে বেছে দলে নাও, আর তাদের ওপর অত্যাচার কর!'

'বলে বুঝি?' কুঞ্জ এবার গলা ছেড়ে হাসে। 'বলেছে তোর কাছে? বামুন ব্যাটাগুলো আচ্ছা ধূর্ত তো! ধরে ফলেছে সব!'

ওদিকে নিমাই, জগবন্ধু, সনাতন, বিপিন, ব্রজ, সবাই চোখ টেপাটেপি করে, 'কর্তার মেজাজ খুব শরিফ দেখছি! 'পুষ্যিপুত্তর' বুঝি পাকাচুল তুলতে গেছে?'

'এখনও খুকি করে রেখে দিয়েছে। ব্যাপার কি বল দিকি? ইচ্ছে করলেই তো একটা 'মেন' পার্ট দিতে পারে?'

'দেবে না। মতলব আছে ভেতরে ভেতরে।'

'কী মতলব বল দিকি?'

ব্রজ সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে, 'বিয়ে দেবে। কন্যে দানের পুণ্যি কুড়োবে! এখন খুকি সেজে বেড়াচ্ছে, নয়তো নাটকে 'বালক' সাজছে, লোকের চোখে পড়ছে না। শাড়ি পরে নাটকে অবতরণ করলেই তো হয়ে গেল! সবাই চিনে ফেলবে। বিয়ের বারোটা বেজে যাবে।'

'বিয়ে দেবে?' নিমাই হি হি করে হাসে, 'দেবে তো আমার সঙ্গেই দিক না বাবা? দিব্যি সুন্দরী, ঢং ঢাংও জানে খুব।'

'তুই তো বামুন?'

'বামুন! হ্যাৎ!' নিমাই বলে, 'বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া। দেয় তো লুফে নিই।'

'দেবে না।' সনাতন বিচারকের রায়ের মতো অমোঘ ভঙ্গিতে বলে, 'তুই বামুন বলেই দেবে না।'

'আচ্ছা, কেন বল দিকি? বামুনের ওপর ওর এত জাতক্রোধ কেন?'

'জানিসনে বুঝি?' বিপিন ওরই মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, আর বিপিন সবচেয়ে পুরনো। তাই বিপিন জ্ঞান দেয় ওদের, 'ওর পরিবার যে ওদের দেশের এক বড়লোক বামুনের ছেলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলিনি তোদের এ কথা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলে বটে একদিন। কিন্তু সেটা কি সত্যি?'

'অসত্যির কী আছে? জগতের কোথাও কারুর বিয়ে-করা বৌ পর-পুরুষের সঙ্গে কুলের বার হয় না?'

'তা বলছি না! তবে—'

বিপিন বলে, 'আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক তো! ওর বিত্তান্ত আমিই বেশি জানি। বৌ পালিয়ে গেল, বছর পাঁচেকের একটা মা-মরা ভাগ্নে ছিল সেটা মরে গেল। ও তাই ঘটিবাটি তুলে গ্রাম ছেড়ে একটা যাত্রার দলে ঢুকল। 'মাধব অধিকারী'র যাত্রার নাম শুনেছিস? না, নামকরা খুব নয়, তবে ছিল তখন। সেইখানে ওর হাতেখড়ি। তা ও নাকি নিজে একখানা পালা লিখে নিয়ে গিয়েছিল—'নারী না নাগিনী?'। বলেছিল, সেইটা আসরে নামাতে। অধিকারী বলত, 'দেখব দেখব', দেখতে গা করত না। একদিন বলল, 'দেখেছি, অখাদ্য!' ব্যস হঠাৎ আমাদের কর্তা চটেমটে খুব বচসা

লাগিয়ে দিল, রাগের মাথায় খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে, অধিকারীর মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে নিজে দল খোলবার তাল করে বেড়াতে লাগল। তারপর তো এই দেখছিস?

'তা পালা তো আর লেখে না কই নিজে?'

'না! বোধহয় বুঝেছে অখাদ্যই হয়েছিল।'

নিমাই মিটি-মিটি হেসে বলে, 'নারী না নাগিনী?' নিজের সেই লক্ষ্মীছাড়া বৌটার কাহিনি নয় তো?'

'হতে পারে।' বিপিন বলে, 'আমারও সে সন্দেহ ছিল। তবে বলিনি কোনোদিন কিছু। কি জানি মুখে মুখে ছড়িয়ে যদি দুর্বাশার কানে যায়। আমি যে ওর ইতিহাস জানি, ওর পাশের গাঁয়ের লোক, কিছুই বলিনি কোনোদিন। বললে কোপে পড়ে যাব কিনা কে জানে। ...এই আজ হঠাৎ তোদের কাছে বলে ফেললাম, দেখিস যেন পাঁচ কান না হয়।'

ওরা সবাই একযোগে হেসে ওঠে। বলে, 'পাঁচ কান? সে তো হয়েই বসে আছে। নিমাই, জগবন্ধু, সনাতন, ব্রজ আর বিপিনদা তুমি নিজে, পাঁচ দু'গুণে দশ কান!'

'আরে বাবা, অধিকারীর কানে না গেলেই হল—' বিপিন বলে, 'রাগলে দুর্বাসা'—'

এই রকম আলোচনার ক্ষেত্রে হঠাৎ লিলি এসে দাঁড়ায়। বেল্ট বাঁধা কোমরে একটা হাত দিয়ে মহারানীর ভঙ্গিতে বলে, 'কী হচ্ছে কি তোমাদের? কাজকর্ম নেই?'

বিপিন বিরক্ত গলায় বলে, 'আছে কি নেই তাতে তোর দরকার কিরে ছুঁড়ি? তুই নিজের চরকায় তেল দিগে না।'

'আমার চরকা?' লিলি হি হি করে হাসে। 'আমার চরকায় তো তেল দিয়ে এলাম এতক্ষণ ধরে? একশো তিনটে পাকা চুল তুলেছি।'

'আর, তুললি না কেন? মাথা বেল করে দিগে না?' বিপিন রেগে রেগে বলে।

লিলি কিন্তু রাগে না। সে ঘাগরা ঘুরিয়ে একটা পাক খেয়ে বলে, 'বলে দেব প্রোপ্রাইটার'কে।'

'দিগে যা, লাগানি-ভাঙানী-খোসামুদী!'

লিলি এবার রেগে ওঠে। বলে, 'দেখ বিপিনদা, ভালো হবে না বলছি! তোমরা এখানে আড্ডা দিচ্ছ, তোমাদের হাসিতে প্রোপ্রাইটার মশাইয়ের ঘরের ছাত ফাটছে। তাই আমাকে বলে দিল, যা তো লিলি, দেখে আয় তো বাছাধনেদের এত ফূর্তি কিসের? কাজকর্ম নেই? উচ্চ হাসির বান ডাকিয়েছেন একেবারে!'

ব্রজ এই 'পুষ্যিপুত্তুর'টিকে একেবারে দেখতে পারে না। তাই রুক্ষগলায় বলে, 'কেন? তোর প্রোপ্রাইটারের অধীনে যারা আছে, তাদের কি হাসতেও মানা?'

'তা আমি কি জানি?' লিলি তার একটা গোড়ালির উপর দেহের সব ভারটা চাপিয়ে আবার এক পাক ঘুরে নিয়ে বলে, 'জানি না বাবা! প্রোপ্রাইটার আমায় পাঠাল তোমাদের শাসন করতে, তাই এলাম।'

নিমাই চড়া গলায় বলে, 'তা হয়েছে তো শাসন করা? এবার যা আমাদের নামে লাগাতে-ভাঙাতে?'

'ভালো হবে না বলছি, নিমাইদা!' লিলি নিতাইয়ের লম্বা লম্বা চুলের মুঠিটা একবার ধরে নাড়া দিয়ে বলে, 'সব সময় তুমি আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।'

ব্রজ একটা ছ্যাবলা মার্কা হাসি হেসে বলে, 'নিমাইবাবুর তো সেই তাল। সব সময় যাতে তোর সঙ্গে লেগে থাকতে পারে, সেই আশায়—'

বালিকা লিলি চেঁচিয়ে ওঠে, 'কেন? কেন সব সময় আমার সঙ্গে লাগতে আসবে? বলে দিচ্ছি গিয়ে—'

লিলি চলে গেলে এরা বলে, 'খুকিপনা আর গেল না!'

'যাবে কোথা থেকে? কর্তামশাইয়ের পুষ্যিপুত্তুর যে!'

'হুঁ তারপর দেখিস, খুকিটি হঠাৎ কোনোদিন কার সঙ্গে ভেগে পড়ে। সেই জ্যোচ্ছোনাবালার কথা মনে আছে তো? সে তো আর কর্তার পুষ্যিকন্যা ছিল না। কর্তা তাকে খাইয়ে পরিয়ে বড়োটি করেছিল অলক্ষ্যে ভোগে লাগাবে বলে, ব্যস্ চোদ্দ না পার হতেই নীল পাখি পালক গজিয়ে ফুড়ুৎ!'

'এই জগবন্ধু, ওকথা বলছিস কেন? কর্তার আর যাই দোষ থাক, ও দোষ নেই।'

'নেই, তোকে বলেছে। জ্যোচ্ছোনাকে কী রকম আগলাত মনে নেই? কারুর সঙ্গে একটু হেসে কথা কয়েছে কি মার-মার কাট্-কাট্! ওটি কি শুধু শুধু হয় বাবা! স্বার্থ চিন্তা থাকলেই তবে হয়।'

'ওটা কর্তার স্বভাব! মেয়েছেলেকে একচুল বিশ্বাস করে না! ছেদ্দাও করে না। নববালা, বাসমতী, এদের কী রকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দেখেছিস তো? নেহাত কারে পড়ে দলে রাখতে হয় তাই, নচেৎ সেই আদ্যিকালের মতোন ব্যাটাছেলেগুলোকে গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজাতে পারলেই বোধহয় বাঁচত ও।'

তা কথাটা ওদের মিথ্যে নয়, অধিকারীর মনোভাবটা প্রায় সেই রকমই। বলেও যখন তখন— 'দলের মধ্যে পাঁচটা মেয়েছেলে পোষা কি কম ঝকমারি? একশোটা ব্যাটাছেলের যা না ঝঞ্ঝাট, একটা মেয়েছেলের জন্যে তা ঝঞ্ঝাট। কী করব, কালের গতিকে না রাখলেই নয়। এখন যে সব বায়োস্কোপ-দেখা চোখ হয়েছে বাবু বিবিদের! গোঁফ কামানো মুখ নিয়ে শাড়ি পরা দেখলেই হাসির হররা উঠে যাবে।'

দেখতে পারে না কুঞ্জ। একটা মেয়েকেও দেখতে পারে না। কাজেই তার সম্পর্কে 'স্বভাব দোষের' কথাটা নেহাতই গায়ের জ্বালা থেকে উদ্ভূত।

জ্যোৎস্না নামের মেয়েটাকে যে আগলে বেড়াত, সে শুধু সন্দেহ বাতিকে, আর শাসনেচ্ছু হয়ে। তবু রক্ষা করতে পারল না জ্যোৎস্নাকে, সে একটা তবলচীর সঙ্গে পালাল।

কুঞ্জ দাস যখন টের পেল, তখন কিন্তু লাফালাফিও করল না, 'মার-মারও' করল না। শুধু বলল, 'যে যার উপযুক্ত কাজই করেছে। 'কাঁঠালে মাছি' কি আর কাঁঠালী চাঁপায় বলতে যাবে? পচা কাঁঠালেই বসেছে।'

তবু আবারও মেয়ে নিতে হয়েছে প্রোপ্রাইটার মিস্টার দাসকে। এখনকার নায়িকা হচ্ছে চারুহাসিনী। নববালা আর বাসমতী গিন্নিদের পার্ট প্লে করে। তাদের নিতে কারো মাথা ব্যথা নেই, শুধু কুঞ্জ দাসের আছে কড়া শাসন। খাও দাও কাজ করো, ব্যস! আড্ডা, গল্প, ভালোবাসাবাসি, এসব চাও তো কেটে পড়ো।

শুধু এই আদুরী মেয়েটা? লিলি! তার প্রতি যে অধিকারীর কী ভাব বোঝা শক্ত। কখনও মনে হয় বেজায় প্রশ্রয় দিচ্ছে, কখনও মনে হয়, নাঃ ওসব কিছু নেই, সকলের প্রতিই সমান অপক্ষপাত অধিকারীর।

তবে লিলির জীবনটা একটু অদ্ভুত বইকি! সে জানে না কখন তাকে মাথায় তোলা হবে, আবার কখন তাকে পায়ে ছেঁচা হবে। হয়তো সেই জন্যেই লিলি 'বালিকা' থাকাটাকেই নিরাপদ মনে করে। তাতে মান অপমানের প্রশ্নটা কম থাকে। কখনও দলের মেয়েদের সঙ্গে হি হি করে, ছাঁচি পান চেয়ে খায়, ঝাল ঘুগনী এনে দেবার জন্যে বায়না করে, কখনও অধিকারীর তরফ হয়ে পাকাচোখা বুলিতে শাসন করে।

তা ওই দলের লোকেরা লিলিকে মুখে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখাক, মনে মনে না মেনে পারে না। কারণ অধিকারীর 'পুষ্যি কন্যে'। সময় অসময় তাই তোয়াজও করতে হয় তাকে।

তোয়াজ করে না শুধু বরুণ। ওই ব্রজ বিপিনের দল থেকে সে সম্পূর্ণ পৃথক। আর থাকেও সে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে। বরুণ 'পার্ট প্লে' করে না, বরুণ 'পালা' লেখে। বরুণের তাই কুঞ্জ দাসের কাছে

বিশেষ খাতির। একমাত্র বরুণকেই কুঞ্জ কখনও উঁচু কথাটি বলে না, কখনও 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' করে না।

বরুণের প্রতি কুঞ্জর যেন গুরুপুত্রের ভাব। কারণটা হয়তো ক্ষমতাবানের প্রতি অক্ষমের মুগ্ধতা। যে ক্ষমতা নিজের মধ্যে থাকবার ইচ্ছে কুঞ্জর, সে ক্ষমতা নেই তার। অথচ সেটা বরুণের কাছে।

কুঞ্জর ভিতরে ভাবের জোয়ার, অথচ সে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা নেই তার। বিপিনের কথা যদি সত্যি হয় তো কুঞ্জ অধিকারীর প্রথম এবং শেষ রচনা 'নারী না নাগিনী?'

কিন্তু বরুণের কলম হচ্ছে সাধা কলম। ধরলেই সফল। যাই ধরুক। কুঞ্জ বরুণের এই অপূর্ব শক্তিতে অভিভূত! তাই কুঞ্জ তার ভাব আর ইচ্ছে ব্যক্ত করে, আর অনুরোধ জানায়, 'লিখে ফেলো লেখক, এটা নিয়ে লিখে ফেলো। খুব জ্বলন্ত ভাষায়। সমাজের এই দুর্নীতি, বজ্জাতি, ওর ওপর দু'ঘা চাবুক বসানো দরকার। ব্যস্ শুরু হয়ে যায় লেখা।

কুঞ্জ দেখে সে যা চেয়েছিল ঠিক তাই। অথচ বুঝিয়ে বলতে কতটুকুই বা পেরেছিল সে? শুধু ইচ্ছে প্রকাশ করা! বরুণ যেন মনের ভিতরের কথা টেনে বার করে সুন্দর আর সহজ করে স্বচ্ছন্দে লিখে দেয়। কুঞ্জ আশ্চর্য হয়ে ভাবে, কই আমি তো এত সব গুছিয়ে বলিনি? অথচ যত শুনি ততই মনে হয় ঠিক, ঠিক এইটাই বলতে চাইছিলাম। নিজের মনের কথা লোকে না হয় লিখতে পারে, কিন্তু অপরের? অপরের মনের কথা লেখে কেমন করে? তা ছাড়া বরুণের ভাষার জোর কত! বরুণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা কত! আগাগোড়া পালাটাই যেন হীরে চুনী পান্না! মুহুর্মুহু হাততালি পড়ে কি আর সাধে? 'ভবানী অপেরা'র যাবতীয় মহিমার মূলে বরুণ। সেই বরুণকে পুজ্যি করবে না 'ভবানী অপেরা'র প্রোপ্রাইটার? তবে নাটকের নামকরণের ভারটি কুঞ্জর নিজের হাতে। এইটি তার নিজের এলাকা। মনে মনে আর একটি সংকল্প আছে কুঞ্জর, সেটা আজ পর্যন্ত ব্যক্ত করোনি কারও কাছে।

কিন্তু কুঞ্জর কি তাহলে মনের কথা বলবার কেউ নেই? সত্যিই কুঞ্জ নারীসম্পর্ক বর্জিত? তবে কুঞ্জ সুযোগ-সুবিধে পেলেই আমতা লাইনের কোন্ একটা গণ্ডগ্রামে যায় কেন? তা কুঞ্জ দাসকে জিগ্যেস করবে কে? 'আমতা লাইনের ওই গ্রামটায় তোমার কি কাজ?' এ কথা জিগ্যেস করতে গেলে তো চাকরি যাবে!

এই পালাদারদের যদি 'আসল বাস' বলে কিছু থাকে তো কুঞ্জর আসল বাস কাটোয়ায়। সম্প্রতি এদিক ওদিক ঘুরে এসে, কিছুদিন আবার কাটোয়ায় স্থিতু হয়েছে কুঞ্জ। আর নতুন একটা নাটক লেখা চলেছে।

কোণের দিকের একখানা ঘরে কুঞ্জতে আর বরুণেতে চলছে নিভৃত পরামর্শ। হাতের কাছে কোনো 'বায়না' নেই বলে ব্রজ আর বিপিন ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। বাসমতী গেছে তার গুরুপীঠ নবদ্বীপে। জগবন্ধুর এই কাটোয়াতেই বোনের বাড়ি, তাই এখানে যখন থাকা হয়, জগবন্ধু বোনের বাড়িতেই থাকে, খায়। কাজেই দল এখন হালকা, কাজকর্ম কম।

নিমাইয়ের হাতে কিছু টাকা ধরে দিয়েছে কুঞ্জ, বলেছে, 'তোতে আর সনাতনেতে পালা করে দোকান বাজার করবি, নববালা রাঁধবে, ব্যস্! কোনো যেন গণ্ডগোল শুনি না, দু'বেলা যেন ঠিক সময়ে খাবার পাওয়া যায়। এই হচ্ছে আমার সাফ্ কথা। বেতিক্রম হলে কুরুক্ষেত্তর করব।'

অতএব ঠিক মতো কাজ চলে। কারণ কুরুক্ষেত্তর করবার ক্ষমতা যে কুঞ্জর আছে, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যারা পড়ে আছে, তাদের তিন কুলে কেউ নেই বলেই তো পড়ে আছে।...তারা তো সন্ত্রস্ত থাকবেই।

তবে কুঞ্জ এবার মনের সুরটি বদলেছে। গলা নামিয়ে বরুণকে নির্দেশ দিচ্ছে, 'চাবুক-টাবুক' তো ঢের হল নাট্যকার, এবার একটা রোমান্টিক পালা লেখো দিকি।

রোমান্টিক! কুঞ্জর অভিলাষ! ভূতের মুখে রামনাম!

বরুণ অবাক হয়ে বলে, 'রোমান্টিক? হঠাৎ এ খেয়াল যে, মিস্টার দাস?'

এই—এই আর একটি গুণের জন্যেও বরুণ কুঞ্জর প্রিয়পাত্র। 'মিস্টার দাস' ছাড়া কখনও আর কিছু বলে না বরুণ।

মিস্টার দাস অতএব হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'মাঝে মাঝে নতুনত্বের দরকার, বুঝলে? ভেবে ভেবে এটাই এখন ঠিক করেছি আমি। 'ভবানী অপেরা' মানেই জ্বলন্ত আগুন, এটাও ঠিক নয়, একটি ফুটন্ত গোলাপ দেবার ক্ষমতাও যে 'ভবানী অপেরা' রাখে, সেটা দেখানো দরকার।'

বরুণ স্বল্পভাষী, বরুণ 'স্বল্প হাসি'-ও। সেই স্বল্প হাসিটুকু হেসে বরুণ বলে, 'কিন্তু আমার তো মনে হয় না সেটা দেখে লোকে খুশি হবে!'

'হবে না? বল কি নাট্যকার? তোমার লেখা নাটক, তাও যদি আবার রোমান্টিক হয়, লোকে তো লুফে নেবে।'

'আমার ওপর এত আস্থা রাখবেন না'—বরুণ বলে, 'লোকের ধর্ম যে কী তা বোঝা বড়ো শক্ত, মিস্টার দাস। 'লোক-চরিত্র' স্বয়ং ভগবানেরও অজানা। ওযে কিসে রুষ্ট, কিসে তুষ্ট! তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, কেউ যদি একটা কিছু বিশেষ জিনিস দিতে পারল আর লোকের ভালো লেগে গেল তো লোকে তার কাছে কেবল সেইটাই চাইবে। যে লোক কমিক করছে, তাকে চিরদিনই ওই কমিকের ভাঁড়ামিই চালিয়ে যেতে হবে। একটা গভীর জিনিস কি সিরিয়াস জিনিস, কেউ নেবে না তার কাছে। তেমনি আপনার এই 'ভবানী অপেরা'র কাছে লোকে অবিরত ওই চাবুকই চাইবে, মধুর কিছু দিতে যান, হয়তো 'ফেলিওর' হতে হবে! লোকে বলবে, দুর—'ভবানী অপেরা' আর আগের মতো নেই'।

কুঞ্জ সন্দেহের গলায় বলে, 'বাঃ, কেন তা বলবে? লোকে তো নতুনই চায়?'

বরুণ হাসে, 'চায়! নতুনের কাছে চায়!'

'এ কথা তোমায় কে বলল বলত, নাট্যকার? বয়েস তো তোমরা এই বাছা, লোকচরিত্র এত দেখলে কোথায়?'

'দেখবার চোখ থাকলে, দেখতে বেশি সময় লাগে না, মিস্টার দাস!'

'হুঁ। তা বটে! নইলে এতগুলো অমন আগুন-আগুন নাটক লিখলেই বা কি করে? তবু আমার ভারী একটা সাধ হয়েছে, রোমান্টিক একটা লেখো তুমি! আজই শুরু করে দাও।'

বরুণ হাসে, 'ভাবতে হবে না?'

'ভাবতে? আরে বাবা, রোমান্টিকের আবার ভাবাভাবির কী আছে? দুটো তরুণ তরুণী খাড়া করে, হয় তাদের—ওই তোমার গিয়ে কি বলে—পূর্বরাগ অনুরাগ ঘটিয়ে বিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেবে, নয়তো অগ্রে মিলন, মধ্যে বিরহ, পরে আবার মিলন, এইভাবে ছক কেটে ফেলো—'

বরুণ বলে, 'তাহলে পৌরাণিক কি ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র নিয়ে কাজ করলেও হয়।'

কুঞ্জ হাঁ হাঁ করে ওঠে—'না না, ওসবে দরকার নেই। ওসব কি আর কেউ বাকি রেখেছে হে? পড়ে আছে পুরাণে ইতিহাসে, আবহমানকাল ধরে যে পারছে ধরছে আর চোরের মার মারছে। না না, তুমি বাপু কাল্পনিক চরিত্রই গড়ো।'

বরুণ মৃদু হাসে। তারপর আস্তে বলে, 'কাল্পনিক চরিত্র মানেই সে আজকালকার জীবন? আজকের জীবনে রোমান্স কোথায়, মিস্টার দাস?'

কুঞ্জ অধিকারী 'মিস্টার দাসে'র মহিমা ভুলে চোখ গোল করে বলে ওঠে, 'নেই? রোমান্স নেই? তুমি যে তাজ্জব করলে হে লেখক, আমি তো দেখি এটা রোমান্সেরই যুগ। এত রোমান্স যে, ঘরের দেওয়ালে আর আটক খাচ্ছে না, পথেঘাটে, হাটেবাজারে, মাঠেময়দানে রোমান্সের ছড়াছড়ি!'

'আপনি শহরের ফুটপাথের দোকানগুলো দেখেছেন, মিস্টার দাস? মুক্তোর মালার ছড়াছড়ি!'

কুঞ্জ দাস এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হঠাৎ 'ওহো হো-হো' বলে বরুণের পিঠটা চাপড়ে দেয়। তারপর বলে, 'খুব উত্তরখানা দিয়েছ বটে:...কিন্তু তুমি যাই বলো, আমি নিরুৎসাহ হচ্ছি না। আমার এবার বিশেষ বাসনা—'

বরুণ হেসে বলে, 'তবে তো ভাবতে হয়।'

'ভাবো,—ভেবে প্লট ঠিক করে ফেল। আবার আসছি আমি, তুমি কতকটা খসড়া করো। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই রোমান্টিকের মধ্যেও সমাজচিন্তা থাকবে। প্রেম করলাম বলেই যে বেহেড্ হয়ে প্রেম করব তা নয়।'

কেন কে জানে বরুণের হঠাৎ মেজাজ বদলে যায়। বরুণ হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলে, 'হেড্ বেহেড্ জানি না, মিস্টার দাস, প্রেমের নাটক লেখা আমার দ্বারা হবে না।'

কুঞ্জ দাস কি ক্রুদ্ধ হয়? না উৎফুল্ল? বোঝা যায় না। কারণ কুঞ্জ দাসের মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছে, কিন্তু চোখটা যেন আলো-আলো। তা হয়তো বা রাগের আগুন। এবার হয়তো কুঞ্জ তার এতদিনের পুজ্যি 'লেখক'কে অসম্মান করে বসবে! কিন্তু চট করে তা করে না বুদ্ধিমান কুঞ্জ দাস। সে শুধু গম্ভীরভাবে বলে, 'হবে না কেন, সেটা শুনতে পাই না?'

'হবে না। হবে না। এর আর 'কেন'র কি আছে?' বরুণ অবহেলার গলায় বলে—'ওসব আমার হাতে আসবে না।'

কুঞ্জ এবার একটু ঘনিষ্ঠ হয়, গলা নামিয়ে বলে, 'ব্যাপার কি বল তো নাট্যকার? কোথাও দাগা টাগা পাওনি তো?'

বরুণ আরও অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'মাপ করবেন, স্যর! আমার কোনো অতীত ইতিহাস আবিষ্কার করতে বসবেন না। আপনাদের ওই 'লাভ' ব্যাপারটাতেই আমার অশ্রদ্ধা! 'প্রেম' বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি? রাবিশ!'

কুঞ্জ আলগা গলায় বলে, 'একেবারে রাবিশ?'

'আমার কাছে অন্ততঃ! ওসব শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বিয়ে কর, ঘর সংসার কর, আপত্তির কিছু নেই। সেটা হচ্ছে লেনদেনের ব্যাপার। একটা চুক্তিপত্রের ব্যাপার। আমি তোমায় স্বামী সংসার দিলাম, সামাজিক পরিচয় দিলাম, তুমি আমায় স্ত্রী-পুত্র দিলে, রোগে-অসুখে দেখলে, চুকে গেল। তা নয় প্রেম, লাভ, মিলন, বিরহ। জগতে যা নেই, তাই নিয়ে কচকচি। এসব পালা লেখাতে হলে আমায় ছাড়ুন, মিস্টার দাস!' বরুণ কলমটা কামড়াতে থাকে।

কুঞ্জ অধিকারী মানী লোক, তবু আশ্চর্য, এতবড়ো অপমানেও আহত হয় না। বলে, 'চটছ কেন নাট্যকার, চটছ কেন? ভাবলাম একটা নতুনত্ব করা যাক। যাক্‌গে, দরকার নেই। ওই যে সেই কালোবাজারীদের নিয়ে কি একটা লিখবে বলছিলে—'

বরুণ আত্মস্থ। বলে, 'আমি বলিনি, আপনি বলেছিলেন—'

'ও সে একই কথা! সেটাই করো।'

কুঞ্জ দাস ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু ব্যাজার মুখে নয়। কুঞ্জ দাসের মুখে বরং যেন একটা আশার দীপ্তি।

এই রকম মুখ দেখালেই কুঞ্জকে আমতা লাইনের সেই গ্রামের পথটায় হাঁটতে দেখা যায়। যখন যে নাটকটা নামায়, সেটায় হইচই পড়লে, নতুন মেডেল পেলে, বাবুদের দু'কথা শোনাতে পারলে—কুঞ্জ ট্রেনের টিকিট কাটে। কুঞ্জ এক-আধবেলার জন্যে হাওয়া হয়ে যায়। আর কুঞ্জ হাওয়া হলেই দলসুদ্ধ সকলের পোয়া-বারো।

মায় কোমরে বেল্ট আঁটা লিলির পর্যন্ত। লিলি সেদিন 'খুকি'র খোলস ছেড়ে তরুণী হয়ে ওঠে।

ফ্রকের ওপরেই যাত্রার সাজের একটা শাড়ি জড়ায়। আর নিমাইয়ের কাছে গিয়ে তার গা ঘেঁষে বলে, 'প্রোপ্রাইটার নেই বলে, খুব ভোজ লাগানো হচ্ছে, না?'

নিমাই মুচকি হেসে বলে, 'তা হবে না কেন? তুইও তো সুযোগ পেয়ে হিরোইন সেজে বসে আছিস!...কী বলব লিলি, শাড়িতে আর ওই ঘাগরাতে যেন আকাশ-পাতাল তফাত দেখায় তোকে।'

লিলি তার সেই 'অবোধ শিশু চক্ষে' এমন একটি কটাক্ষ করে, যা দেখতে পেলে রাগে কুঞ্জ অধিকারীর বুক ধড়ফড় করে উঠত। আর হয়তো মেয়েটাকে ধরে চাবুক পেটাতে যেত।

কুঞ্জ তার পুষ্যি কন্যেকে খাটো ফ্রক আর আঁটো জ্যাকেট পরিয়ে খুকি করে রেখে নিশ্চিন্ত আছে। তবে কুঞ্জ মেয়েটাকে 'বাবা' বলতে শেখায়নি, অদ্ভুত ওই ডাকটাতেই অভ্যস্ত লিলি : 'পোপাইটার'।

ছেলেবেলার আধো উচ্চারণটাই রয়ে গেছে জিভে। তবু লিলি প্রায় বাপের চোখেই দেখে কুঞ্জকে। তাই কুঞ্জ যখন স্টেশনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে, লিলি গিয়ে আদুরে গলায় বলে, 'আমায় নিয়ে যাওয়া হয় না একবারও। এ্যাঁ। আমি যেন মানুষ নই!' লিলিকে তখন শিশুর মতো দেখতে লাগে। কুঞ্জ তাই নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত কুঞ্জ বলে, 'মানুষ আবার কিরে? মানুষ কাকে বলে? বাছুরকে কি গরু বলে? ব্যাঙাচিকে ব্যাং? বলি ডাবকে কি নারকেল বলে? এঁচড়কে কাঁঠাল? মানুষ হবার বয়েস হবে, তবে তো মানুষ হবি?...তা, এখন আমি বেরোচ্ছি—নিমাইদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবি না, বুঝলি? আর নববালার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।'

লিলি মাথা নেড়ে ঝঙ্কার দেয়, 'তোমার আদরের নিমাই যা ঝগড়াকুটে! ওই তো ঝগড়া বাধায়। আমাকে 'তুই' বলে, 'আহ্লাদী' বলে। আমরা রাগ হয় না?'

কুঞ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, 'ভালো তো কোনোটাই নয়। সনা, জগা, সব ক'টাই তো পাজীর পাঝাড়া।'

লিলি একগাল হাসির সঙ্গে বলে, 'যা বলেছ! ছোটোলোক এক একটা!'

কুঞ্জর এ সময় মেজাজ শরীফ। স্টেশনে যাবার সময় কুঞ্জকে বাসমতী নববালার সঙ্গেও হেসে কথা কইতে দেখা যায়। লিলির সঙ্গে কইবে সে আর আশ্চর্য কি! হেসে উঠে বলে, 'তা একটা ভদ্দরলোক তো আছে। ভদ্দরের মতোন ভদ্দর, তার কাছে বসে থাকলেই পারিস। তোকে আর তাহলে জ্বালাতে আসবে না ওরা।'

লিলি মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'সে ভদ্দরলোকটা আবার কে গো, পোপাইটার?'

'কেন, বরুণ? যাকে বলে ভদ্দর!'

লিলি ঠোঁট ওল্টায়। 'বরুণ? লেখকবাবু? সে যা দেমাকী! কথাই কয় না আমার সঙ্গে!'

কুঞ্জ সহসা কৌতূহলী হয়, 'কথাই কয় না তোর সঙ্গে?'

'মোটে না।' লিলি ঝঙ্কার দেয়, 'কী লিখছে একটু দেখতে গেলে এ্যাইসা খিঁচোয়! বলে, পালা, পালা বলছি। কাজের সময় গোলমাল করতে আসসনি।—তোমার দলের কেউ ভালো নয়।'

কুঞ্জ বলে, তুই তো ভালো, তাহলেই হল। বলে ওর হাতে দু-একটা টাকা গুঁজে দিয়ে হাসিহাসি ভাবটাকে চাপা দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

'যাক এখন দশ-বারো ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্দি'—এঘরে এসে পা ছড়িয়ে বসে লিলি। চোখ মুখের ভঙ্গি করে হাতের টাকা নাচাতে নাচাতে বলে, 'এই দেখো, নিমাইদা!'

নিমাই ব্যাজার মুখে বলে, 'দেখে কি করব? বেল পাকলে কাকের কি? রাজা ধন বিলোচ্ছেন কোথায়? না অন্তঃপুরে। কুড়োচ্ছেন কে? রাজকন্যে। এই তো?'

লিলি টাকা নিয়ে লোফালুফি করতে করতে বলে, 'আমি তো রেল ভাড়া জমাচ্ছি।'

'রেল ভাড়ার দরকার কি?' নিমাই বলে, 'এবার তো নাটক দেখাতে কলকাতায় যাওয়াই হচ্ছে। নাটকের লড়াই হবে, কারটা ফার্স্ট হয়! যেমন হয়। গেলে তো দলবল সবাই যাব।...আর কলকাতার শহরে একবার হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করে কার সাধ্য!'

'পালাটা কি?'

'তা জানিনে! কোন্‌টি বাছবে কে জানে। মোট কথা যাওয়া হবে। বরুণবাবু তো আবার পালা লিখছে!'

'বরুণবাবু!' লিলি মুখটা বাঁকায়, 'যা তুচ্ছু-তাচ্ছিল্য করে আমায়! দেখলে গা জ্বলে যায়।'

নিমাই হাসে, 'গা জ্বললে আর কি হবে, কর্তা তো ওকে জামাই করবে ঠিক করেছে।'

'ঠিক করেছে!' লিলি পনেরো বছরের মুখে পঁচিশ বছরের ভঙ্গি করে বলে, 'ঠিক করলেই হল? আমার দায় পড়েছে।'

'কর্তা জোর করলে কী করবি?'

'আহা রে! কী করব যেন জানেন না!' চওড়া জরির কোমরবন্ধটার ওপর হাত রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ায় লিলি, 'এখন আবার ন্যাকা সাজছ যে?'

নববালা জল আনতে গিয়েছিল, ঘড়াটা এনে দুম করে বসিয়ে রেখে কটু গলায় বলে, 'বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর। কর্তা বেরিয়েছে, আর ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে, কেমন?'

খাঁটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের মধ্যে থেকে ফোঁস করে ওঠে, 'তোমার খেয়ে ফষ্টিনষ্টি করছি। তুমি বলবার কে?'

'ওমা! মেয়ে দেখ! যেন ফণা ধরা ফণিনী!' নববালা গমগম করে চলে যায়।

কুঞ্জর অনুপস্থিতিতে দলের চেহারাটা অনেকটা এ রকমই। এখন তবু সবাই নেই, থাকলে দেখবার মতো। তবু মাঝে মাঝে কুঞ্জ অনুপস্থিত হবেই।

কুঞ্জ সেই একটা নামহীন পরিচয়হীন গণ্ডগ্রামে পৌঁছে, তার মাঠের মাঝখান দিয়ে পুকুর ধার দিয়ে সরু একটা পায়ে চলার পথ ধরে গিয়ে উঠবে একখানা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে। উঠোনের বেড়ার দরজাটার বাঁধন দড়িটা খুলে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে।

আজও তেমনি দাঁড়াল। কিন্তু আশ্চর্য, বেড়ার দরজার সাড়া, জুতোর শব্দ, এই দুটো ঘটনাতেও সামনের ঘর থেকে কোনো সাড়া এল না। অথচ ঘরের মধ্যে মানুষ নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে তা টের পাওয়া গেল। দেখা গেল না কাউকে, তবু কুঞ্জ দাস দাওয়ায় উঠে পড়ে পা ঝুলিয়ে বসল। পিঠটা ঘরের দিকে। গলা তুলে বলল, 'বাড়ি ঘর আলগা রেখে বাড়ির লোক উধাও! চোর ঢুকল বাড়িতে তা হুঁশ নেই।'

কথার উত্তর এল না, শুধু ভিতরের নড়া-চড়াটা যেন আরও স্পষ্ট হল।

কুঞ্জ দাস সেইভাবেই বলল, 'মনস্থির করে ফেললাম! ওখানেই মেয়ের বিয়ে দেব।'

এবার হঠাৎ ঘরের বাতাস অলক্ষ্যে কথা কয়ে উঠল, 'ওইখানটা আবার কোন্‌খানটা? চাল-চুলো আছে নাকি?'

কুঞ্জ এবার গলাটাকে আরও দরাজ করে, 'যে চালের নীচে আছে সেইটাই তার চাল, যে চুলোয় খাচ্ছে সেইটাই তার চুলো।'

আবার শব্দভেদী বাণ, 'অধিকারীর সব্বস্বর উত্তরাধি-কারী হবে তো ওই কুড়োনো মেয়েটা। যার জাতের ঠিক—'

'থাক্ থাক্, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই জাত-টাত আমি মানি না!'

অলক্ষ্য থেকে—'তা হঠাৎ মনস্থির করবার হেতু?'

'করছিলামই! নতুন করে আবার বাজিয়ে নিলাম। রোমান্টিক পালা নিতে বললাম, বলল, —আমার দ্বারা ওসব প্যান-প্যানানি হবে না।—ব্যস্, করে ফেললাম মনস্থির—'

ঘর থেকে অবাক গলা ভেসে আসে, 'এতে কি হল?'

'কী হল?' কুঞ্জ দাস একটি রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'বোঝা গেল, সাচ্চা পুরুষ ছেলে। ন্যাকা ভালোবাসাবাসির ধার ধারে না। তবু আরও একটু বাজাব!'

ভিতর থেকে এবার একটু স্থির স্বর শোনা যায়। স্থির, ভারী! 'যে ছেলে ভালোবাসার ধার ধারে না, সেই তাহলে কন্যে সম্প্রদানের পক্ষে সুপাত্র?'

'আলবত! আর তার কথাবার্তা কী জোরাল! বলে,—বিয়ে বুঝি, ঘর সংসার বুঝি। সেটা হচ্ছে বিজিনেসের মতোন লেন-দেনের ব্যাপার। রোমান্স আবার কি? নেই ওসব এযুগে!'

'ওঃ! তাহলে আগের যুগে ছিল!'

'ছিল, সেই রাধাকেষ্টর আমলে ছিল। ব্যস্। তারপরে আর না। যা আছে, সবটাই বখামি, আর ন্যাকামি!'

'ওঃ! ভালো কথা।'

আলাপ চলছে। অথচ সেই দূর ভাষণে। একজন দেওয়ালের আড়ালে, আর একজন পিঠ ফিরিয়ে। তবু কথা কাটাকাটিরও কসুর নেই।

একটা গলা বলছে, 'বিয়ে দেবার আগে মেয়ের ইতিহাসটা বলতে হবে।'

আর একটা গলা জোর গলায় জবাব দিচ্ছে, 'কেন? কী দায় পড়েছে? ওরই বা তিন কুলে ক'টা গার্জেন আছে?'

'তবু তো ভদ্দর ঘরের ছেলে!'

'কুঞ্জ দাসও অভদ্র ঘরের ছেলে নয়!'

'মেয়েটা তো শুনেছি দাস মশাইয়ের কুড়োনো মেয়ে!'

'কুড়োনো তো কুড়োনো! অন্নজলের কোনো দাম নেই?'

'তা বটে! কিন্তু বেলগাড়ির হাতমুখ ধোওয়া হবে, না ধুলো পায়েই বিদায়?'

'তা সেটা হলেই ভালো হত, নিতান্তই ক্লান্ত, তাই—'

অতঃপর এক সময় দেখা যায় কুঞ্জ সেই উঠোনটা পার হয়ে পিছনের এটা দরজা খুলে পুকুরে হাত পা ধুচ্ছে।

এক সময় দেখা যায়, সেই দালানেই একধারে পাতা আসনে বসে পড়েছে কুঞ্জ, সামনে পরিপাটি করে বাড়া অন্নব্যঞ্জন।

আচ্ছা, লোক তো ত্রিসীমায় নেই, এসব করল কে? ভূতে নাকি?

তা তাই। ভূতই!

কুঞ্জ যখন হাতমুখ ধুয়ে বলল, 'যাই একবার মিষ্টির দোকানটা ঘুরে আসি', আকাশে তখন ঝিকিমিকি বেলা। অথচ তখন এই ক্ষুদ্রকায় বাড়ির ক্ষুদ্রকায় রান্নাঘরটার মধ্যে দুটো উনুন জ্বলে উঠেছে। শুকনো কাঠ গোছানো ছিল বোধহয়।

মিষ্টি কিনে আরও খানিক এদিক ওদিক ঘুরে কুঞ্জ যখন ফিরল, তখন আসন পাতা, অন্ন প্রস্তুত।

কুঞ্জ আবার পিঠ ফিরিয়ে বসে, আর বলতেই হবে—ভূতে ভাতের থালা নামিয়ে রেখে যায়।

খাওয়া মেটে, তবু অনেকটা রাত পর্যন্ত এমনি লুকোচুরি খেলা চলে। তারপর একজন বলে, 'বাড়ি ফিরতে হবে না?'

আর একজন বলে, 'বাড়ি না ঘোড়ার ডিম! সরাইখানা!'

'তা সেই সেখানেই—'

'ট্রেন তো সেই ভোরে।'

'তাই আছে চিরকাল।'

'তার মানে সমস্ত রাত ইস্টিশানের চালার নীচে পড়ে থাকা!'

'তা মানে তাই দাঁড়ায় বটে।'

অগত্যাই রাগ-রাগভাবে উঠে পড়ে কুঞ্জ দাস। বলে, 'আর আসছি না।'

ভিতর থেকে ছোট্ট একটু শব্দ, 'আচ্ছা!'

কুঞ্জ গমগমিয়ে বলে, 'আচ্ছা? হুঁঃ! জানা আছে কিনা আসতেই হবে মুখে কুটো নিয়ে!'

'কেন? কে আসতে দিব্যি দিয়েছে?'

'কে দিব্যি দিয়েছে? ওঃ, খুব বোলচাল শেখা হয়েছে। কিছুদিন কলকাতায় বাস করে এই উন্নতিটি হয়েছে!'

'যাত্রার দল খুলেও সে উন্নতি কম হয়নি।'

'হুঁ! চোটপাটটি ঠিক আছে। যাক বিদেয় হওয়া যাক!' বলে অধিকারী কুঞ্জ দাস গেঁজে থেকে এক গোছা নোট বার করে সামনের ওই ঘরটার দরজার কাছে নামিয়ে রেখে গলা তুলে বলে, 'কাগজের টুকরো ক'খানা তুলে রাখা হোক। ইঁদুরে না কাটে।'

এবার ঘর নিঃশব্দ।

কুঞ্জ গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'বাগদী মেয়েটা এসে কাজকর্ম ঠিকমতো করে দিয়ে যায়?'

'যায়।'

কুঞ্জ ছাতাটা দাওয়ার পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে উঠোনে নামে, জুতোটা পায়ে দেয়, বেড়ার দরজাটা খুলে বেরোয়, বাইরে থেকে আবার সেটা আটকে দেয়, তারপর সেই পায়ে চলা পথটা ধরে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে পকেট থেকে টর্চ বার করে আলো ফেলতে ফেলতে।

সারারাত এখন স্টেশনের সেই করোগেটের চালাটার নীচে পড়ে থাকতে হবে, রাত্রি শেষে ট্রেন। অভিজাত স্টেশন নয় যে, ওয়েটিং রুম থাকবে।

তবু মরতে মরতে এখানে আসতে হয় কুঞ্জ দাসকে। মাঝে মাঝেই আসতে হয়। ওই কাগজের টুকরোগুলোর পরমায়ুর কাল আন্দাজ করে করে তো আসতেই হয়। অকারণেও হয়। হঠাৎ মন ভালো হবার যোগ এলে, নাটক জমলে, মেডেল পেলে। এই পায়ে চলা পথটা যেন প্রবল আকর্ষণে টানতে থাকে কুঞ্জকে।

কিন্তু কেন? কিসের দায়ে বাঁধা কুঞ্জ?

তা সে কথা যদি বলতে হয় তো অনেকগুলো বছর আগে পিছিয়ে যেতে হয়। মন দিয়ে শুনতে হয় একটা কুলত্যাগিনী মেয়ের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার ইতিহাস। সংসারে আর কোথাও কেউ এতখানি ধৃষ্টতা দেখিয়েছে কিনা সন্দেহ।

তবে কুঞ্জ দাসকে দেখতে হয়েছে। কুলত্যাগিনী ওই মেয়েটার দুঃসাহসিক আবদার রাখতেও হয়েছে তাকে।

কুঞ্জ যখন একটা জ্বালার মন আর তার দলবল নিয়ে যেখানে সেখানে 'চাবুক' বসিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন একদিন কুঞ্জ একখানা চিঠি পেল। হাতের লেখা দেখে প্রথমে ছিঁড়ে ফেলতে গেল। তারপর আস্তে আস্তে শুধু খামের মুখটা ছিঁড়ল।

দেখল ক'টা মাত্র লাইন। সম্বোধনবিহীন—

'....নির্লজ্জতার সীমা নেই। তা হোক, নির্লজ্জের আর লজ্জা কি? মরতে বসেছি একবার এসে দাড়াতেই হবে। নিচে ঠিকানা দিলাম।'

কলকাতার পুব অঞ্চলে একটা গলি-পথের ঠিকানা।

চিঠিখানা নিয়ে সেদিন কুঞ্জ সারারাত পায়চারি করল, তারপর সকালে একটা কাগজে লিখল, 'এখনও মুখ দেখাতে সাহস?' খামে ভরল, উচিতমতো স্ট্যাম্প মেরে ফেলে দিল। তারপর মনের জোর করে নাটকের মহলা দেখতে বসল।

কিন্তু নির্লজ্জতা আর ধৃষ্টতার চরম পরাকাষ্ঠার নমুনা নিয়ে আবার একছত্র চিঠি এল, 'তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্যি মুখ দেখাব না। তবু না এলেই নয়।'

অধিকারী কুঞ্জ দাস হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল। গায়ে জামা চড়িয়ে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে একখানা কাপড় গেঞ্জি আর যতগুলো পারল টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেখানে গিয়ে দেখে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। একটা সরু গলির মধ্যে পাকা গাঁথুনির এক বস্তি, তারই একটা ঘরের সামনে একটা মড়া পড়ে। জোয়ান বয়সের পুরুষের মড়া। চেহারা প্রায় সুকান্তি। মরে গেলেও বোঝা যাচ্ছে।

কুঞ্জ গিয়ে পড়তেই একটা সোরগোল উঠল।

অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে কথা কয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে একটা মেয়ে-গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ভাসুর বুঝি? তা বিপদের সময় অত ভাসুর ভাদ্দরবৌ মানলে চলে?'....তারপর কোন্ ঘর থেকে একটা বয়স্ক বেটাছেলে বেরিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনিই বুঝি অমলবাবুর দাদা? তা ভাই মরে গেল তবে এলেন? প্রতিজ্ঞে ছিল বুঝি মরামুখ দেখবেন? তা তেমন প্রতিজ্ঞের উপযুক্ত লোকই ছিলেন বটে শ্রীযুক্ত অমলবাবু! মরে গেছেন, আর বলতে কিছু চাই না। তবে চটপট ব্যবস্থা করে ফেলুন মশাই।'

করতেই হল ব্যবস্থা। কোথাকার এক মফস্বল শহরের কমল মুখুজ্যের ছেলে অমল মুখুজ্যের লিভার পচে মরা দেহটার সদগতি করতে নিয়ে গেল কুঞ্জবিহারী দাস। মুখাগ্নিও সেই করল, কারণ তখন সে অমল মুখুজ্যের দাদা।

ভাদ্দরবৌ! সামনে বেরোয় না। কিন্তু কথা না বললে চলছে না। দরজার আড়াল থেকে বলে, 'আর কিছুদিন আগে এ দয়া হলে দেশের লোকটা বিনি চিকিচ্ছেয় মরত না।'

কুঞ্জর চারিদিকে দু'ডজন করে চোখ কান। কুঞ্জ তবু গলা নামিয়ে বলে, 'বড়ো দুঃখ হচ্ছে, না?'

'তা একটা মানুষ বেঘোরে মরলে হয় বৈকি দুঃখ।'

'আমার একটা বাসনা পূর্ণ হয়েছে!' কুঞ্জ চাপা নিষ্ঠুর গলায় বলে, 'মুখে আগুন ধরাবার বাসনাটা পূর্ণ হল।'

'আরও একটা মুখ তো বাকি—' ঘরের ভিতরটা যেন আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে কথা কয়ে ওঠে, 'সেটারও কি এ গতি হবার আশা আছে?'

কুঞ্জ গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'গ্যারান্টি দিতে পারছি না।'

'তা যাক। মুখে আগুন দেওয়াটা ভাগ্যচক্র। যে জন্যে ডেকেছি, বলি—'

বলল সেই কথা, সেই দুঃসাহসিক মেয়ে মানুষটা! বছর তিনেকের একটা মেয়ে আছে তার, সেটার ভার নিতে হবে কুঞ্জকে।

ভার নিতে হবে মানে? মানে কিছুই নয়। নিতেই হবে তাই। সেটাই বক্তব্য ওই অদর্শনার। মেয়েটার বাপ মরেছে নানা রোগে, মা মরবে, মানে মরতে বসেছে যক্ষায়, অতএব পরোক্ষে মেয়েটা ডাস্টবিনে যাবে। কুঞ্জ ভার না নিলে নেবে কে? পথের কুকুর বেড়াল ছানার মতো মরবে?

তা মরুক না। কুঞ্জর কী লোকসান তাতে? অমন কত মরছে জগতে।

হ্যাঁ, সেই জবাবই দিয়েছিল কুঞ্জ। চোটপাট বলেছিল, 'বেড়াল কুকুরের মতো সে অপেক্ষাই বা কিসের? শানে আছাড় দিলেই তো চুকে যায়।'

'তো, তা হলে তাই দিয়ে যেতে হবে—' অন্তরালবর্তিনী বলেছিল, 'সেটাও একটা উপকার করে যাওয়া হবে। ওর মায়ের তো সেটুকু ক্ষমতাও নেই গায়ে।'

'হুঁ! তারপর? সেই জননীটির শেষ গতি কি হবে?'

'তার গতি?' একটু হাসি শোনা গিয়েছিল, 'যক্ষ্মা হাসপাতালের মুদ্দফরাশ নেই!'

'তা ভালো! উঁচুদরের গতির ব্যবস্থা হয়ে আছে তাহলে! তা হাসপাতালের ব্যবস্থাটা হয়েছে?'

'হবে! বাড়িওলাই নিজের গরজে টেনে ফেলে দিয়ে আসবে। যাক মেয়েটাকে আছড়ে দেওয়ার কাজটা সেরে যাওয়া হয় যেন।'

পাশের ঘরে এধারে ওধারে অনেকগুলো কান ভাসুর ভাদ্দরবৌয়ের আলাপ শোনার আশায় উদগ্র হয়েছিল। তারা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ঘোমটার ভেতর খ্যামটা নাচ!'

আরও অনেক কিছুই বলল তারা। এবং অপেক্ষা করতে লাগল, লোকটা বিদেয় হলে আচ্ছা করে একবার শুনিয়ে ছাড়বে বামুন বৌকে।—বলি এতই যদি কথার বান, মুখ দেখাদেখিতেই যত দোষ? আরও বলবে—ভেতরে ভেতরে এতবড়ো একটি ব্যামো পুষে রেখে এতগুলো লোককে মজাচ্ছ তুমি?

কিন্তু শুনিয়ে দেবার আসাটা আর মিটল না তাদের।

লোকটা চলে গেল না।

গেল একেবারে বামুনবৌকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে, আর তার বাচ্চা মেয়েটাকে নতুন জামাজুতো পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে।

হাসপাতালের খরচের দায়িত্ব তো অগত্যা কুঞ্জ দাসকেই নিতে হবে। আর রুগীটা যখন মরবেই তখন তার মা-মরা মেয়েটারও যাবজ্জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নিতেই হবে। উপায় কি? মানুষ বৈ তো জন্তু জানোয়ার নয় কুঞ্জ?

কিন্তু আশ্চর্য, রুগীটা মরল না। অখাদ্যের প্রাণ যমের্য অরুচি বলেই হয়তো মরল না, সারল। অতএব হাসপাতালের জায়গা জুড়ে আর থাকা চলল না।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক অবস্থা পার হয়ে, অবশেষে আমতা লাইনের একটা গণ্ডগ্রামের এই আশ্রয়। সাড়ে সাতশো টাকা দিয়ে কেনা হল এই মলাট-ছেঁড়া বইয়ের মতো বালি-খসা বাড়িটা। আর বাড়িটা নিজের ট্যাঁকের কড়ি খসিয়ে কিনেছে বলেই হয়তো কুঞ্জ দাসের এটার ওপর এত টান!

বছরের পর বছর করে অনেকগুলো বছরই তো পার হল, টানটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। বোধকরি মুখ না দেখানোর প্রতিজ্ঞাটা বজায় আছে বলে, রংটাও অ-বিবর্ণ, উজ্জ্বল।

আগে কখনও কখনও বলত কুঞ্জ, 'মেয়েটাকে ইচ্ছে করলেই বেড়াতে আনতে পারি।'

ঘরের দেওয়াল বলেছে, 'থাক'!

'লোকসান কি?'

'আছে। মিছিমিছি একটা অবোধ শিশুর মনে কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়া। পাঁচটা প্রশ্ন তার মনে তোলা।'

'কত বড়োটা হল, দেখবার সাধও হতে পারে, তাই ভেবেই বলা।'

'নাঃ, সে সাধ নেই।'

তা, নেই সে সাধ নিশ্চয়। সাধ থাকলে ওই ধৃষ্ট নির্লজ্জ মেয়েমানুষটা নির্ঘাত নিজে থেকেই বলত, 'কত বড়োটি হল দেখতে সাধ হয়!' তা পারত ও বলতে, ওর অসাধ্য যখন নেই।

সাধ নেই দেখবার, তবু কুঞ্জ দাস তার নাটকের সেই ছেলে-সাজা মেয়েটার ফটোগ্রাফ তুলে তুলে মাঝে মাঝে ওই নোটের গোছার সঙ্গে দরজার বাইরে রেখে যায়।

ঘরের ভিতর থেকে তাচ্ছিল্যের স্বর ভেসে আসে। 'দরকার ছিল না। না দেখে মরছিল না কেউ।'

কুঞ্জ চটে যেত। বলত, 'কেনই বা মরে না? মরবার তো কথা। গর্ভে ধরলেই তার ওপর মায়ার টান—'

'সবই কি আর এক নিয়মে চলে? বিতেষ্টাও থাকতে পারে।'

'হুঁ! অবোধ শিশু, তার ওপর বিতেষ্টা! আর—'

শব্দভেদী বাণ বলে, 'থামা হল কেন? সবটা হয়ে যাক?...আর পাপে বিতেষ্টা ছিল না, অনাচারে বিতেষ্টা ছিল না, এই সব তো?'

কুঞ্জ বলত, 'সেধে সেধে অপমান গায়ে মাখা! কুঞ্জ দাস অত ছোটো কথা কয় না।'

'আমার ঘাট হয়েছে।'

এই তর্কাতর্কি কখনও কখনও বাতাস উত্তপ্ত করে তুলত। কুঞ্জ বলত, 'আর আসব না।'

ঘরের দেওয়াল তখন হেসে উঠত। বলত, 'টাকাটা তাহলে মনিঅর্ডারে আসবে? না কি বন্ধ?'

কুঞ্জ রাগ করে বলত, 'সাধে আর বলেছে বদ মেয়েছেলে!'

চলে যেত গটগটিয়ে। আবার আসত। বরং সেবারে আরও তাড়াতাড়ি আসত। ক্রমশ এই আসাটা চন্দ্র সূর্যের মতো নিশ্চিত নিয়ম হয়ে গেছে। আসবেই কুঞ্জ। নতুন মেডেল পেলে সেটা দরজায় ফেলে দিয়ে বলবে, দেশসুদ্ধ লোক পুজো করে বৈ হেনস্তা করে না। মেডেল কেউ অমনি দেয় না।'

কোনো বই খুব নাম করলে, এসে ওই উল্টোমুখো বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'হাজার হাজার লোক দেখছে, আর অহঙ্কারীদের গরবে মাটিতে পা পড়ে না!'

ঘরের দেওয়াল বলে, 'দেখাটা হবে কেমন করে? আসরের কানাচে হাড়ি বাউরীদের দলে বসে?'

'সে কথা কেউ বলেছে?' কুঞ্জ রেগে ওঠে।

জবাব আসে হাসির সঙ্গে, 'বলবে কেন? যা ঘটবে সেটাই হচ্ছে কথা।'

কুঞ্জ চুপ করে থেকেছে। কুঞ্জ আর কোনো আশ্বাসের কথা খুঁজে পায়নি তখন। তারপর হয়তো কুঞ্জ সহসা বলে উঠেছে, 'তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্যিটা কি জীবনভোর পালতে হবে?'

ঘরের মধ্যে একটা অস্ফুট আওয়াজ যেন চমকে উঠেছে। তারপর আস্তে আস্তে যেন ঘুমন্ত মানুষ কথা বলেছে, 'দেবতার দিব্যি জন্মভোর কেন, জন্ম-জন্মান্তর পালতে হয়।'

'তেত্রিশ কোটি তো আছে ঘেঁচু। মা-কালী এর মধ্যে পড়ে না।'

'পড়ে? মা-কালীকে অগ্রে নিয়ে তেত্রিশ কোটি।'

'দিব্যি দেবার আর বস্তু খুঁজে পেল না! ছ্যাঃ, যেমন বুদ্ধিতে চলল চিরদিন!'

আক্ষেপ, রাগ, অসহিষ্ণুতা এই ছিল সমাপ্তি সঙ্গীত। ক্রমশ সেটাও গেছে। এখন শুধু যেন অন্ধ একটা নেশার অভ্যাস। আসে, উল্টোমুখো হয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে বাতাসকে কথা বলে, পুকুরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসে, একবেলার ভাতটা খায়, তারপর ছাতাটি নিয়ে স্টেশনে গিয়ে টিনের চালার নীচে সারারাত পড়ে থেকে, সকালের গাড়িতে ফেরে।

রাতে থাকার কথা ওঠে না। নানান জায়গায় থাকা, নানান দেশ থেকে বায়না, কত লাইনের গাড়িতে চড়তে হয় দলবল নিয়ে, কিন্তু এই আমতা লাইনটায় কখনও ভুল হয় না।

প্রথমবার ভাত পায়নি। কুঞ্জ যা দোকানের মিষ্টি এনে ধরে দেয় একরাশ, তাই থেকেই সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে দেওয়া হয়েছিল কুঞ্জর সামনে। কুঞ্জ রেগে উঠে বলেছিল, 'ভাতের আগে এই এত সব খেতে হবে?'

'ভাত!'

ঘরের মধ্যে থেকে একটা প্রেতাত্মার ছায়া কণ্ঠ বলে উঠেছিল, 'ভাত খাওয়া হবে এখানে?'

'হবে না তো কি এই পিণ্ডিগুলো গিলে রাত কাটাতে হবে? ভাত ছাড়া রাতে আর কিছু খাই কখনও আমি?'

সেই স্বর বলেছিল, 'এখানে আমি ছাড়া আর কে আছে রাঁধবার?'

কুঞ্জ ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'ওঃ, তা শরীর বুঝি ভালো নেই? তবে থাক্, তবে থাক্।' কুঞ্জ ওই কণ্ঠস্বরের মধ্যে বোধকরি ভয়ানক একটা ক্লান্তির আভাস পেয়েছিল। কিন্তু সে উত্তরটা পেল উল্টো।

'শরীর খুব ভালো আছে। হাতে খাওয়া হবে কি না সেই কথাই হচ্ছে।'

'ওঃ হাতে খাওয়া!'

কুঞ্জ একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠেছিল, 'ধর্মজ্ঞান! বলি জলটা দিল কে?'

'জলে আর ভাতে অনেক তফাত।'

'কিছু না, কিছু না, কোনো তফাত নেই। খাওয়া নিয়ে কথা।' বলেই কুঞ্জ আরও হেসে ওঠে, 'আর সে ধরতে গেলে তো জাতে উঁচু হয়েই যাওয়া হয়েছে। কুলের মুখুটি মুখুজ্যে কুলীন।'

ভিতরে স্বর এবার সজীব সতেজ, 'আরও একটা কথা আছে। কাশির ব্যামো হয়েছিল—'

'রোগ সারলে আর রুগী কিসের? বেশি কষ্ট না হলে ভাত দুটো চড়ানো হোক।' সেই থেকে ওই একবেলা ভাত, আর তার সঙ্গে এক পাহাড় কথা!

কথা, কথা! কথা কইবার জন্যেই যেন ছুটে আসে কুঞ্জ। অথচ একটা অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথা। আর নতুন কথা কিছুই নেই। তবে ইদানীং কুঞ্জর ওই পুষ্যি মেয়েটার বিয়ের কথা নিয়ে কথা চালায় কুঞ্জ। তার সঙ্গে নিজের বুদ্ধির বড়াইও।

'উঁহু, কাপড়-ফাপড় দিইনি এখনও। ওই ঘাগরা পরিয়েই ছেড়ে ছেড়ে রেখেছি। বয়েস ধরা যায় না। তা ছাড়া স্বভাবেও একেবারে বাচ্চা! মায়ের তো কাঠ কবুল প্রতিজ্ঞে 'দেখব না', নইলে মনে হয় নিয়েই চলে আসি। এত বায়না করে! হাত ধরে ঝুলে পড়ে।'

'অত আহ্লাদেপনা কেন?'

'আহ্লাদেপনা আবার কি? একটাও স্নেহ মমতার জায়গা তো থাকবে মানুষের?'

'সম্পর্কটা বেশ ভালোই পেয়েছে।' একটু হাসির শব্দও আসে কথার সঙ্গে।

'সম্পর্ক! সম্পর্ক নিয়ে কে ধুয়ে জল খাচ্ছে? তবে এই আগে থেকে বলে রাখছি, বিয়ে দিয়ে জামাই মেয়ে এনে দেখাবই। তিন সত্যি!'

'পরিচয়টা কী দেওয়া হবে?'

'সে আমি বুঝব।'

আবার আসে—

বলে, 'মনঃস্থির করেছি, তবু এখনও আরও কিছু বাজিয়ে নিতে বাকি। তবে দেরি করব না, ছেলে-বয়স থাকতে থাকতেই দল থেকে সরাতে হবে। অবিশ্যি খুব দুঁদে আছে মেয়েটা, কাউকে পরোয়া করে না, সব ক'টার সঙ্গে ঝগড়া। তাই আমার শান্তি।'

কুঞ্জর পুষ্যি মেয়েটা দুঁদে বলে কুঞ্জর শান্তি! আর কুঞ্জ তার পাত্র ঠিক করে ফেলেছে বলে কুঞ্জর শান্তি! তবু পাত্রটাকে এখনও বাজিয়ে নিতে বাকি।

সেই বাজানোর পদ্ধতিটাই ধরে কুঞ্জ। লিলিকে ডেকে ডেকে বলে, 'সারাদিন শুধু হি হি করে বেড়াস কেন? শেলেট পেন্সিলটা নিয়েও বসতে পারসি দু'দণ্ড! বাড়িতে একটা লেখা-পড়া জানা ভদ্র ছেলে রয়েছে, তার কাছেও একটু পড়া বুঝে নিলে হয়। তা নয় কেবল ওই মুখ্যুগুলোর সঙ্গে—'

'বরুণদা পড়াবে আমাকে? তা হলেই হয়েছে!' লিলি ঠোঁট উল্টোয়।

কুঞ্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

আবার এক সময় অন্য পথ ধরে কুঞ্জ। বলে, 'লিলি, যা দিকি—বরুণকে এক পেয়ালা কড়া করে চা দিয়ে আয় দিকি। রাত জেগে বই লেখে! দেখিস যেন আর কাউকে বরাত দিসনি, নিজে করে দিবি।'

লিলি প্রোপ্রাইটারের কথা ঠেলতে পারে না। কিন্তু খানিক পরে লিলি রাগ করে ফিরে আসে, 'আর কক্‌খনো বরুণদাকে চা করে দেব না। এত বকে!'

'বকে? বকবে কেন?'

'কেন? তোমার ভালো ছেলে ভদ্দর ছেলে যে! চা দিতে গিয়েছি, বলে কি না 'কে তোকে চা নিয়ে আসতে বলেছে? চা খেতে চেয়েছিলাম আমি? খবরদার যদি আর কখনও শুধু শুধু এ ঘরে আসবি তো দেখাব মজা। যা, ফেলে দিগে যা।' লিলি কাঁদো কাঁদো হয় এবার।

কিন্তু কুঞ্জর মুখ হাসি হাসি। কুঞ্জর যেন অঙ্কের ফল মিলে গেছে। কুঞ্জ বলে, 'তুই বললি না কেন, প্রোপ্রাইটার বলেছে।'

'বলতে সময় দিয়েছে? দূর দূর, ছেই-ছেই! শেষকালে যখন বললাম, 'ফেলে দেবে তো—পোপাইটারের সামনে গিয়ে ফেলে দাও গে। যে চা দিতে বলেছে—তখন বলল,—'দে, দিয়ে যা।'

কুঞ্জ মৃদু হেসে বলে, 'রাত-দিন চড়া চড়া পালা লেখে তো? মেজাজটা তাই চড়া।' তার মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি।—এই ঠিক ছেলে!

মেয়ে মানুষকে দূর দূর করে মানেই, বিয়ে করা পরিবার ছাড়া জীবনে ও আর কারুর দিকে তাকাবে না। তা ছাড়া লিলির সঙ্গে গেঁথে দিতে পারলে চিরকাল আমার কাছে বাঁধা থাকবে লেখক। আর লিলিও কাছে থাকবে।

কুঞ্জ বরুণের ঘরে এসে ঢোকে।—'চা দেখে রেগে উঠলে কেন গো নাট্যকার? রাত জেগে লেখো, তাই ভাবলাম একটু কড়া করে চা খেলে—'

'না না, আমি ওসব পছন্দ করি না—!' বরুণ বিরক্ত গলায় বলে, 'খুব খারাপ লাগে আমার ওই মেয়ে-ফেয়ে ঘরে ঢোকা।'

কুঞ্জ উদার গলায় বলে, 'আরে বাবা, একটা বাচ্চা মেয়ে—'

'তা হোক!' বরুণ রুক্ষ গলায় বলে, 'বারণ করে দেবেন।'

কুঞ্জ হৃদ্যতার গলায় বলে, 'তা না হয় দিলাম। কিন্তু মেয়েছেলে দেখলেই যদি তোমার এত গা জ্বলে, বে থা করবে কি করে?'

'বিয়ে করব, এ কথা আপনাকে বলতে যাইনি।'

কুঞ্জ হেসে উঠে বলে, 'আহা তুমি তো বলতে যাওনি, কিন্তু আমি তো মনে মনে ঠিক করে রেখেছি তোমাকে ঘর সংসারী করে দেব।'

বরুণ হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন? হঠাৎ আমার প্রতি এমন নেক নজর কেন?'

'আহা, তুমি রাগ করছ কেন? তোমাকে যে আমার ভারী পছন্দ, তাই!'

'বিয়ের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? পছন্দ করেন, করুন।'

'নাঃ, এখন তোমার মেজাজ ভালো নেই, থাক ও কথা! পালাটার কতদূর হল?'

'এগোচ্ছে।'

'শুনতে পাই না একটু?'

বরুণ একবার এই লোকটার প্রার্থী-প্রার্থী মুখের দিকে তাকায়। এটাও আশ্চর্য! দলের আর সকলের ওপর ব্যবহার তো দেখেছে, যেন হাতে মাথা কাটছে। অথচ বরুণের সামনে যেন বেচারী! যেন কৃতার্থম্মন্য অধস্তন! তার মানে বরুণের মধ্যেকার শিল্প-স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা করে ওই গোঁফওয়ালা

বেঁটে-খাটো লোকটা। বরুণ হঠাৎ নিজের রূঢ়তার জন্য লজ্জিত হয়। বলে, 'আচ্ছা, শুনুন খানিকটা—'

পড়ে কিছুক্ষণ, তারপর মুখে মুখে বাকিটা শোনায়। একজন ভেজালদার কালোবাজারি ঘিয়ে বিষাক্ত চর্বি ভেজাল দিয়ে কেমন করে নিজের পরিবারের সকলের মৃত্যু ডেকে আনল, আর তারপর ভেজালদারের একমাত্র জীবিত কন্যা পদ্মা উন্মাদিনী হয়ে গিয়ে কীভাবে জ্বলন্ত ভাষায় জগতের সমস্ত লোভী মুনাফাখোর আর ভেজালদারদের উদ্দেশে অভিসম্পাত দিয়ে বেড়াতে লাগল, এ তারই কাহিনি।

আধুনিক কোনো 'একাঙ্কিকা নাটিকা'র নাট্যকার বরুণের নাটককে কানাকড়িও মূল্য দেবে কিনা সন্দেহ। বরং হয়তো তার মোটা আদর্শ, আর তার মোটা প্রকাশভঙ্গি দেখে কৌতুকের হাসি হাসবে, তবু বরুণরাও একেবারে অসার্থক নয়। তাদেরও গুণগ্রাহী আছে, তাদেরও শ্রোতা আছে, দর্শক আছে।...সূক্ষ্ম রসের সমজদারই বরং কম। এই মোটা রসের মানুষই তো দেশজুড়ে। দেশ যতই তার সাহিত্য আর শিল্পের উৎকর্ষের বড়াই করুক, আজও নাটকান্তে নায়িকাকে পাগলিনী করে ছেড়ে দিয়ে তার মুখের অসংলগ্ন ভাষার মধ্যেই নাট্যকারেরও মূল বক্তব্যটি চালিয়ে দেওয়ার যুগ প্রায় অবিচলই আছে।

কাজেই কুঞ্জ অধিকারী বরুণের মুখে নাট্যকাহিনি শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়, আর কল্পিত এক আসরে বসে হাজার হাজার করতালির ধ্বনি শুনতে পায়।

হঠাৎ তাই বরুণের হাতটা চেপে ধরে কুঞ্জ বলে, 'এইটাই তুমি ভালো করে খাড়া করে ফেল লেখক! কলকাতার পুরনো রাজবাড়ির যাত্রা 'অপেরা' কম্পিটিশনে এটাই নামাব।'

বরুণ ওই আসায় উদ্‌বেল আগ্রহ-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকায়, আর আস্তে আস্তে হাসে। বলে, 'সবটা করে দেখি কেমন দাঁড়াবে।'

'তোমার হাতে আবার কেমন দাঁড়াবে! অপূর্বই দাঁড়াবে।' কুঞ্জ ওর হাতটা আরও জোরে চেপে ধরে বলে, 'নাট্যকার, তুমি কখনও আমায় ছেড়ে যেও না।'

বরুণের মুখে আসছিল, 'স্রোতের শ্যাওলা কি কখনও এক জায়গায় আটকে থাকে?' কিন্তু বলতে পারল না। ওই বয়স্ক লোকটার নির্ভরতায় ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। তারপর লেখা কাগজগুলোয় মন দিল।

একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কুঞ্জ উঠে গেল। কুঞ্জ একা পায়চারি করতে করতে ওই জ্বলন্ত ভাষা আর চারুহাসিনীকে মনে করতে থাকে।

পারবে কি? পারবে বোধহয়! কলকাতার পুরানো রাজবাড়ি থেকে ঘোষণাটা একবার পেলে হয়।

কিন্তু হল একটা ব্যাপার।

কলকাতার ডাক আসবার আগেই মহিষাদল থেকে একটা ডাক আসে। জমিদারি না থাক জমিদার-বাড়ি। এখনও পুরানো ঐতিহ্য রয়ে গেছে। একমাত্র ছেলের পৈতে, সেই উপলক্ষে বিরাট ঘটা আর সেই ঘটনা উপলক্ষে যাত্রা আর কবিগান দেবেন তাঁরা। দুর্গাপুজো মারফত কুঞ্জ অধিকারীর পালার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে, তাই তাকেই খবর পাঠিয়েছেন।

কুঞ্জ বলে, 'আমি বলি কি নাট্যকার, তোমার ওই নতুন পালাটাই লাগিয়ে দিই।'

বরুণ বিস্মিত হয়। বলে, 'রিহার্সালের সময় কোথা?'

'হবে, হয়ে যাবে।' কুঞ্জ আগ্রহের গলায় বলে, 'পিটিয়ে পিটিয়ে করে তুলব। মেদ্‌নীপুরের লোকের তোমার গিয়ে এই সব চেতনা বেশি। সেখানে তোমার এ পালা নামালে দেখবে কাণ্ড!'

বরুণ হাসে, 'দেখুন!'

কুঞ্জ কিন্তু হাসে না। কুঞ্জ সিরিয়াস গলায় বলে, 'দেখব না, দেখেছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক নাট্যকার, কোনো বাধাকেই ভয় করি না।'

বলে বটে। অথচ ভাবে বরুণ তার কে? বরুণ তার নাটকের নাট্যকার, এইমাত্র। বলতে গেলে পথে কুড়োনো। আর বলতে গেলে কুঞ্জরই গঠিত বিগ্রহ।—

কোথায় যেন দল নিয়ে চলেছে কুঞ্জ, হঠাৎ রুক্ষুমাথা, ধুলোভর্তি পায়, আধময়লা ধুতি শার্ট পরা ছেলেটা রেলগাড়িতে উঠে পড়ে বলে, 'পয়সা নেই, বিনাটিকিটে উঠেছি, আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন না।'

চমৎকৃত কুঞ্জ 'চমৎকার' ভাবটা গোপন করে বলে, 'তা খামোকা আমি তোমার রেলভাড়াটা দিয়ে দেব কেন হে বাপু? তুমি আমার কে, বাপের ঠাকুর চোদ্দপুরুষ?'

ছেলেটা দমেনি। বলেছিল, 'এরাই বা আপনার কে? এই যে দলবল নিয়ে যাচ্ছেন?'

'এরা? এরা তো আমার দল। 'ভবানী অপেরা'র নাম শুনেছ? আমি হচ্ছি তার প্রোপ্রাইটার কুঞ্জবিহারী দাস।'

ছেলেটা বলেছিল, 'নাম শুনিনি, এই শুনলাম। তা বেশ তো, আমাকেও দলের লোক করে নিন।'

চাইছে, অথচ প্রার্থীর ভাব নেই, যেন দাবির সুর। কুঞ্জর ভালো লেগে গেল। হাত কচলানো কৃপাপ্রার্থী দেখে দেখে অরুচি। আর তা না হল তো তেজে মটমট! এর ভাব আলাদা! কুঞ্জ সকৌতুকে বলল, 'তা দলে না হয় নিলাম। কিন্তু তোমার কি গুণ আছে শুনি?'

ছেলেটা বলল, 'গুণ কিছু নেই, তবে যাত্রা-নাটকের পালা লিখতে পারি কিছু কিছু।'

পালা লিখতে পারে! আহা-হা, এই লোকই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে কুঞ্জ—যার ক্ষমতা আছে, অথচ আত্মঅহমিকাবোধ নেই। এর নেই, দেখেই বুঝেছে কুঞ্জ। নিজের গুণ সম্পর্কে যেন তাচ্ছিল্য ভাব! ব্যস্ সেই রেলগাড়িতেই হয়ে গেল সম্পর্ক স্থাপন।

তারপর—কুঞ্জর উৎসাহ, প্রেরণা আর বরুণের সহজাত ক্ষমতা। কুঞ্জ অবশ্য বলে, 'লেখাপড়া জানা ভদ্দর।' কিন্তু বরুণ নিজে কোনোদিন নিজের পরিচয় দেয়নি। বলে, 'মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো রাস্তার ছেলে! ব্যস্। এই হচ্ছে আমার পরিচয়।'

তবু কোথায় যেন দূরত্ব আছে। আছে অভিজাত্য। কুঞ্জ তাকে 'বশ করে কেনবার' সংকল্প নিয়ে নিজেই বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে। কুঞ্জ তার মহিমায় বিবশ। কুঞ্জ দলের আর সকলের উপর রাজা, বরুণের কাছে প্রজা, তাই বরুণ থাকলে সে আর কিছু ভাবে না।

মহিষাদলে যাবার তোড়জোড় চলে, আর চলে জোর মহলা। কয়েকদিনের মধ্যে তৈরি করতে হবে।

হঠাৎ এই মোক্ষম সময়, যখন আর দিনতিনেক দেরি, চারুহাসিনী পড়ল জ্বরে। রীতিমতো জ্বর। যে চারুহাসিনীর ভূমিকা উন্মাদিনী নায়িকার।

কুঞ্জ নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গুঁড়ো করতে যায়। কুঞ্জ বুকে কিল মারতে যায়। এখন কী করবে সে? নববালা? বাসমতী? ছি ছি!

হঠাৎ বরুণ বলে বসল, 'ভাবছেন কেন অত? আপনার লিলিকে নামিয়ে দিন না।'

লিলি! কুঞ্জ দাস হকচকিয়ে বলে, 'সে কী!'

'কেন, অবাক হবার কি আছে?' বরুণ অবহেলাভরে বলে, 'রিহার্সাল শুনে শুনে তো ওর মুখস্ত। যখন তখনই তো আওড়ায়। গানও তোলে।'

ইদানীং আর অনেকদিন কমবয়সী ছেলের পার্টের দরকার হয়নি। তাই লিলির কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিল প্রোপ্রাইটার। লিলি শুধু কোমরে বেল্ট বেঁধে সেই কোমরে হাত দিয়ে দলের ওপর সর্দারি করে বেড়ায়।

কুঞ্জ সে খোঁজ রাখে না, তাই কুঞ্জ অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বলে, 'মুখস্ত হলেই তো হল না হে! মানবে কেন? ওটা হল একটা যুবতী মেয়ের পার্ট।'

বরুণ অন্যদিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, 'আপনার লিলিকে তাতে বেমানান হবে না। ঘাগরা ছাড়িয়ে শাড়ি পরিয়ে দেখুন গিয়ে।'

কুঞ্জ তথাপি হাসে, 'আহা, গড়নটা একটু বাড়ন্ত, তা বলে কি বয়েসের ভাবটা আনতে পারবে?'

বরুণ তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'পারে কি না, আসরে নামিয়ে দিয়ে দেখুন। বয়েস আর ছোটো নেই ওর।'

বরুণের মুখে আরও আসছিল—বলে 'আর ওই নিমাই কোম্পানির দলে ছেড়ে দিয়ে আড়াল থেকে দেখুন।'

কিন্তু বলে না। ভাবে, আমার কি দরকার! মেয়েটাকে সে ওই পাকামির জন্যেই দেখতে পারে না। তবে অস্বীকার করতে পারে না, মেয়েটার মুখস্থ করার ক্ষমতাটা।

ওরা যে যার পার্ট রিহার্সাল করে, লিলি শুনে শুনে সবাইয়ের পার্ট মুখস্থ করে ফেলে। ভাবভঙ্গি কিছুই বাদ যায় না। গানও তোলে। তবে কুঞ্জ সম্পর্কে সাবধান থাকে। কুঞ্জ বাড়ি থাকলে গলা তোলে না, পাছে বকে। বকবে, এই ধারণাটাই ছিল লিলির।

বরুণের কাছ থেকে লিলির নাম প্রস্তাবে কুঞ্জ খুব একটা আশান্বিত না হলেও, ঈষৎ কৌতূহলাক্রান্ত হয়েই ডেকে পাঠাল লিলিকে। তারপর বলল, 'তুই পার্ট মুখস্থ করিস?'

লিলি ভয় পেল। বলল, 'না তো।'

'না? তবে যে বরুণ বলল! ওকি মিছে কথা বলবার ছেলে?'

লিলি ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'না, মোটেই নয়! আমার নামে তোমার কাছে মিছে মিছে লাগিয়েই তো ও তোমার সুয়ো হয়েছে।'

'এই দেখো। নিন্দে কোথায়? সুখ্যাতি তো! বলছিল, লিলি ঠিক চারুর মতোন পার্ট বলতে পারে। লিলির গানের গলা আছে।'

লিলি সন্দেহের সুরে বলে, 'তুমি বানাচ্ছ।'

'এই দেখো! আমার বানাবার দরকার কি? তবে ভাবলাম চারুর তো জ্বর, কে ওই পদ্মার পার্টটা করবে। বরুণ বলছিল তোর নাকি সব মুখস্থ!'

লিলি এবার পুলকিত হয়। অতএব বলে ওঠে, 'শুনে শুনে মুখস্থ করেছি, বলব?'

কুঞ্জ প্রসন্নমুখে বলে, 'বল।'

লিলি মনশ্চক্ষে আসরের মাঝখানে নিজের শাড়িপরা মূর্তিটাকে দেখতে পায়। যে মূর্তি জ্বলন্ত ভাষায় বলছে, 'পাপ! পাপ! পাপের ভারে জর্জরিত পৃথিবী দুঃহাত তুলে আর্তনাদ করছে...শুনতে পাচ্ছ না তোমরা? ওই পাপ মায়ের বুক থেকে স্নেহ ছিনিয়ে নিচ্ছে, নারীর প্রাণ থেকে ভালোবাসা। আর পুরুষ জাতকে? শয়তানে পরিণত করেছে, নিষ্ঠুর নির্মম লোভী শয়তান! যে শয়তান ধর্ম মানে না, বিবেক মানে না, মানে না লজ্জা ভয়।...এই পাপের একটা পোশাকী নাম আছে, জানো তোমরা? জানোনা? হাঃ হাঃ হাঃ। সে নামটি হচ্ছে সোনা! বুঝলে?...যার পিপাসা রাবণের চিতার মতো শুধু জ্বলছে। নিবৃত্তি নেই।...এত সোনা দিয়ে কি করবে গো? খাবে? বিছানা পেতে শোবে? হাঃ হাঃ হাঃ। মরণকালে কিসে করে নিয়ে যাবে? লোহার সিন্দুকে?:..'

পাগলিনীর সুর, পাগলিনীর ভঙ্গি। চোখে-মুখে কায়দা! কুঞ্জও পাগল হয়ে ওঠে। উদ্‌ভ্রান্তের মতোন বলে, 'শাড়ি নিয়ে আয় একটা, মাটিতে আঁচল দুলিয়ে পর, চুলের দড়ি খুলে ফেল।'

'তোমার তেত্রিশ কোটির দিব্যিটা একদিনের জন্যে বাতিল করবে?'

উত্তেজিত কুঞ্জ দাস ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলে, 'এ শুধু হতভাগা কুঞ্জ দাসের মেডেল নয়, তোমার লিলির মেডেল! আসরে নেমেই বাজিমাৎ! ফার্স্ট নাইটের মেডেল! বাড়ির কর্তা একটা দিল, আর মহারাজ গর্গ বাহাদুর একটা। কী হাততালির ঘটা! আসর ফেটে যায় একেবারে! হাজার হাজার দর্শক লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল। তখনি পাশের গাঁয়ে আরও একটা বায়না হয়ে গেল।'

ঘর থেকে সাড়া নেই। ঘর নিঃশব্দ! কুঞ্জ দাস গলা চড়ায় 'কথাগুলো কানে গেল না বুঝি? স্বভাবটি চিরকাল এক রইল। দেমাকীর রাজা! বলি মেডেলটা দেখা হবে? না কি তাতেও অগ্রাহ্যি?... তিন বছরের শিশুটাকে চোখ ছাড়া করে রেখে দিয়েছিলে, সে আজ মেডেল লুটে এনেছে, হাজার হাজার লোকের ধন্যি ধন্যি কুড়িয়েছে, এতেও নিয়ম ভেঙে একবার উঁকি দেওয়া যায় না?'

এবার ঘরের মধ্যে থেকে স্বর আসে। শীতল কঠিন।

'মেডেলটা লুটেছে তো আসরে নেচে কুঁদে?'

হঠাৎ কুঞ্জ দাস যেন মাথায় একটা লাঠির ঘা খায়। লিলির ওই অভাবনীয় সাফল্যে কুঞ্জ যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, কুঞ্জ বুঝি নিজের নীতিও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। কম বয়েসে বিয়ে দিয়ে যাত্রার দল ছাড়া করে ঘরগেরস্থী করে দেবে লিলিকে, এই সংকল্পটার কথা মনেও ছিল না আর!

কুঞ্জ আজ ক'দিন ধরে স্বপ্ন দেখছিল, আলোকোজ্জ্বল আসরে লিলি! আসর ফাটাচ্ছে, হাততালি কুড়োচ্ছে, মেডেল লুঠছে...! বারবার, বহুবার। অজস্র জায়গায়। অজস্র আসরে।

কুঞ্জ স্বপ্ন দেখছে, কলকাতার যাত্রা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে কুঞ্জর 'ভবানী অপেরা পার্টি' থিয়েটারের মালিকরা এসে চুপি চুপি ধরনা দিচ্ছে মেয়েটাকে ভাঙিয়ে নেবার জন্যে।....আর কুঞ্জ সগর্ব হাস্যে বলছে, 'আজ্ঞে না বাবুমশায়, ও আমার মেয়ে, নিজের মেয়ে। ওকে আমি—'

আর কুঞ্জ স্বপ্ন দেখছে, চারুহাসিনীকে আর তোয়াজ করতে হচ্ছে না, বার বার রিহার্সাল দেওয়াতে হচ্ছে না।

কুঞ্জর ঘরের মধ্যে এমন দামি রত্ন ছিল, আর কুঞ্জ তার খবর রাখত না? কুঞ্জ নিজেকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ভাবছিল।....আর ভাবছিল, এই ভয়ঙ্কর আহ্লাদের ঢেউতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অন্তরালবর্তিনীর তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা।

দু'জনে পাশাপাশি বসে দেখবে লিলির মেডেল। সত্যিকারের মা বাপের মতো। কুঞ্জ যে ওর কেউ নয় বলতে গেলে শত্রুপক্ষ, তা তো কুঞ্জর মনে নেই। নিঃসন্তান কুঞ্জর অপত্য স্নেহটা ওইখানে গিয়েই পড়েছে।

তবু কুঞ্জ যেন ঠিক ভোগ করতে পায় না। সন্তানকে সন্তানের মায়ের সঙ্গে না দেখলে কি সত্যকার আস্বাদ পাওয়া যায়? সেই আস্বাদ পেতে ছুটে এসেছিল কুঞ্জ! আগ্রহের মন নিয়ে। সেই মনে লাঠি খেল।

পাথরের দেওয়াল বলে উঠল, 'মেডেল তো আসবে নেচে কুঁদে?'

কুঞ্জ ওই লাঠির ঘায়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর কুঞ্জর নিজস্ব স্বভাব ফিরে এল। চড়া গলায় বলে উঠল, 'কুঞ্জ অধিকারী তোমার মেয়েকে বাইজীর নাচে নাচায়নি।'

ভিতরের গলা সমান ঠাণ্ডা। 'মেয়ে আমার নয়, মেয়ে অধিকারীরই। তবে গোড়া থেকে শুনেছি কি না অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে ঘরগেরস্থী করে দেওয়া হবে—'

কুঞ্জ সক্রোধে বলে, 'তা সেটা হবে না, কে বলল? নিরুপায়ে পড়ে একদিন নামিয়ে দিলাম, মেয়ের এমন ক্ষ্যামতা যে তাতেই ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল, মেডেল চলে এল, সেই কথাই আহ্লাদ করে বলতে এসেছিলাম। ওকে কি আমি দলে ভর্তি করে ফেলেছি?'

'আর করতে হবে না, ও নিজেই হবে।'

'নিজেই হবে!'

'হবে। 'বাহবা'র নেশা মদের নেশার বাড়া। উচ্ছন্ন দিতে সময় নেয় না।'

কুঞ্জ উত্তর খুঁজে পায় না। তাই কুঞ্জ হঠাৎ একটা বেআন্দাজী চড়া কথা বলে বসে, কড়া আর চড়া বিদ্রূপের গলায়, 'তাই নাকি? কিন্তু ওর মায়ের তো এত 'বাহবা' জোটেনি, তবু উচ্ছন্ন যেতেও আটকায়নি।' বলে ফেলে কুঞ্জ নিজেই থতোমতো খেয়ে যায়। একথা বলার ইচ্ছে তো তার ছিল না।

কিন্তু কুঞ্জকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এটা হাসি শোনা যায়। সত্যিকার খোলা গলার হাসি। তার সঙ্গে কথা, 'কে বললে 'বাহবা' জোটেনি? বাহবা না জুটলে উচ্ছন্নে যাবার পথটা পরিষ্কার হল কিসে?'

'বাহবা! হুঁ! বাহবাটা কিসের?'

'কেন, রূপের!'

রূপের! রূপের! ঝনঝনিয়ে উঠল রক্তকোষগুলো। সে রূপ বহু—বহুকাল দেখেনি কুঞ্জ। যে রূপের প্রতিমাকে হারিয়ে পৃথিবী বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল তার কাছে, আর যে রূপ এই দীর্ঘকাল হতভাগা কুঞ্জ দাসকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সেই রূপের উল্লেখ! সহসা শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে ওঠে কুঞ্জর।

কুঞ্জ সহসা চিৎকার করে বলে ওঠে, 'তা এতই যদি রূপের গরব, সেই রূপ ভাঙিয়ে খেলেই হত! এই গরিব হতভাগাকে বাঁদর নাচাবার দরকারটা কি ছিল?' কুঞ্জ এবার জিভ কামড়ায়, কুঞ্জ নিজের মুখের উপর নিজে থাবড়া মারে। কিন্তু হাতের ঢিল, আর মুখের কথা!

আশ্চর্য, আজই তো সবচেয়ে উৎফুল্ল মন নিয়ে এসেছিল কুঞ্জ। আশাভঙ্গ হল? তা না হয় তাই হয়েছে, তাই বলে কুঞ্জ এমন রূঢ় কথাটা বলবে? তার মানে, ওই মানুষটা ধরে নেবে, এই বিষ মনে পুষে রেখে সরলতার ভান করে নিয়মিত আসা যাওয়া করছে লোকটা, উদারতা দেখিয়ে টাকা দিচ্ছে। কুঞ্জ মরমে মরে যায়।

কিন্তু যাকে ওই বাক্যবাণটি বেঁধা হল, সে মরমে মরেছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না। সে দিব্য স্বচ্ছন্দে জবাব দিল, 'মরতে বসেছিলাম যে! এখন তো সে পথ বন্ধ!'

'ওঃ! ওঃ! কুঞ্জর আবার সর্বশরীরে আগুনের হল্কা ছুঁয়ে যায়। সমস্ত স্থৈর্য হারায়। কুঞ্জর সত্যিই মনে হয়, এই দীর্ঘকাল ধরে সে যেন একটা বদ মেয়েমানুষের হাতের সুতোর তালে বাঁদর নাচ নাচছে। এখন সে হি হি করে বলছে—'মরতে বসেছিলাম! উপায় ছিল না।...তাই তোমার মতোন বোকা গাধাটার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। না হলে....ভাঙাতাম রূপ! বিধাতার দেওয়া ব্যাঙ্ক নোট!'

এরপরও কুঞ্জ স্থৈর্য হারাবে না? কুঞ্জ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'ওঃ তাই! তাই—পাখিজুখি খাই না আমি ধম্মে দিয়েছি মন!' আর আমি শালা একটা লক্ষ্মীছাড়া বদ মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে—আবার ঢং কত! 'মেয়ে আমার আসরে নেচেছে, বাইজী হয়ে গেছে!' ঠিক আছে, ও মেয়ে আর আমি রাখছি না। যার মেয়ে তার কাছে দিয়ে যাব, ব্যস! এই আমার সাফ্ কথা!'

কুঞ্জ দালানের ধার থেকে ছাতাটা তুলে নেয়। ভিতর থেকে ঈষৎ ব্যস্ত গলা শোনা যায়, 'তা ঝগড়াটা তোলা থাক না এখন, হাতমুখ ধোওয়া হোক!'

'হাতমুখ ধোওয়া?' কুঞ্জ ছিটকে ওঠে, 'আবার এখানে জলগ্রহণ করব আমি?...ভেবেছিলাম অনুতাপে নাকি সব পাপ ধুয়ে যায়। তবে কেন আর...যাক্, ভালো শিক্ষাই হল। এই যাচ্ছি, কাল-পরশু এসে মেয়েকে ফেলে দিয়ে যাব, ব্যস!'

কুঞ্জ ছাতাটা নিয়ে গট্ গট্ করে চলে যায়। বৃষ্টি পড়ছিল ঝির-ঝিরিয়ে, তবু ছাতাটা হাতেই থাকে।

আজ আর স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে না, এখনও ট্রেন আছে। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে বসে। আর অবাক হয়ে ভাবে, কী করতে এসেছিলাম আমি, আর কী করে গেলাম!...আচ্ছা, কী কী

বললাম আমি।...মনে করতে পারল না, শুধু নিজের উপর অপরিসীম ধিক্কারে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। অথচ একটানা অনেকদূর যাবার পথ নয়, দেহটাকে নিয়ে বহু টানা-হেঁচড়া করে তবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে। দল এখনও মহিষাদলে পড়ে। এই টানা-হেঁচড়া করেই এসেছিল, তখন গায়েও লাগেনি, এখন যেন আর দেহ চলছে না।

আশ্চর্য এতদিন ধরে কী করেছে কুঞ্জ? কুঞ্জ কি পাগল হয়ে গিয়েছিল? নাকি কুঞ্জকে কেউ মন্ত্র প্রয়োগ করে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল? নইলে কুঞ্জ তার কুলত্যাগিনী স্ত্রীর একটা 'তু' ডাক পেয়ে ছুটে গিয়ে তার বিপদে বুক দিয়ে পড়তে গেল?

বিপদ কি, না তার সেই পাপের সঙ্গীর মৃত্যু! কুঞ্জ তো তখন তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে আঙুল তুলে বলতে পারত, 'ঠিক হয়েছে! বোঝো—পাপের ফল!' পারত, অথচ কুঞ্জ তা করল না।

কুঞ্জ সযত্নে তার সেই পরম শত্রুর শেষকৃত্য করল, কুঞ্জ তার কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে 'মরতে বসা' থেকে রক্ষে করল, আর তার একটা অবৈধ দায়িত্ব ঘাড়ে করল।

কুঞ্জ নিজেকে প্রশ্ন করে, কিসের লোভে এসব তুই করেছিলি হতভাগা? কিসের প্রত্যাশায়? কিছু না। তবে? নিশ্চয় ওই মেয়েমানুষটার গুণ-তুকের ফল। নইলে ওই তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষকে এত ভয়ই বা কেন তার? তাই কিছুতেই সাহস সংগ্রহ করে একবার ঘরে ঢুকে পড়তে পারে না। বলতে পারে না, দেখি—সত্যিই তুমি সেই উমা কিনা!

আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত ওর মুখ দেখল না কুঞ্জ, অথচ মাস মাস মাসোহারা ধরে দিয়ে যাচ্ছে! আর সেও দিব্যি অম্লান বদনে নিয়ে চলেছে। ভালো মেয়ে হলে নিতে লজ্জা হত না? সেই, সেই কথাই ভাবা উচিত ছিল কুঞ্জর। আর ঠাট্টা করা উচিত ছিল, মুখ দেখাতে লজ্জা তোমার, অথচ মুখে হাত তোলার খরচাটি নিতে তো লজ্জা নেই?

কিছু বলতে পারেনি কুঞ্জ। শুধু গাধার মতো গিয়েছে, আর টাকাটি দিয়ে চলে এসেছে। যেন তিনি নিলেই কৃতার্থ! যত ভাবে ততই যেন নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে কুঞ্জর। 'চৈতন্য হবার' যে এত যন্ত্রণা, তা জানত না কুঞ্জ।

কুঞ্জ ওই লিলিকে দিয়ে যাবে, ব্যস্!

ভাবনার খেই ছেড়ে কুঞ্জকে গাড়ি বদল করতে হয়। এরপর আবার দু'বার বাস বদল করতে হবে কুঞ্জকে।

আসর থেকে ফিরে আসতেই কুঞ্জ লিলিকে প্রায় কোলে করে নেচেছিল। দলের সবাই অভিনন্দন জানিয়েছিল।...এমন কি নাক-উঁচু বরুণও হঠাৎ ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিল, 'তোর উন্নতি হবে।'

শুধু বাসমতী আর নববালা মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'ওসব মেডেল হচ্ছে রূপের, আর হাততালি হচ্ছে বয়েসের!'

কিন্তু সে তো বলেছিল আড়ালে। লিলি যেন আহ্লাদে, গর্বে, বিস্ময়ে, বৈকল্যে কেমনধারা হয়ে গিয়েছিল! এ যেন লিলি স্বপ্ন দেখছে।

লিলির মধ্যে এত ক্ষমতা ছিল! লিলির মধ্যে এমন আশ্চর্য শক্তি! ভাগ্যিস চারুর জ্বর হয়েছিল!

অভিভূত ভাবটা কাটলে লিলি হঠাৎ অন্য দিক দিয়ে ভাবতে শুরু করল। আর তখন লিলির মনে হল, ওই অধিকারী তার পরম শত্রু। কাউকে বুঝতে দিচ্ছিল না। এমন কি কুঞ্জকেও না। ছেলেবেলায় ধুতি পরিয়ে পরিয়ে বেটাছেলে সাজাত, বড়ো হয়ে অবধি আর সাজতেই দেয় না। শুধু খুকি সাজিয়ে রেখে দেয়। আবার বিয়ের জন্য ব্যস্ত।

তার মানে লিলির এই মস্ত গুণটাকে ফুটতে না দেবার ইচ্ছে। তবে? শত্রু ছাড়া আর কি?

নেহাত চারুহাসিনী জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, তাই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে! তাও সেই একদিনের জন্যেই।

আগে থেকেই গাওনা হচ্ছে—'একটা দিন করে দে, ভয় খাসনে। ভয় কি?'

মুখের সামনে হাত-আয়না ধরে অনেকক্ষণ নিজের মুখটা দেখল লিলি। তারপর পনেরো বছরের লিলি ভাবল, এত রূপ গুণ থাকতে আমি কেন বেচারীর মতো পড়ে থাকব? পোপাইটার যেন দয়া করে রেখেছে। দয়ার কি ধার ধারি?

এই তো নিজগুণেই বাজার মাৎ করে ফেললাম। ওই লেখক মুখপোড়া তো দু'চক্ষের বিষ দেখে আমায়, কিন্তু যেই আমার নাম-যশ হয়েছে, অমনি সেধে সেধে গায়ে পড়তে এসেছে।

হাসিতে পেট ফুলে উঠল।....আসবে, সবাই আসবে।—ভালো ভালো পার্টি লুফে নিতে চাইবে। সেখানে কত মান, কত যশ, কত টাকা! এই তো চারুহাসিনীর কত মাইনে! লিলির আরও বেশি হবে, কারণ লিলির রূপ আছে।

কিন্তু এই স্বার্থপর কুঞ্জ দাসের কাছে পড়ে থাকলে? একটি পয়সাও না। এই তো আগে কত পার্ট করেছে। হোক গে ছেলের পার্ট, হোক গে একটুখানি, তবু পার্ট তো? কই তার দরুণ দিয়েছে একটা পয়সাও লিলিকে? দেবে কে? লিলি যে তাঁর কেনা! কেন? তিন বছরের একটা মেয়েকে পুষে তার মাথাটা জন্মের মতো কিনে নিয়েছেন! স্বার্থপর! বেহায়া! কুটিল!

লিলি আর এই স্বার্থপরতা সহ্য করতে পারবে না। লিলি পথ দেখবে। লিলি সেই পথ দেখার চেষ্টায় নিমাইকে ধরে পড়ে। বলে, 'নিমাইদা, কলকাতার রাজবাড়িতে আর দরকার নেই, চল—ভেগে পড়ি এইবেলা।'

নিমাই পাকা-চোকা ছেলে। নিমাই ওর হাত ধরে বলে, 'কী সাজই সেজেছিলি, বাস্তবিক মনে হচ্ছিল পরী!'

বাচ্চা লিলি চোখমুখ ঘুরিয়ে বলে, 'আহা, সাজ তো কত! পাগলিনী!'

'ওতেই তো আসরসুদ্ধ লোককে পাগল করে দিয়েছিলি বাবা! যে করে গিলছিল সবাই, মনে হচ্ছিল আমার জন্যে আর কিছু রাখবে না।'

'ভাগ্ ছোটোলোক!' লিলি বাসমতীদের মতো ভঙ্গি করে।

তারপর ওরা বিচার করে সিদ্ধান্ত করে, এত গুণ নিয়ে এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। এখানে প্রাণপাত করেও বড়োজোর দু'খানা মেডেল, আর দুটো তোয়াজী কথা! তার বেশি নয়। তাছাড়া 'ভবানী অপেরা'র পালার বহরে তো শুধু ওই, পাগলিনী সাজ! 'লাভ' নেই, রস নেই, সাজাগোছা নেই। অথচ অন্য অন্য পার্টিতে? রানি সাজো, মহারানি সাজো, প্রেমিকা সাজো। যাত্রার আসরের প্রেমিকা আর রানি মহারানি ছাড়া আর অন্য কিছুই ভাবতে পারে না লিলি নিজেকে।

অতএব ঠিক হল, নিমাই আর লিলি নিজেরাই একটা দল খুলবে। ব্রজটাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, লোকটা অধিকারীকে মোটেই দেখতে পারে না। বলা যায় না, জগাও যেতে পারে। অধিকারী বলবে অকৃতজ্ঞ? বললে তো বড়ো বয়েই গেল।—নিজে যে এতো স্বার্থপর?

বিবেকমুক্ত হল লিলি। নিমাই তো হয়েই ছিল।

কলকাতার 'কম্পিটিশান' পর্যন্ত আর ধৈর্য ধরছে না তাদের। তাছাড়া—লিলি বায়না ধরেছে আগে তাদের বিয়েটা সারা হয়ে যাক, তারপর যা হয় হবে।

প্রথমটা অবশ্য নিমাই বলেছিল, 'বিয়ে করলে তো বৌ হয়ে গেলি। ঘরের বৌকে কি আমি আসরে নাচাব?'

লিলি রেগে উঠে বলেছিল, 'তবে বিয়েটা কার সঙ্গে হবে শুনি? না কি হবেই না? তবে আমি তোমার সঙ্গে যাবই না।'

অতএব বিয়ে। কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর নেওয়া। সে জানে, ব্রজ সব রকম সাহায্য করবে।

রাত্তিরে আর ফেরা সম্ভব হল না। রাতটা হাওড়া স্টেশনে খেয়ে আর শুয়ে সকালের গাড়িটা ধরল কুঞ্জ—মেদিনীপুরের। পাঁশকুড়া থেকে বাসে তমলুক, তমলুক থেকে মহিষাদল।

রাত্রে খেয়ে আর শুয়ে হঠাৎ আশ্চর্যভাবে চিন্তার ধারাটা ঘুরে গেল কুঞ্জর। সমস্ত রাগ ঘৃণা ধিক্কার ঝাপসা হয়ে গিয়ে ভয়ানক একটা লজ্জায় যেন ঝুলে পড়ল কুঞ্জ। কী করে এসেছে সে! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে এসেছে! ভুল মানুষেরই হয়, ওরও হয়েছিল, কিন্তু সেই ভুলের খেসারতও দিতে হয়েছে কম নয়!

কুলত্যাগ করে চলে গিয়েও বিপদে পড়ে যে তার স্বামীকে মনে পড়েছিল, এতে কি বোঝায়? অথচ আজ কুঞ্জ সেই বিশ্বস্ত প্রাণটাকে পায়ে মাড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে এল!

কুঞ্জ টাকার খোঁটা দিল। ছি ছি! এত নীচ কি করে হল কুঞ্জ? যদি এই ধিক্কারে 'ও টাকায় খেয়ে আর বেঁচে দরকার নেই' ভেবে আত্মঘাতী হয় উমা? হতে পারে। চিরকালের অভিমানিনী। মরবেই হয়তো। তাহলে বলতেই হবে, কুঞ্জ লোকটা খুনী! একটা মানুষের মৃত্যুর কারণ মানেই খুনী!

এখন কুঞ্জ যত ভাবতে থাকে, তার নিজের দিকের পাল্লাটা ততই অপরাধের ভারে ঝুঁকে পড়ে। মনের অগোচর পাপ নেই, লিলির সেদিনের সাফল্যে কুঞ্জ পূর্বের সমস্ত সংকল্প বিসর্জন দিয়ে ভাবেনি কি, বরাবরের মতো নায়িকার অভাব মিটিল কুঞ্জর? আর চারু ফারুর তোয়াজ করতে হবে না।...তার মানেই উমা যা বলেছে তাই।

ওকে সময়ে বিয়ে দিয়ে সংসারী করার ইচ্ছেটা আমার ছল। যেই স্বার্থের গন্ধ পেয়েছি সেই ছল উড়ে গেছে।

হঠাৎ একটা অসমসাহসিক প্রতিজ্ঞা করে বসে কুঞ্জ দাস। হ্যাঁ, দু'একদিন পরেই লিলিকে নিয়ে তার মায়ের কাছে যাবে কুঞ্জ, কিন্তু একা লিলিকে নিয়ে নয়, 'জোড়ে' নিয়ে। দেখিয়ে দেবে উমাকে সবটাই তার ছল ছিল না।—বরুণের কাছে হাতজোড় করে বলবে, 'এই বিয়েটা না হলে একটা লোক আত্মঘাতী হবে। এ তোমাকে করতেই হবে।'

কুঞ্জ যখন পৌঁছল, তখন সকালের সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশে। কুঞ্জ বসে পড়ে বলল, 'এক গেলাস জল!'

জল দিল বাসমতী। দু'চক্ষে যাকে দেখতে পারে না কুঞ্জ।

জলটা তক্ষুনি চোঁ-চোঁ করে খেয়ে না নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'লিলি কোথায়?'

বাসমতী খনখনে গলায় বলে উঠল, 'সেই সকালে উঠে কোথায় কি কালীঠাকুর আছে, সেখানে নাকি নরবলি হত, তাই দেখতে গেছে।'

কুঞ্জ আঁৎকে ওঠে, 'একলা?'

'একলা কেন?' বাসমতীর গলা আরও খন্‌খনায়, পেরাণের বন্ধু নিমাইদা গেছেন সঙ্গে—'

'থামো, চুপ করো।' কুঞ্জ ওর বিরক্ত চিত্তের ভাবটা এটা প্রচণ্ড ধমকের মধ্যে দিয়ে কিছুটা লাঘব করে নিয়ে বলে, 'এলে আগে আমার কাছে আসতে বলবে।'

তারপর কুঞ্জ ও-বাড়ি চলে যায়। যে বাড়িতে বরুণ আছে।

যারা 'ভবানী অপেরা'কে এনেছিল তাদের মেয়াদ মিটে গেছে, তবে পাশের পাড়ায় আর একটা বায়না জুটেছে বলে কুঞ্জর দলকে এরা থাকতে দিয়েছে। কিছু লোককে কাছারি বাড়িতে, কিছু লোককে বসতবাড়ির বৈঠকখানায়। সেই কাছারি বাড়ির দোতলাতে বরুণের স্থিতি। কুঞ্জ সেখানে গিয়ে বসে।

বরুণ হাতের কাজ রেখে বলে, 'মিস্টার দাস এসে গেছেন? কতক্ষণ? স্নানটান হয়নি এখনও?'

কুঞ্জ অগ্রাহ্যভরে বলে, 'নাঃ! মরুকগে স্নান। দুটো কথা শোনার সময় হবে তোমার, বরুণ?'

বরুণ একটু চমকায়।

কুঞ্জ কখনো 'বরুণ' বলে ডাকে না।

তবু বরুণ সে প্রশ্ন তুলল না। শুধু বলল, 'কী আশ্চর্য, সময়ের অভাব কি? বলুন।'

'বরুণ', কুঞ্জ আবেগের গলায় বলে, 'আমার ওই মেয়েটাকে তোমায় নিতে হবে বরুণ!'

এবার বরুণ চমকায়।

আর প্রায় রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, 'কী বলছেন?'

'হ্যাঁ, জানি তুমি চমকে উঠবে', কুঞ্জ ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তবু তোমাকে এটি করতেই হবে। নচেৎ একটা মানুষ আত্মঘাতী হবে।'

বরুণ অবাক দৃষ্টিতে তাকায়।...লোকটা কি অসময়ে নেশা-টেশা করে এল নাকি! আস্তে বলে, 'আমি আপনার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কুঞ্জ জেদের গলায় বলে, 'মানে পরে বুঝো, তুমি আগে কথা দাও।'

'তাই কখনও সম্ভব, মিস্টার দাস—আপনিই বলুন?'

'কিন্তু অসম্ভবই বা কিসে বরুণ? লিলি দেখতে বলতে গেলে সুন্দরী, আর ধরে নাও আমার নিজেরই মেয়ে। কাজে কাজেই আমরা সর্বস্বই ওর, মানে তোমার হবে। জীবনের আর কোনো চিন্তা থাকবে না, তুমি শুধু নিজমনে লিখবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।'

বরুণ হেসে ফেলে। বলে, 'সুখে থাকব কি না জানি না, তবে স্বচ্ছন্দে থাকতে পাব তা ঠিক। এখন যেমন রয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় না-খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনি—আপনার সেই দয়ার ঋণ শোধ দেবার নয়। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনার সর্বস্ব পণ দিয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে হাতে তুলে দেবার মতো এমন কি দামি পাত্র আমি?'

'দামি! দামি!' কোহিনুর হীরে!' কুঞ্জ আতিশয্য দেখায়, 'চিনেছি বলেই বলছি। মেয়েটাকে বড্ড ভালোবাসি বলেই বলছি বরুণ! তা ছাড়া ও একজনার গচ্ছিত ধন, ওর যদি ভালো ব্যবস্থা না করি, ধর্মের কাছে পতিত হতে হবে আমায়।'

'কিন্তু আমি যদি বলি—' বরুণ দৃঢ় গলায় বলে 'আমার মতো একটা রাস্তার লোক, যার জাত-জন্মের ঠিক আছে কি নেই, তার হাতে তুলে দেওয়াটাও আপনার এমন কিছু ধর্ম হবে না।'

'সে আমার ভাবনা।'

কুঞ্জ আত্মস্থ গলায় বলে, 'জাতের পরিচয় কি তার গায়ে লেখা থাকে লেখক? থাকে তার আচরণে। ওই সনা ব্যাটা তো বামনা। ভট্চায্যি বামুনের ছেলে। ওর আচরণটা ভাবো? মনে হয় চাঁড়াল। আর এই আমি? কায়েতের ঘরের ছেলে, কী আচরণ আমার? ওসব জাত-ফাত ছেড়ে দাও।'

'তা না হয় ছেড়ে দিলাম—' বরুণ কঠিন গলায় বলে, 'কিন্তু জন্ম? সেটা ছাড়তেও আপত্তি নেই আপনার—আমি ভালো পালা লিখতে পারি বলে?'

কুঞ্জ এতক্ষণ ওর হাত ধরে রেখেছিল, এবার আস্তে ছেড়ে দেয়। কুঞ্জর মুখে একটা ঝাপসা রহস্যের হাসি ফুটে ওঠে। কুঞ্জর কপালে শুকিয়ে-ওঠা ঘামের চিহ্নগুলো আবার ফুটে ওঠে। কুঞ্জ কোঁচার খুঁট তুলে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'তবে—তোমাকে একটা কাহিনি শোনাই লেখক, শোনো। হয়তো তোমার একটা নাটকের প্লট হয়ে যাবে।'

বরুণ বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু তারও আগে আপনি স্নান আহার করে নিলে হত না?'

'নাঃ, ওসব আপদ বালাই এখন থাক্ বরুণ, আমার মনের মধ্যে এখন সমুদ্দুর উথলোচ্ছে। এই গল্পটা আগে শোনাই তোমাকে, তারপর বুঝতে পারবে কেন তোমায় অকস্মাৎ অমন কথাটা বলে ফেললাম!'

বরুণ খাতা-পত্র সরিয়ে রেখে বলে, 'বলুন!'

কুঞ্জ তার চেহারার সঙ্গে বেমানান আবেগের গলায় বলে, 'দেশটার নাম করব না, শুধু বলি এক দেশে একটা বাঁদরের গলায় একটা মুক্তোর মালা ছিল। মালাটা জুটেছিল বাঁদরটার ঘরে কিছু পয়সা ছিল বলে। তা হতভাগা বাঁদর বৈ তো নয়? সে ওই রাজার গলার উপযুক্ত মুক্তোর মালার মর্ম বুঝত না, তাকে ঘরে ফেলে রেখে পাড়ায় এক সখের থিয়েটারের দল খুলে সেখানেই রাতদিন পড়ে থাকত। কখনও গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজত, কখনও গোঁফ লাগিয়ে ডাকাত সাজত।

ঘরে ভাত ছিল, তাই পেটের ধান্ধা ছিল না। কিন্তু ওদিকে দরজা-খোলা ঘরে মুক্তোর মালা পড়ে, চোখের দৃষ্টি পড়বে সেটা আশ্চয্যির নয়। বল লেখক, আশ্চয্যি?'

বরুণ মাথা নাড়ে।

হঠাৎ কুঞ্জ সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'গল্পটা তুমি ধরতে পারছ তো, লেখক?'

বরুণ ওর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলে, 'পারছি।'

'হ্যাঁ, কি বলছিলাম? সেই চোরের দৃষ্টি, না? তা সেই চোরের দৃষ্টি পড়ার পর যা হয় তাই হল। মুক্তোর মালা হাওয়া হয়ে গেল! বুঝলে নাট্যকার? বাঁদরটা ঘরে এসে দেখে ঘর খালি। তখন বুঝলে, তখন সেই শূন্য ঘর দেখে বাঁদরটা টের পেল তার কী ছিল! তখন বুঝল। কিন্তু তখন আর উপায় কি? হতভাগাটা তখন—'

কুঞ্জর গলাটা বসে আসে। আর সেই বসা গলায় সে এক হতভাগা বাউন্ডুলের কাহিনি বলে চলে, যা পালাকার বরুণের বুঝতে অসুবিধে হয় না।—অসুবিধে হয় না, সে শুধু বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনে চলে একটা অবোধ প্রেম-কাহিনি! যে প্রেমিক জানে না সে ভালোবাসছে। যে শুধু ভেবে এসেছে, না করলে চলবে কেন, মানুষ বৈ তো জানোয়ার নয় সে!

আশ্চর্য, অধিকারী কুঞ্জ দাস, রগচটা রূঢ়ভাষী নিতান্ত গ্রাম্য চেহারার এই লোকটা, সে এমন কবিত্বের ভাষা পেল কোথায়? জীবনভোর যাত্রা-গান করে আর দেখে? নাকি এই ঘর-ছাড়া বরুণটা তার এই উন্নতি সাধন করেছে?

ভাবের সন্ধান দিয়েছে, তাই ভাষা এসেছে তার পিছু পিছু! সেই ভাষা আসছে কুঞ্জ অধিকারীর জিভে, 'চোরটা আবার আর এক বাঁদর। বুঝি বাঁদরও নয়, ভাল্লুক। তাই মুক্তোর মালাটা নিয়ে গলায় না পরে তাকে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে মাড়িয়ে নিজে মরল। তারপর—'

বেলা বেড়ে উঠেছে। ও-বাড়ি থেকে বিপিন ব্রজ সনাতন অনেকে এই কাছারি বাড়িতে এসে উঁকি দিয়ে গেছে, দু-দু'বার ডাকের পর তাদের মুখের ওপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে কুঞ্জ। বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বরুণকে বলেছিল, 'তোমার চান আহার হয়েছে তো?'

বরুণ মৃদু হেসেছে। কুঞ্জ সেই হাসিটার অর্থ খুঁজতে বসেনি। কুঞ্জ তার কাহিনির হারিয়ে যাওয়া সূত্র খুঁজতে অতীত হাতড়েছে।

বন্ধ দরজার মধ্যে সেই মৃদু কণ্ঠের কথন, বরুণের চোখে খুলে দিয়েছে একটা বন্ধ দরজার কপাট। সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বরুণ আস্তে বলেছে, 'সেই মেয়ে! আপনি তাকে? আশ্চর্য!'

কুঞ্জ ম্লান হেসে বলে 'ভাবলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আরও তলিয়ে ভেবে দেখলে জগতে কিছুই আশ্চর্য নেই, লেখক! সবাই তো মনের ওপর নির্ভর। সেই মনটা দিয়ে তোমাকে আমি পরম বন্ধু ভাবতে পারি, পরম শত্রুও ভাবতে পারি। সেদিন যখন সেই অকস্মাৎ গিয়ে পড়ে আমাদের গ্রামের সেরা বড়োলোক কমল মুখুজ্যের ছেলে অমল মুখুজ্যের মড়াটাকে একটা বস্তির উঠোনে বাঁশের খাটিয়ায় পড়ে থাকতে দেখলাম, হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা খুলে গেল। দেখলাম জগৎ সংসারের এই লীলাটার যেন কোনো মানেই নেই। যেন একটা হাসির ঘটনা। তোমরা

যেমন হাসির নাটক লেখো, বিধাতাপুরুষ তেমনি একখানা বড়োসড়ো হাসির নাটক লিখে রেখেছেন। পার্টগুলো প্লে করছি আমরা।...মরে গেলাম, ফুরিয়ে গেল—ব্যস।...ওই মেয়েটাকে যদি আমার শত্রুর মেয়ে না ভেবে আমারই মেয়ে ভাবি? হলটা কি? কিছু না। অনেক ল্যাঠা মিটে গেল বরং! আর উমা? তাকে তো মরবে বলেই হাসপাতালে দিয়ে এসেছিলাম। যখন দেখলাম ফিরে এল, তখন আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে—'

কুঞ্জ চুপ করে একটু।

বরুণ সেই অবসরে মৃদু হেসে বলে, 'দিশেহারা হয়ে ভাবলেন ছড়ানো মুক্তোগুলো দিয়ে আবার মালা গাঁথি?'

কুঞ্জ ওর দিকে তাকায়। আস্তে বলে, 'তা ঠিক নয়, লেখক! অতটা আশা করিনি, শুধু ভেবেছিলাম—না, কিছুই বোধহয় ভাবিনি। শুধু একটা নেশার অভ্যেসের মতো করে চলেছিলাম। তা কাল তো ভালোই করে এলাম। এখন শুধু ভাবছি তার কাছে মুখ দেখাবার একমাত্র পথ হচ্ছে—'

আগেই কথা হয়ে গেছে। তাই থেমে যায় কুঞ্জ। তারপর বলে, 'জানি না সে সময় মিলবে কি না। হয়তো আত্মঘাতীই হয়ে বসবে—'

বরুণ মাথা নেড়ে বলে, 'না, তা মনে হয় না। যে রকম শুনলাম, সে ধাতুর মেয়ে নয় বলেই মনে হয় তাঁকে।'

'হয়তো তাই হবে। তবে টাকা আর নেবে কি না সন্দেহ! টাকার খোঁটাটা মোক্ষম দিয়ে এসেছি কি না!'

'তাও বলা যায় না, হয়তো নেবেন।'

কুঞ্জ ব্যগ্রভাবে বলে, 'নেবে? তুমি কি করে জানছ বলত?'

'এমন অনুমান! আপনার প্রকৃতি ওঁর জানা। যেমন আমরা একটা বই পড়ে তার সবটা বুঝে ফেলি, প্রায় তেমনি। উনি জানেন আপনার মুখের কথা যাই হোক, ভেতরের ভাবটা কি।'

কুঞ্জ গভীর গলায় বলে, 'এবার বুঝতে পারছ বরুণ, কেন তোমায় সুপাত্র বলে ভাবছি? পালা লেখো বলে নয়। 'মানুষ' বলে। চোখ কান আন্দাজ অনুভব সমেত আস্ত একটা মানুষ বলে। আমার অনুরোধ রাখবে না বরুণ?'

বরুণ মাথা নীচু করে বলে, 'দেখুন, জীবনের ছক কেটেছিলাম অন্য রকম, সে ছক হচ্ছে কোনোখানে স্থিতু হব না, স্নেহের বন্ধনে বাঁধা পড়ব না, ভেসে ভেসে বেড়াব। কিন্তু অজান্তে কখন যে আপনার কাছে বাঁধা পড়ে বসে আছি! শেকড় গজিয়ে গেছে, টেরই পাইনি। এখন হঠাৎ টের পাচ্ছি। কিন্তু লিলি তো আপনার সত্যি মেয়ে নয়? তার মধ্যে অন্য প্রকৃতি, অন্য স্বভাব।'

কুঞ্জ বোঝে বরুণের বাধাটা কোথায়। কিন্তু কুঞ্জ তার সেই একান্ত স্নেহপাত্রীটিকে বোঝে না। তাই কুঞ্জ সান্ত্বনার গলায় বলে, 'তা আমি স্বীকার করছি লেখক, মেয়েটা হালকা স্বভাবের। বয়স পেরায় পনেরো ষোলো হল, তবু জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি। তবে হবে। আমি বলছি হবে। ভেতরে বস্তু মাত্র না থাকলে দুটো দিনের রিহার্সালে অমন 'প্লে'খানা করতে পারত না। তোমার লেখা ভাষার মানে বুঝেছে ও, বলছি আমি তোমায়। মানে না বুঝলে—'

বরুণ আস্তে বলে, 'তা বটে!'

'তবে? তবেই বোঝো?' কুঞ্জ আবার সাগ্রহে ওর হাত চেপে ধরে বলে, 'খুকি সেজে বেড়ায়, তাই খুকিপনা করে। আর সর্বদার সঙ্গী তো ওই অকাল কুষ্মাণ্ডগুলো? তোমার হাতে পড়লে দেখো! ভোল বদলে যাবে। মাতৃগুণ বলেও তো একটা জিনিস আছে লেখক?'

বরুণ চুপ করে থাকে।

কুঞ্জ বলে, 'তাহলে কথা দিলে?'

'দিলাম।'

কুঞ্জর এতক্ষণের উত্তেজনা সহসা স্থির হয়ে যায়। কুঞ্জ জামার হাতটা চোখে ঘসে ঘসে চোখের জল মোছে।

তারপর কুঞ্জ মনে মনে ছক কেটে ফেলে। 'ধাড়াবাড়ির' বায়না হচ্ছে সামনের পূর্ণিমায়, হাতে এখনও চার-পাঁচটা দিন। এরমধ্যেই শুভ কাজটা সেরে ফেলে উমার কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর এই বরুণকে দিয়ে হাতজোড় করিয়ে আর একটা 'শো'র জন্যে অনুমতি চাইয়ে নিতে হবে। বায়না করেছে, অগ্রিম টাকা দিয়েছে, দশদিন ধরে এতগুলো লোককে পুষছে, না করলে মহা অধর্ম।....

তাছাড়া বড়োলোকের মেজাজ, হয়তো লিলির বদলে চারুকে দেখলে পুলিশ কেস করতে আসবে। জামাই গিয়ে ধরলে 'না' করতে পারবে না।

ভেঙেপড়া কুঞ্জ একটা মানুষের আশ্বাসবাক্যে আবার যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অবোধ হৃদয়টা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে বসে, জামাই দেখে বিগলিত হয়েছে উমা, পুরনো জেদ বিসর্জন দিয়েছে। মুখ দেখাতেই হাসছে, কথা কইছে, তাদের খাওয়াচ্ছে, আর...হঠাৎ আহ্লাদ করে বলে উঠেছে—'জামাইয়ের লেখা 'পালা', মেয়ের অ্যাক্টো, তবে চল দেখেই আসা যাক।'

কিন্তু কি জানি, কেমন দেখতে হয়েছে এখন সেই মুখ! এই দীর্ঘদিনে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আসতে অবগুণ্ঠনে ঢাকা মানুষটার শুধু হাতের একটুখানি দেখেছে কুঞ্জ। মুখ দেখেনি। জানে না বয়সের ছাপ কতটা পড়েছে তাতে।...

লিলি হকচকিয়ে যাবে। ভাববে 'মা আছে আমার, জন্মে জানতাম না সেকথা, হঠাৎ এই পরীর মতো মা!' হঠাৎ 'পরী' শব্দটাই মনে আসে কুঞ্জর, 'দেবী' নয়। অথচ সেটাই হলে ভালো হত।... হয়তো কুঞ্জর এই বিশেষণটা পূর্বস্মৃতির উপর নির্ভরশীল।

কুঞ্জ তাই ভাবে—ওই পরীর মতো মাকে দেখে আহ্লাদে হয়তো মূর্ছা যাবে ছুঁড়ি।...

আর কুঞ্জ এই ভেবে মূর্ছাহত হয়, আলোকোজ্জ্বল আসরে সামনে এসে বসেছে নায়িকার মা। তার গৌরব কত! কিন্তু ওর বেশভূষাটা কেমন?

সধবার মতো তো? না কি বিধবার মতো? অমল মুখুজ্যে মরেছে বলে কি লোক দেখিয়ে বিধবা সাজতে হয়েছিল বামুন বৌকে, সর্বাঙ্গে চাদরমুড়ি দিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল, এসেছিল, রেলগাড়িতে ট্যাক্সিতে সবই একরকম। কে জানে, সে এখনও সিঁদুর পরে কিনা, শাঁখা পরে কিনা।

আচ্ছা, যদি ওই অমলটার কথা মুছে ফেলে থাকে ও, যদি নিজের পুরনো জীবনের সাজেই অবিচল থাকে?

তাহলে তো আবার লিলির মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই লিলির বাপকেও ডেকে আনতে হয়। কুঞ্জ কি তবে এবার সেই পোস্টটা পাকাপাকি দখল করবে? তা করতে তো হবেই কুঞ্জকে। কন্যা সম্প্রদান করতে হবে না?

কিন্তু বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি কোথায়—কুঞ্জর চিন্তায় বাধা পড়ল। কারণ কুঞ্জর এই বন্ধ দরজায় জোরে জোরে ঘা পড়ল। নিশ্চয় খেতে ডাকছে।

কুঞ্জ এতক্ষণে অনুভব করে খিদেয় পেটটা জ্বালা করছে। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেয়।

কিন্তু কুঞ্জকে কি ওরা খেতেই ডাকতে এসেছিল? অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে বিচলিত হয়ে ওর বকুনির ভয় ত্যাগ করে? পাগল? এত ভালো কে বাসছে কুঞ্জকে? ব্রজ? বিপিন? নববালা?

ওরা দরজায় ধাক্কা দিয়ে কুঞ্জকে উপহার দিতে এসেছে একমুঠো জ্বলন্ত আগুন। যে আগুনে কুঞ্জর ওই দিবাস্বপ্নটি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। সেই আগুনটা একটা খবর। কিন্তু আগুন তো খবরেরই হয়।

ওরা বলতে এসেছে, বহুক্ষণ অপেক্ষা করে করে এবার অধিকারীকে না জানিয়ে পারছে না,

লিলি, নিমাই আর সনাতন সেই ভোর সকালে কালী মন্দির দেখতে যাব বলে বেরিয়েছে, এখনও দেখা নেই। এরা অধীর হয়ে ঘর বার করতে করতে হঠাৎ সন্দেহের বশে ওদের ঘর দেখতে গিয়েছিল, দেখেছে তিনজনেরই জামাকাপড় জিনিসপত্র, সুটকেস গামছা আর্শি চিরুণী—সবই নিশ্চিহ্ন।

তার মানে পালিয়েছে। অথচ আশ্চর্য, কেউ এটা স্বপ্নেও সন্দেহ করেনি। আরও আশ্চর্য, জিনিসপত্রগুলো পাচার করল কি করে? নিশ্চয় রাতারাতি কোথাও সরিয়ে রেখেছিল!

কুঞ্জ যদি শুধু শুনত ওরা সেই ভোরবেলা কোথায় না কোথায় গিয়ে এখনও ফেরেনি, তাহলে কুঞ্জ পাগল হয়ে ছুটোছুটি করত। কিন্তু এরা শুধু সেই খবরটাই দেয়নি, এই জিনিসপত্রের খবরও দিয়েছে। কুঞ্জ তাই পাথরের মুখচোখ নিয়ে বসে আছে।

কিন্তু যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, সে-ই শুধু পাথর হয়ে যেতে পারে? আর অরণ্যবাসের অন্তরালে যে মানুষটা নিজেকে আরও আড়াল করে রেখে দেয় দেওয়ালের আড়ালে, অবগুণ্ঠনের আড়ালে? সে? না কি নতুন করে পাথর হবার আর অবকাশ নেই তার? পাথর দিয়েই বুক বাঁধা তার? না হলে অতবড়ো অপমানের পরও তো ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিল না সে? এমন কি মাথাও ঠুকল না, কেঁদেও ভাসাল না!

সে শুধু বেড়ার ঝাঁপটা বন্ধ হবার শব্দ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে নেমে পড়ে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝিরিয়ে, তবু ছাতাটা হাতে নিয়েই চলেছে লোকটা। দেখতে পেল চলেছে, তারপর একটা ভাঙা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আবার অনেক দূরে দেখা গেল।

দ্রুতদৃপ্ত ভঙ্গি! যে ভঙ্গি বহুকাল দেখেনি উমাশশী। ইদানীং যে ভঙ্গিটা দেখতে পায় এই গাছের আড়াল থেকে, সে ভঙ্গি শিথিল অনিচ্ছা-মন্থর। যায় যায় আর ফিরে ফিরে তাকায়। উমাশশীকে তাই আত্মগোপন করে থাকতে হয়।

আজ আর হল না আত্মগোপন করতে। আজ লোকটা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল।

বরুণ আন্দাজে বলেছিল, 'উনি অন্য ধাতুর।' কথাটা ঠিক। অন্য ধাতুরই। নইলে যে লোকটা ওকে অত যাচ্ছেতাই করে গেল, তার জন্যেই ওর মন পোড়ে?

লোকটা যে রাগের চোটে ছাতা মাথায় দিতে ভুলে গেছে, আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টিটা যেন জোর জোর হয়ে আসছে, এই ভেবেই মন পোড়েনি উমাশশীর। নিজেও যে ভিজছে, সে কথা মনে থাকে না, ভাঙাবাড়ির ওপারটা পর্যন্ত দেখতে থাকে।

আজ এখনও বেলা আছে, আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অন্য দিন তো অনুমানে দেখা। লোকটা যে টর্চ ধরে ধরে যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই আলোটাই দেখা। তবু কোনো কোনো দিন, যেদিন জোৎস্নায় ভরা রাত থাকে, সেদিন উমাশশীর স্মরণীয় দিন।

অথচ ওই লোকটাকেই একদিন পুরনো কাপড়ের মতো পরিত্যাগ করে চলে এসেছিল উমাশশী। উমাশশীকে একদিকে টেনেছিল দুরন্ত প্রলোভন, আর একদিকে ঠেলে দিয়েছিল দুরন্ত অভিমান। এই দুই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে উমাশশীর জীবনের বুনুনিটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টিটা জোর হতেই উমাশশীকে ফিরে আসতে হল। এসে দাওয়ায় বসে সেই মেডেলগুলো হাতে তুলে নিল উমাশশী। আর অতখানি অপমানেও যা হয়নি, তাই হল হঠাৎ। হঠাৎ প্রবল বর্ষণে ভেসে গেল তার চোখ গাল বুকের কাপড়।

উমাশশীর বিধাতা উমাশশীকে এত নিষ্ঠুর করে কেন গড়েছিল? কী হত, যদি উমাশশী ওই

মেডেলের খবরে আহ্লাদ প্রকাশ করত! উমাশশীর কোন্ মুখটা আছে যে সেই তিন বছরের মেয়েটার দাবি তুলে, তার যাত্রার আসরে নাচায় ব্যঙ্গোক্তি করল?

উমাশশীর কি সত্যি মেয়ে বলে টান আছে তার ওপর? উমাশশী কি তাকে দেখলে চিনতে পারবে?

বহুবার তো বলেছিল ওই মহৎ মানুষটা, 'নিয়ে এসে দেখাই, নিয়ে এসে দেখাই।' উমাশশীই তো নিষেধ করেছে। নিষেধ করেছে উমাশশী। পাষাণের মতো নিষ্ঠুর বলে। 'দেখলে নতুন করে মায়ায় জড়াব' এটা যে সে ভেবেছিল মনে মনে, ওটা বাজে কথা। 'পাপের ফল' বলে বিতেষ্টা, এটাও বাজে কথা। মনকে চোখ ঠারা! আসলে ভয় ছিল পাছে আবার মেয়েটার দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে। পাছে ও বলে বসে, 'মেয়ে তো বড়ো হচ্ছে, এবার মায়ের কাছে থাকাই ভালো।'

এই, এই ভয়েই উমাশশী লিলি নামের সেই তিন বছরের মেয়েটাকে 'মা' থাকতেও 'মা' নাম ভুলিয়ে রেখেছে!

অবৈধ বলে মমতা নেই, এটা কি সত্যি? নিঃসন্তান নারীচিত্ত, প্রথম যে সন্তানকে কোলে পেল, তার উপর থেকে কি মন সরিয়ে নিতে পারে? তাছাড়া—তখন তো উমাশশী অমল মুখুজ্যের আদরে সমাদরে ভাসছে। কুঞ্জ নামের একটা বুনো-মানুষের জন্যে দু'দণ্ড মন খারাপ করে বসে থাকবারও সময় নেই তার। তখন তাই সন্তানে ও ডগমগ।

অথচ সেই সন্তানকে সে দায়িত্ব নেবার ভয়ে বিলিয়ে দিয়ে রেখেছে। বিলিয়ে দিয়েছে না হয় একটা মহান লোকের হাতে, কিন্তু তার পরিবেশটা যে মহান নয়, তাতো উমাশশীর অজানা ছিল না।

যাত্রার দলে আছে মেয়ে, ছেলে সেজে পার্ট করছে। দরকার হলে সখী সাজছে, এসব তো জানতই উমা। যাত্রার অধিকারী নিঃস্বার্থ, তাই কোনোদিন বলেনি, 'দিন গুণছি কবে ওটা বড়ো হবে।'

বললেই বলতে পারত। উমাশশীর কিছু বলবার ছিল না। যাত্রার দলে মানুষ হওয়া মেয়ে লায়েক হয়ে উঠে আসরে নাচবে, এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ এই স্বাভাবিক নিয়মটার বিরুদ্ধেই উমা এমন একখানা প্রতিবাদের আস্পর্ধা দেখাল, যা এখন ভেবে মরমে মরে যাচ্ছে সে।

এ আস্পর্ধার কারণ কি? না ভালো লোকটা উদার লোকটা একদা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, 'ওকে আমি বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসারী করে দেব।'

ঘর-সংসার জিনিসটার ওপর কি তবে এত মোহ উমাশশীর যে, সেই আসা ভঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল? এটা তুলসী মন্দিরের মতো পবিত্র ঘর-সংসার পায়ে ঠেলে দিয়ে চলে এসে কি 'ঘর-সংসারের' মূল্য টের পেয়েছে উমাশশী?

দাওয়াতেও আর বসা চলল না। বৃষ্টি প্রবল হচ্ছে। উমাশশী ঘরে গিয়ে ততক্ষণে আছড়ে পড়ে, আর বার বার বলতে থাকে, 'ঠাকুর, মেয়ে জন্ম দিয়ে এত নিষ্ঠুর করে পাঠালে কেন?'

'ও যদি আর না আসে?—ও যদি সত্যিই মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে থাকে?'

হ্যাঁ, টাকা ও দেবেই তা জানে উমাশশী। উমাশশী কষ্টে পড়তে পারে, এমন কাজ ও করবে না। কষ্ট দেওয়া কাজটা উমাশশীরই একচেটে।

উমাশশীর আর একটা ভয়ানক বর্ষার রাতের কথা মনে পড়ে আজ।...মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, বাজ চমকাচ্ছিল।...অধিকারী কুঞ্জ দাস খাওয়া-দাওয়ার পর বলেছিল, 'যা দেখছি আজ তো আর যাওয়া হল না।'

বলে দাওয়ার ভিতরের জলচৌকিটার উপর উঠে বসেছিল। তারপর নিজ মনে বাতাসকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছিল, 'দাওয়ায় একখানা তক্তপোষ-টক্তপোষ পাতিয়ে রাখতে হবে। এ রকম বেঘোরে পড়ে গেলে বসে রাত কাটাতে হবে না।'

উমাশশী তখন কোনো কথা বলেনি। তারপর রাত বোধকরি বারোটা, বৃষ্টি একটু ধরেছিল তখন উমাশশী ঘর থেকে বলে উঠেছিল, 'এখন তো বিষ্টি কমেছে, এইবেলা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে হয়।'

লোকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি? বোধহয় আশা করেনি এমন কথা শুনতে হবে। তাই বিস্ময়ের গলায় বলে উঠেছিল, 'এখন রওনা দেব?'

'তাতে কি?' উমাশশী অভয় দিয়েছিল, 'শুধু এই হাঁটাটুকু! রাতভোর তো ইস্টিশনেই পড়ে থাকা হয়।'

ঘরের ভিতরকার অভয়বাণী বৃষ্টির ছাঁট খেয়ে বসে থাকা মানুষটার প্রাণে শীতল বারি নিক্ষেপ করেনি। সে বলেছিল, 'ওঃ। তা যাচ্ছি। তবে এমন রাতে লোকে বেড়ালটা কুকুরটাকেও দূর দূর করে তাড়ায় না।' বলে উঠে পড়েছিল।

আশ্চর্য, উমাশশী এত নিষ্ঠুরতার শিক্ষা কোথায় পেয়েছিল? তাই উমাশশী ছুটে এসে পথ আটকে বলেনি, 'আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করো।' উমাশশী সেই ঘর থেকেই বলেছিল, 'বেড়ালটা কুকুরটা হলে তাড়ায় না, মানুষ বলেই উল্টো নিয়ম।'

'মানুষই। বাঘ ভালুক নয়। কামড়ে দেবে না।'

উমাশশী তথাপি টলেনি। বরং হেসে উঠে বলেছিল, 'বিশ্বাস কি? তাছাড়া পাড়াপড়শি তো বাঘ ভালুকের কাছাকাছি। সকালবেলা ছাতা জুতো দেখলে—'

কুঞ্জ নিজস্ব ভঙ্গিতে চড়ে উঠেছিল, 'কেন, এ কথা বলা যায় না দেশের লোক খোঁজ নিতে এসেছিল, বৃষ্টিতে আটকা পড়ে—'

উমাশশী আরও হেসে উঠেছিল। হেসে হেসে বলেছিল, 'জিগ্যেস করলে বলা যায়। জিগ্যেস না করলে? গায়ে পড়ে বলা যায় না তো?'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।' বলে চলে গিয়েছিল অধিকারী কুঞ্জ দাস। কিন্তু 'ঠিক আছে, যাচ্ছি' ভিন্ন কবে আর 'আচ্ছা, চললাম—' অথবা 'আচ্ছা, আসি' বলে কুঞ্জ? কুঞ্জর বিদায় নেবার ভঙ্গিটাই তো রাগ-রাগ! বিদায় যে নিতে হচ্ছে, সেটাই রাগের।

কিন্তু উমাশশী কী করবে? উমাশশী তো নিজেই নিজের সুখের পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে।

উমাশশী নিজেই নিজের সুখের পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু উমাশশীর মেয়ে?

তা সে নাকি 'বুদ্ধিমান', অন্তত তার পালক পিতা তাই বলত, তা সে বুদ্ধিমান বলেই বোধকরি সুখের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে।

একটা মাটকোঠার হোটেলের দোতলার ঘরে লোহার চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে উমাশশীর মেয়ে বলে, 'পোপাইটারের জন্যে একটু মন কেমন করছে বটে, তিন তিনটে মানুষ কেটে পড়ায় অসুবিধেতে পড়বে ও। তবে খুব চালাকি হল একখানা!'

নিমাই বলে, 'সনার যা পার্ট, ও তো রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে আসরে ছেড়ে দিলেও হয়। আমারটা ব্রজরাজ দেবে অখন যা হোক করে চালিয়ে, আর তোর? সে বিষয়ে নিশ্চিন্দে থাকিস, তোকে আর আসরে যেতে হত না। চারুহাসিনীর জ্বর ছেড়েছে, ওর হকের ধন মদনমোহন—ও ছাড়ত ভেবেছিস?...জোর করে ছাড়ালে ও তোর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিত! তোর ভাগ্যে ওই একটি রজনীই।'

উমাশশীর মেয়েকে শাড়ি পরে মোহিনী দেখায়। উমাশশীর মেয়ের এক মুখ পান খাওয়া পানের রসটা ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, আর সে অতীতের এক উমাশশীর মতো ঠোঁট উল্টে বলে, 'ইস, তাই বৈকি। দেখো 'সহস্‌রো রজুনী হবে! তুমি একবার খোলো দল।'

ওইভাবে ঠোঁট উল্টে বলত উমাশশী, 'আমার কপালে অশেষ দুঃখু আছে? ইস! কেন? দেখো পরে।' বলত বুড়ি পিসশাশুড়িকে। যে নাকি বৌয়ের বেচাল দেখে গাল-মন্দ করতে বসত।

উমাশশীর মেয়ে সেই ভঙ্গিতে বলে, 'ইস, তাই বৈকি। তুমি আগে দল খোলো।'

জ্ঞানাবধি 'দল' দেখে আসছে, আর সেই বিরাট দলবল আর তাদের সাজ-সরঞ্জাম, বাক্স বিছানা নিয়ে নিতান্ত অনায়াসে আনাগোনা করতে দেখেছে। 'দল গড়া' যে চারটিখানি কথা নয়, নিমাইয়ের বাবারও যে সে সাধ্য নেই, সে জ্ঞান হয় না লিলির।

লিলি সাজানো আসরে নিজেকে কল্পনা করে, আর বলে, 'দলটা গড়ে ফেল, জোগাড় যন্তর করো। দেরি কিসের?'

আর এ বলে, 'বিয়েটারই বা দেরি কিসের, নিজেরা নিজেরাই তো করে নিতে হবে। জগাদা বলেছিল 'সব ব্যবস্থা করে দেবে'। সে তো বেইমানী করল, এলই না। সনাদাটা তবু মায়ায় পড়ে এসেছে, তা সে তো বোকার ধাড়ি। কার পিত্যেশ?'

নিমাই বলে, 'হবে হবে! সুবিধে হোক—'

লিলিবালা ঝঙ্কার দেয়, 'হবে হবে? আমি মলে? বিয়ে কোথায় তার ঠিক নেই স্বামীস্ত্রী সেজে বসে আছি, আর যা খুশি করে চলেছ তুমি। এ-সব আমার ভালো লাগছে না।'

কিন্তু ভালো কি নিমাইয়ের লাগছে? ওই খুশিটা ছাড়া? প্রোপ্রাইটারের বাক্স থেকে লিলি যে টাকাটা সরিয়ে এনেছিল, সে টাকা তো ফুরিয়ে এল। লিলির গায়ের গহনাগুলো তো গিলটির, নিজের আঙুলে একটা আংটি পর্যন্ত নেই, উপায়টা কি?

লিলিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল নেহাত লোভের বশে। তা ছাড়া অধিকারীকে জব্দ করবার মনোভাবও একটু ছিল। যা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নিমাইকে!

সেদিন অমন খপ করে বলে বসল, 'দেখলি? দেখলি লিলির অ্যাক্টো? ওর পায়ের নখের যুগ্যি ক্ষ্যামতাও নেই তোদের! অথচ এই সাত বছর ধরে ঘষটাচ্ছিস!'

নাও দেখো, যার পায়ের নখের যুগ্যিও ক্ষ্যামতা নেই, তাকে পায়ে বেঁধে নিয়ে চলে আসবার ক্ষ্যামতা আছে কি না নিমাইয়ের।

এত তাড়াতাড়ি হয়তো চলে আসত না নিমাই, সেদিনের অপমানটাও কাজ করেছে। তাছাড়া ভেবেছিল অজানা অচেনা জায়গা থেকে সরে পড়াই সুবিধে। কেউ বলে দেবে না, 'আরে তাদের তো দেখলাম পেয়ারাতলার বাসে উঠতে'।...চলে এসেছে। খরচ চালাতে হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে।

এদিকে সনাতন আর উচিতমতো হোটেল খরচা পাচ্ছে না। অতএব সনাতন দু'বেলা শাসাচ্ছে, 'চলে যাব। বলে দেব গিয়ে অধিকারীকে।'

লিলিবালা বলে, 'বলে দিলে তো প্রেথম ফাঁসি তোমার! তুমিও সমান পাপে পাপী। জেরার সময় আমি বলব, তুমিই আমায় ফুসলে এনেছ, নিমাইদা তোমার সঙ্গী মাত্তর। মায়ার প্রাণ তাই এসেছে।'

'বলবি একথা?' সনাতন বলে, 'মুখে বাধবে না?'

'বাধবে কেন? তুমি কি কম শয়তান? সেদিন ঝগড়ার মুখে বলনি ওকে, 'লিলির দায় আমি পোহাতে যাব কেন? তুই কি আমায় ওর ভাগ দিবি? তবে? শয়তান আবার কাকে বলে?...'

খাটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের মধ্যে বন্দী থেকেও লিলি জগৎ-সংসারের কোনো কথা শিখতে বাকি রাখেনি, তাই নববালা বাসমতীদের ভাষার সঙ্গে লিলির ভাষার বিশেষ কোনো তারতম্য নেই।

তবে লিলি জানে নিমাই তার 'বিয়ে করা স্বামী', শুধু অনুষ্ঠানটা বাকি।—বাকিটা কেবলমাত্র নিমাইয়ের আলস্যের জন্যে হচ্ছে না।

কিন্তু নিমাই? সেও কি তাই জানে?

আহা, কুঞ্জ অধিকারীর কি হল? 'ভবানী অপেরা'র প্রোপ্রাইটার মিস্টার দাসের? সে কি আজও পাথর হয়ে বসে আছে? নাঃ, তা বসে থাকলে কি চলে? পৃথিবী বড়ো কঠিন জায়গা। বাস্তব বড়ো নির্মম!

যারা বায়নার টাকা দিয়েছে, দশদিন ধরে এককাঁড়ি লোক পুষছে, তারা ছেড়ে কথা কইবে? 'পালা' নামাতেই হয়েছে কুঞ্জকে। চারুহাসিনীকে দিয়েই চালাতে হয়েছে। রব তুলতে হয়েছে লিলিবালার দিদিমার হঠাৎ মরমর অসুখ, তাই চলে যেতে হয়েছে তাকে।

তা যাক, সারা পালাটা এমনিতেই জমজমাট! বরুণের কলমের গুণেই মুহুর্মুহু হাততালি, আর চারুহাসিনীও একেবারে ফেলনা নয়। চালাচ্ছিল তো এতদিন।

পালা শেষে জাল গুটিয়ে চলেও আসতে হয়েছে বৈকি কুঞ্জকে কোমর তুলে। লিলিবালার দিদিমার মরণে লিলিবালা সেখানে আটকে পড়েছে বলে কি অধিকারী কুঞ্জ দাস ভেঙে পড়ে মাটিতে পড়ে থাকবে?

তবে হ্যাঁ, দু'দুটো ছেলেকে লিলির সঙ্গী হিসেবে পাঠিয়ে অসুবিধে একটু হয়েছে, তারাও তো আটকে পড়েছে। তা কি আর করা যাবে? তেমনি, যে মানুষ পালা লেখা ছাড়া আর কখনও কিছু করে না, সেই মানুষই বুক দিয়ে করল!

ছড়ানো জাল গুটিয়ে আবার কাটোয়ায় এনে ফেলে সবে স্থির হয়ে আমতা লাইনের সেই গ্রামের পথটায় পাড়ি দেবে, হঠাৎ বাঁকুড়া থেকে এক তলব এসে হাজির।

'নতুন কি এক পালা করেছেন না কি চোরাকারবারিদের ঠুকে, মেদ্‌নীপুরে জয়জয়কার করে এসেছেন, বায়না করতে এসেছি তার।'

কুঞ্জ গম্ভীরভাবে বলে, 'ওইটি আজ্ঞে করবেন না বাবুমশায়, আর যেটা বলেন রাজী!'

হ্যাঁ, বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কইতে কুঞ্জ বাবুমশায় টশায় বলে।

এসেছেন বাঁকুড়ার নামকরা এক ডাক্তার বাড়ি থেকে, ডাক্তারের শালা জন্মাষ্টমী উৎসবে যাত্রাগান দেবেন। লোকটা একটু স্বদেশী স্বদেশী। ছেলেমেয়েরা নাকি চেয়েছিল জলসা হোক, তিনি বলেছেন 'না, দেশের পুরনো জিনিস হোক।'

কথাটা ভালো লাগে কুঞ্জর। কিন্তু ওই পালাটা? যেটার সঙ্গে কুঞ্জর জীবনের সব সর্বনাশ জড়িত। 'ওটা হবে না বাবুমশায়, আর যা বলেন।'

বাবুমশায় সন্দেহের গলায় বলেন 'কেন ওটাতে পুলিশের কোপে-টোপে পড়েছিলেন নাকি?'

'না না! সে সব ভয় কুঞ্জ অধিকারী করে না। ওটার মানে, অ্যাকটার অ্যাকট্রেস নেই এখন।'

'নেই কি মশাই? এই ক'দিন আগেই তো মেদিনীপুরে কাটিয়ে এলেন।'

'দু'তিনজন পালা সেরে দিয়েই দেশে গেছে।'

'আহা, এখনও তো দু'চারদিন রয়েছে। দেশ থেকে আনান।'

কুঞ্জ তবু ঘাড় নাড়ে, 'আসবে না, দেশে অসুখ।'

বাবুমশাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। এটা তিনি করিয়ে তবে যাবেন। টাকা নিয়ে এসেছেন বায়নার।

কুঞ্জ হতাশ গলায় বলে, 'আমার অসুবিধেটা বুঝছেন না বাবু, ওটা ছাড়া অন্য কিছু বলুন।'

তা হয় না। ওটাই চাই। আপত্তির কোনো অর্থ নেই। দুটো মাত্র কারণ থাকতে পারে আপত্তির, এক আইনের দায়, দুই কম্পিটিশনে নামবার জন্যে নতুন নাটক তুলে রাখছে।

প্রথমটা যখন নয়, তখন দ্বিতীয়টা। কিন্তু ওটা অধিকারীর ভুল ধারণা। তাতে বরং নাম ছড়াবে। যুক্তির শরশয্যা।

হয়তো এই আপত্তিটাই বাবুমশাইকে এমন আগ্রহে উত্তেজিত করেছে। আপত্তি করেছে? নিশ্চয় তাহলে ভিতরে কোনো গূঢ় কারণ আছে। তবে ওই আপত্তিটা ভাঙবার জন্যে গাঁইতি শাবল লাগাও।

অনেক কথা অন্তে নিরুপায়ে কুঞ্জ হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা বাবুমশায়, আপনি একটা বেলা সময় দিন আমায়, চিন্তা করে বলব। বুঝতেই তো পাচ্ছেন, সাধ্যপক্ষে এত কথা কইতাম না আমি।'

বাবুমশাই বলেন, 'ঠিক আছে, এখানে আমার ভাইঝির বাড়ি, থাকব আজকের দিনটা। কোথাকার মানুষ কোথায় এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, বিফল হয়ে ফিরে যাব? আপনার দলবলের আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হবে না, দেখবেন।'

বাবুমশাই চলে যাবার পর কুঞ্জ ভয়ানক একটা অস্থিরতা অনুভব করে। যা কাম্য, যা প্রার্থিত, তাই এসে যাচ্ছে হাতের মুঠোয়, যথার্থ সম্মান। অথচ কুঞ্জ তা নিতে পারছে না। কেন? বাধাটা কোথায়? পালাটা অপয়া? ওই 'মহাকালের খাতা' থেকেই কুঞ্জর জীবনের হিসেবের খাতা এলোমেলো হয়ে গেল।

কিন্তু ওই কুসংস্কারটা যদি না মানা যায়? যদি কুঞ্জ ভাবে ওগুলো ঘটতই। সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ সবই চন্দ্র সূর্যের মতো অমোঘ নিয়মের অধীন, তারা যথাসময়ে আসবেই মানুষের জীবনে, যতটা আলোছায়া ফেলবার তা ফেলবেই। তা হলে? ঠিক তাই।

লিলি লক্ষ্মীছাড়ির পালিয়ে যাওয়া কুঞ্জর কপালে ছিল। উমার সঙ্গে অকারণ বিচ্ছিন্নতা কুঞ্জর কপালে ছিল। এসব অমোঘ অনিবার্য। কুঞ্জ সেই ব্যাপারটাকে কুসংস্কারে ফেলে অন্য চেহারা দিচ্ছে।

নাঃ, এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। কুঞ্জ নেবে বায়না। লিলি মুছে যাচ্ছে চারুহাসিনী তো আছে। নিমাই চুলোয় যাক, বরুণকেই এবার আসরে নামিয়ে ছাড়বে কুঞ্জ।

হঠাৎ একটা নতুন উৎসাহে টগবগিয়ে ওঠে কুঞ্জ। আর সকালে যে সেই লোকটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে, তার জন্যে লজ্জাবোধ করে। ওকে না হয় বলে দেবে, 'মনস্থির করে ফেললাম বাবুমশায়! নিলাম বায়না।'

বরুণ আপত্তি করবে? সে আপত্তি খণ্ডন করে ছাড়বে কুঞ্জ। বলবে 'নিজের ভাষা একবার নিজের মুখে বলে দেখেছ? দেখো হে কী উদ্দীপনা পাবে!'

ভাবতে ভাবতে নিজেই উদ্দীপনা বোধ করে কুঞ্জ। নতুন শহরের নতুন আসর তার আলোকমালা নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কুঞ্জ সেখানে বুকভর্তি মেডেল নিয়ে দীপ্ত মহিমায় নান্দীপাঠ করে...'শুনুন বাবু সকলরা, এ এক ভেজালদার চোরাকারবারির কাহিনি। কিন্তু এ একের কাহিনি নয়। সমস্তের কাহিনি। মানুষ মারার কারবার খুলে বসেছেন এঁরা!...কিন্তু বাবুমশায়, আজও চন্দ্র সূর্য উঠছে, তাই এঁদের হিসেব লেখা হচ্ছে। লেখা হচ্ছে 'মহাকালের খাতায়'।' কুঞ্জর শিথিল মন খাড়া হয়ে ওঠে।

কুঞ্জ বরুণের কাছে আর্জি পেশ করতে যায়। ওই ভেজালদারের এক বন্ধু আছে, যে তার হিতৈষী যে সত্যব্রতী। তার মুখে অনেক উপদেশ বাণী আছে। সে পার্টটা নিমাই করে। নিমাইয়ের উচ্চারণ ভালো। গেলবারে ব্রজকে দিয়ে চালাতে হয়েছে। কিন্তু ব্রজর উচ্চারণ অস্পষ্ট। অমন চরিত্রটা, অমন ডায়লগ, ওই দোষে যেন ঝুলে পড়ল।—বরুণ যদি নিজে ওতে নামে, মারকাটারি হবে।

তা বরুণ বুঝি সত্যিই ওই মূর্খ কুঞ্জ দাসের কাছে সেই অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। যে বন্ধন স্বাধীন চিত্তের স্বাধীনতাটুকু হরণ করে নেয়। নইলে কুঞ্জর অনুরোধ রাখতে রাজী হয় বরুণ?

বলে, 'কিন্তু একদিনের জন্যে।'

'ঠিক আছে, তাই সই।'

কুঞ্জ আবার নবীন বয়সের উদ্যম পায় যেন? কুঞ্জ চারুহাসিনীকে গিয়ে অবহিত করে। তারপ বাঁকুড়ার ডাক্তারবাবুর শালাকে জানায়, 'মনস্থির করেই ফেললাম বাবু।'

এই উত্তেজনার মাথায় পরদিনই বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের উদ্দেশে। গিয়ে পড়ে বলতে তো হবে, 'বড়োমুখ করে বলেছিলাম মেয়েকে দিয়ে যাব। মুখ থাকল না। মেয়ে সেই মুখে চুনকালি দিয়ে চলে গেছে!'

দেওয়ালের ওপার থেকে নিশ্চয়ই ব্যঙ্গ হাসি উঠবে। মেয়ে আসরে নেচে মেডেল লোঠার খবর থেকেই যে এ খবরটাও পাওয়া গিয়েছিল, সেই উল্লেখ থাকবে সে হাসিতে। থাককু, তবু বলতে তো হবে। জানাতে তো হবে মুখে কুটো দিয়ে, তোমার গচ্ছিত ধন আমি রক্ষে করতে পারিনি!

কদিন ধরেই মনে মনে চালাচ্ছিল এ মহলা, কিন্তু ভয়ানক একটা ভয় যেন গ্রাস করে ফেলছিল কুঞ্জকে। কুঞ্জ পেরে উঠছিল না।

নিজে পথ করে কাঠগড়ায় উঠতে কে যায়? নিজে দড়ি টেনে গলায় ফাঁসি কে লাগায়? কিন্তু আজ হঠাৎ উৎসাহের ঝোঁকে বল সংগ্রহ করে ফেলল। চলল মহলা করতে করতে। উমাকেও বলতে হবে, 'যা হবার তা হবেই। তাকে রোধ করা যায় না।'

কিন্তু কুঞ্জর গ্রহ নক্ষত্র বোধহয় এখন প্রতিকূল, তাই কুঞ্জর অত মহলা বিফলে গেল। কুঞ্জ একটুর জন্যে ট্রেন ফেল করল। আজ আর সুবিধের ট্রেন নেই। অথচ আর সময়ও নেই। কাল বাদ পরশু বাঁকুড়ায় যাবার ব্যবস্থা।

এই দলবল, এই পাহাড় প্রমাণ সাজসরঞ্জাম! এসব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা নয়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে তো ছোট নেই। বিপিন থেকে শুরু করে সকলেই প্রায় বয়স্ক। তাঁদের আবার ধমক দেবার জো নেই। তোয়াজ করে করে নিয়ে যাওয়া। দুটো দিন হাতে রাখতেই হবে। ট্রেনের টাইম আছে, ট্রেনের ধকল আছে।

এ যাত্রায় আর হল না। ঘুরে এসে হবে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পয়ষট্টি! ভাবছেই তো ঝগড়া করে চলে এসেছি, তাই যাচ্ছি না, আরও দু'দিন ভাবুক!

কুঞ্জ আজ বাইরে গেছে। কালকের আগে আসবে না। নববালা আর বাসমতী রান্নাঘরে বসে বিড়ি টানছিল, আর সুখ দুঃখের কথা কইছিল।

আবার হট্ হট্ করে ছোটো এক দেশে।—অরুচি ধরে গেছে বাবা!—এর থেকে এসব ছেড়ে-ছুড়ে ইস্টিশানে পানের দোকান দিলে হয়। তা থেকে খুব পেট চলবে। অথচ খাটুনি নেই।

আর এই দস্যি কাজে? হাড় পিষে যায়! শুধু তো পার্ট করা নয়, এই রাবণের গুষ্টির ভাত রাঁধা!

গল্প যখন উদ্দাম, হঠাৎ বুকের ভেতর ধড়ফড়িয়ে উঠল। এ কী, অধিকারীর গলা না? চলে গিয়েছিল যে? ওরা তো ধরে নিয়েছিল মাঝে মাঝে যেমন একদিনের জন্যে ডুব মারে কর্তা, তেমনি গেছে।

এই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা করে তারা। কোথায় যায় অধিকারী? এদিকে তো খাজা-গোঁয়ার, ওর যে কোথাও কোনোখানে ভাবের লোক আছে, তা তো মনে হয় না। তবে আছে কে? বলে না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। আসেও ঠিক নিয়ম মাফিক।

জল্পনান্তে ওরা ধরে নিয়েছিল নিশ্চয় কোনো দেবস্থানে যায়। অনেকের আবার ওতে লজ্জা আছে। তাই চেপে যায় কথাটা। ঠাকুর দেবতা করে, লুকিয়ে।

আজও তাই গিয়েছে জানে, হঠাৎ কর্তার গলার স্বর। কাকে যেন বলছে, 'নাঃ বেরোলাম না, ফিরেই এলাম। শরীরটা তেমন ইয়ে ঠেকল না।'

হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বাসমতী বলে উঠল, 'শরীর বুঝি খারাপ?'

'শত্রুর শরীর খারাপ হোক।' বলে চলে যায় কুঞ্জ।

কুঞ্জর কানে একটা সুর এসে বাজে। কে কোথায় কী সুর বাজাচ্ছে কে জানে। কুঞ্জর বিস্বাদ মনটা হঠাৎ একটা আনন্দের আস্বাদে ভরে যায়। কুঞ্জ ভাবছিল, এ পৃথিবীতে বুঝি ভালো জিনিস বলে কিছু নেই। কিন্তু তা তো নয়। আছে ভালো জিনিস আছে। সুর আছে।

সুর আছে, এটা যেন কুঞ্জ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল। সুর হারানো প্রাণ নিয়ে কেবল ভেসে এসেছে, জগতে শুধু বেসুরো অ-সুর আছে। আর কুঞ্জর হাতে চাবুক আছে। অথচ এখনও সুর আছে, গান আছে!

কুঞ্জ তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ভাবে, তার পৃথিবীকে কি আবার সুরে ভরে তোলা যায় না? হয়তো ঠিক এই ভাষায় ভাবতে পারে না মূর্খ কুঞ্জ, তবে ভাবটা এই।

জীবনের রাজপথে চলতে চলতে, তার অনেক গলি ঘুঁজিও চোখে পড়ে বৈকি। দেখা যায় সেখানেও লোকে দিব্যি বাস করছে বড়ো রাস্তার ধারের মানুষদের মতোই। কতসময় কত 'বিয়ে না হওয়া' 'স্বাম স্ত্রী'কে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মতোই সংসার করতে দেখল কুঞ্জ, দেখল কত বিধবাকে সহজভাবে একটা আত্মীয়পুরুষের ঘর করতে। অথচ তাদের মধ্যে কোনোখানে অস্বচ্ছন্দতা নেই।

কুঞ্জই বা কেন তবে একটা দৈবাৎ উল্টোপাল্টা হয়ে যাওয়া ঘটনাকে সোজা করে নিতে পারল না? কেন চিরদিন দেওয়ালের বাইরে রইল? এটা কি কুঞ্জরই ত্রুটি নয়? কুঞ্জ যদি দাবি খাটাত? কুঞ্জ যদি ভয়ে না মরত? কিন্তু কুঞ্জ ভয় পায়। কুঞ্জ ঠিক করল এবার, কুঞ্জ নির্ভয় হবে। কুঞ্জ দাবির বলে দেওয়াল ভাঙবে। দেখবে না কেমন মুখ দেখায় সে।

বাঁকুড়ার পালাটা একবার সেরে আসতে পারলে হয়। কিন্তু পালা তো সহজে মেটে না। বাঁকুড়া থেকে আবার পুরুলিয়া ডাক আসে। হাততালির স্রোতে কুঞ্জ নামের মানুষটার ভিতরের সত্তটা যেন ভেসে ভেসে দূরে সরে যায়। পুরো একটা লরি ভাড়া নিয়ে 'ভবানী অপেরা' পার্টি বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ায় রওনা হয়।

এর ফাঁকে কুঞ্জর কাটোয়ায় বাড়িতে সনাতন নামের সেই পালিয়ে যাওয়া ছেলেটা ঝোড়ো কাকের মূর্তি নিয়ে এসে আরও দুটো পালানো মানুষের কীর্তি কাহিনিতে রং চড়িয়ে চড়িয়ে গল্প করে পুরনো করে ফেলে, এখন মনের সুখে খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে।

আর খামে মোড়া একটা চিঠি এসে কুঞ্জর ঘরের চৌকির ওপর পড়ে আছে। পিয়ন ফেলে দিয়ে গেছে জানলা দিয়ে।

চিঠিটার মধ্যে শুধু একটাই লাইন, নাম সম্বোধনহীন।

'মতলবটা কী? না খাইয়ে মারতে চাও বুঝি?'

পুরুলিয়া থেকে ফিরে এল 'ভবানী অপেরা' পার্টি নতুন মেডেল নিয়ে।

একটা ভেজালদার তার নিজ পরিবারের সকলের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় যেমন লোকে 'বেশ হয়েছে' বলেছে, তেমন কেঁদেছে, শিউরেছে। এবং নাট্যকার আর পরিচালকের দরদ আর দুঃসাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে লোকে।

ভরা মন নিয়ে এসে ঢুকল কুঞ্জ, আর এসেই দেখল সনাতন। দেখেই চড়াৎ করে পায়ের রক্ত মাথায় উঠল তার! বলল, 'তুই এখানে? আবার তুই মুখ দেখাতে এসেছিস?' বলে পায়ের জুতো খুলে মারতে উঠে থেমে গেল।

'মুখ দেখানো' শব্দটাই হঠাৎ মনের মধ্যে আলোড়ন তুলল। জুতো ফেলে বলল, 'আর দুটো কই?'

'তারা আসেনি' ঘাড় গুঁজে উত্তর দেয় সনাতন।

'তারা আসেনি? শুধু তুমি? কেন তোমারই বা আসবার দরকার কি ছিল? কোথায় তারা?'

'জানি না।'

'জানিস না? মিথ্যেবাদী হারামজাদা! একসঙ্গে ভাগলি, আর—'

'আমি ভাগিনি, ওরাই আমায় বলে...' সনাতন বোঝে এই মত্ততায় ছাড়া কথাগুলো বলা যাবে না। তাই সনাতন তড়বড় করে বলে ওঠে, 'যা কষ্ট দিয়েছে আমায়! খেতে দেয়নি—তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'খেতে দেয়নি? খেতে? নবাব খাঞ্জা খাঁ আবার খেতে চান! বলি ওরাই বা কোথা থেকে খেতে দেবে শুনি?'

সনাতন এখন রাজসাক্ষী। সনাতনকে এখন নিজের দিক বাঁচিয়ে কথা বলতে হবে। তাই সনাতনের বলতে বাধে না, কর্তার ঘর থেকে টাকা চুরি করে পালিয়েছে লিলি। আর সে টাকা শেষ হতে লিলি রোজগার ধরেছে। না করে উপায় কি! খেতে তো হবে।

'রোজগার!'...কুঞ্জর অসতর্ক কণ্ঠ বিস্ময়ের চাবুকে আহত হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলে, 'কিসের রোজগার?'

সনাতন ঘাড়টা হেঁট করে। আর হঠাৎ তার সেই হেঁট হওয়া ঘাড়ের ওপর খটাখট করে এসে পড়ে একটা ভারী জুতোর পাটি। 'বলবি আর? বলবি আর?'

সনাতন ছুট দেয়। আর কুঞ্জ জুতোটা হাত থেকে ফেলে ঘরে ঢোকে। ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে যায় কুঞ্জ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চৌকির ওপরকার জিনিসটার দিকে।

তারপর জুতোর হাতটা ধুয়ে এসে, আস্তে খামটা খোলে। পড়ে—'মতলবটা কি? না খাইয়ে মারতে চাও বুঝি?'—আবার পড়ে।—আবার পড়ে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দু'দিক থেকে জুতো দু'পাটি কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে দিয়ে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আবার আমতা লাইনের সেই গণ্ডগ্রামটার সেই পায়ে চলা সরু পথের উপর দু'পাটি ভারী ভারী জুতোর ছাপ পড়ে...ভারী জুতো আর আধময়লা ধুতি শার্ট পরা একটা লোককে আবার সেই বেড়ার দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে দেখা যায়।

ভিতরের দৃশ্যটি যথাযথ। সেই উঠানে তুলসী ঝাড়, এখানে ওখানে গাঁদা টগর জবা, দাওয়ায় উঠতে তিনটে সিঁড়ি। কোনো কিছুর ওদিক ওদিক নেই। তবু যেন বুকটা কেঁপে ওঠে কুঞ্জর।

তবু কুঞ্জ অধিকারীর মনে হয় যেন বাড়িটা শ্মশান শ্মশান। যেন এখুনি কোনোখান থেকে প্রেতাত্মারা কথা কয়ে উঠবে।

কী হয়েছে? কেউই তো থাকে না কোনো দিন, তবে আজ এমন কেন? সত্যিই তো তাহলে—

কিন্তু আজও কুঞ্জ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কেন? কুঞ্জর যে সংকল্প ছিল এবার আর ভয় নয়। এবার নিজের দাবিতে সবলে ঘরে প্রবেশ করবে। এবার বলবে, 'জগতে কতই দেখলাম। কত ভুলের কারবার 'ঠিক'-এর বাজারে চলে যাচ্ছে, কত গলি ঘুঁজি রাজরাস্তায় এসে মিশেছে। তবে দৈবাতের একটা ভুল শুধরে নিতে বাধা কোথায়?...ভুল তুমিও করেছ, আমিও করেছি, ব্যস শোধ-বোধ। আবার জীবনের পথে—।'

কিন্তু সে সব কথা হারিয়ে গিয়ে আবার শুধু ভয় কেন? কেন আজও দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে বোকার মতো? কতকাল ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ও? অনন্তকাল?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল কুঞ্জ। দেখতে পেল, উঠোনের দড়িতে একটা কাথা শাড়ি সেমিজ শুকোচ্ছে, দেখল দাওয়ার ধারে মাজা ঘটিতে জল। তার মানে বাড়িতে জ্যান্ত মানুষ আছে।

আর সে নিত্য কাজ করছে। কোথায় তবে গেল সে? পড়শীর বাড়ি? পুকুরে জল আনতে? কতক্ষণের জন্যে?

ভরা রোদ্দুরের বিকেল, চারিদিক আলোয় খাঁ খাঁ করছে, শূন্য বাড়ির মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গলাটা শুকিয়ে আসে কুঞ্জর। আর নিজেই হঠাৎ সে প্রেতাত্মার গলায় কথা বলে ওঠে, 'একটু জল পাওয়া যাবে? খাবার জল?'

কাকে বলে ওঠে, জানে না। কিন্তু তার এই অবোধ প্রশ্নের উত্তর এসে যায় হঠাৎ! ঘরের মধ্যে থেকে একটা ক্ষীণ রোগীকণ্ঠ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, 'কে? কে? জল চাইল কে?' সদ্য ঘুম ভাঙার গলা? না? জ্বরে আচ্ছন্নর গলা।

কুঞ্জর বিহ্বল চেতনা যেন ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। কুঞ্জর সেই সাহসী সংকল্প দৃঢ় হয়ে দাওয়া থেকে ঘরে এনে ফেলে কুঞ্জকে! অতএব কুঞ্জর ঘরে ঢোকা হয়।—হয়।—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে পিছিয়ে আসতে হয় কুঞ্জকে। বুঝিবা চোখটাও বুজে। বিছানায় যে পড়ে আছে, সে কে!

মুখের প্রায় সমস্ত চামড়াটা পোড়া কোঁকড়ানো, কালো জামড়ো পড়া।...তার মাঝখানে মাঝখানে সত্যিকার রঙের এক এক চিলতে আভাস যেন আরও ভয়াবহ বীভৎসতার সৃষ্টি করেছে।

যে 'সত্যি'টা 'পরী'র তুলনাবাহী ছিল। আর যার অহঙ্কারে সেদিন ওই মুখরা মেয়েটা সদর্পে বলেছিল, 'বাহবা'ও ছিল বৈ কি। ছিল রূপের 'বাহবা'।

কুঞ্জ ভাবতে পারত এ উমাশশী নয়, আর কেউ। ভাবতে পারত, উমাশশী মরে গেছে, এটা তার প্রেতাত্মা। কিন্তু কুঞ্জকে সেই 'ভাবনা'র শান্তিটুকুও দিল না ওই শয্যাবিলীনা নারী।

শক্তি নেই তবু মুখর হাসি হেসে বলে উঠল, 'ভেবেছিলাম জ্যান্ত থাকতে এই পোড়ামুখটা আর দেখাব না, একেবারে মরা মুখই দেখবে। হল না। দেখে ফেললে।'

'উমাশশী নয়', বলে আর স্বস্তি পাওয়া যায় না। কুঞ্জ মেজেয় পাতা বিছানার ধারে মাটিতে বসে পড়ে হাহাকারের গলায় বলে, 'এ কী?'

উমাশশী হাসে। ভারী বিকৃত দেখায় মুখটা। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'কোন্‌টা? বিছানায় পড়ে থাকা, না পোড়া মুখটা?'

'দুই! দুইই উমা। এ কী করে হল?'

উমা কষ্টে বলে, এত দেরিতে এলে, বলবার সময় আর কই? তা বলে ভেবো না, না খেতে পেয়ে মরছি। সে অহঙ্কার তুমি করতে পারতে না। এখনও অনেক টাকা আছে। গয়লা-বৌ আমার অনেক করছে, বলেছি তাকেই দিয়ে যাব।...চিঠিটা? ছলনা। দুষ্টুমি! তোমার টনক নড়াবার চেষ্টা। অসুখই। জ্বর রক্ত অতিসার। একেবারে শেষ করে ফেলল।'

কুঞ্জ আর্ত চিৎকার করে, 'ডাক্তার দেখেনি? ওষুধ পড়েনি?'

'পড়েছিল।' আবার হাসে উমা, 'গয়লা-বৌয়ের টোটকা। তার পর থেকেই চরমে উঠল আর কি।'

'তোমার চিঠি আমি পাইনি উমা—' কুঞ্জ হাহাকার করে ওঠে, 'বাইরে বাইরে ঘুরছিলাম। এক 'কাল' পালা নিয়ে—'

'পাওনি বুঝেছিলাম।'

কুঞ্জ হাউ হাউ করে কেঁদে বলে, 'বুঝেছিলে? এখনও এত বিশ্বাস করেছিলে আমার ওপর?'

'কি যে বল!'

উমা আরও আস্তে বলে, 'যেদিন বেলেঘাটার বস্তিতে এসে দাঁড়ালে সেই দিনই—না তারও আগে বোধ হয়। নইলে চিঠি দিয়ে ডাকতে পেরেছিলাম কি করে?...আর এখনও তা পারলাম কি করে?'

'উমা, আমি যাই! ডাক্তার ডেকে আনি—'

'আঃ, থামো! পোড়া মুখটা যখন দেখেই ফেললে, তখন তোমার মুখটা দেখতে দাও দু'দণ্ড।'

'আমার মুখটাও পোড়া, উমা! অহঙ্কার করে বলে গিয়েছিলাম তোমার মেয়েকে তোমার কাছে দিয়ে যাব! অহঙ্কার রইল না। ফিরে গিয়ে দেখলাম সেই ঘাগরা পরা মেয়েটা—' কুঞ্জ একটু থেমে বলে, 'দলের একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে! এ্যাঁ! পালিয়েছে!' উমা হঠাৎ ভাঙা গলায় উচ্চ হাসি হেসে বলে ওঠে, 'বাঃ বাঃ। মায়ের উপযুক্ত মেয়ে হয়েছে তাহলে! দেখলে রক্তের গুণ? দূর দূরান্তরে রেখে একবারও চোখে না দেখিয়ে, তবু কেমন গুণটি ফলালাম?'

'আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি—' কুঞ্জ কোঁচার খুঁট তুলে চোখ মোছে, 'কত ভালো পাত্তর ঠিক করেছিলাম তার জন্যে।'

'স্বপ্নেও ধারণা করনি? কেন গো? ওর মা-বাপের পরিচয়টা বুঝি ভুলে গিয়েছিলে?'

কুঞ্জ উত্তর খুঁজে না পেয়ে বারে বারে চোখটা মুছে নিয়ে বলে, 'মুখের এ অবস্থা হল কি করে?'

'ওমা, এখনও তুমি মুখের কথা ভাবছ? ভাবলাম ভুলে গেলে! কিছু না। আমার সেই ভালোবাসার লোকের ভালোবাসার চিহ্ন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলার পুরস্কার। বিছানায় শুয়েই মুখে অ্যাসিড্ ছুঁড়ে—'

'অ্যাসিড্!'

'হ্যাঁ, শুনলাম আমাকে শিক্ষা দিতে হাতের কাছে রাখা ছিল। বস্তির কাকে দিয়ে আনিয়ে—'

'থাক্ উমা, কথা বোলো না, কষ্ট হচ্ছে। আমি ডাক্তার আনি।'

'আনো তবে। তোমার আবার আক্ষেপ থেকে যাবে বিনি চিকিচ্ছেয় ম'লো—'

না, আক্ষেপ থাকেনি কুঞ্জর। করেছিল চিকিৎসা। কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিল। তার নির্দেশে কলকাতায় এনে ভালো হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু বাঁচল না উমাশশী। তবে কুঞ্জ তার প্রতিশ্রুতিও রাখল।

সেই আধপোড়া মুখটার মুখাগ্নি করল। করল শ্রাদ্ধ শান্তি। আর মোটা-বুদ্ধি গ্রাম্য লোকেরা যা করে তাই করল, সেই উপলক্ষে লোকজনও খাওয়াল বিস্তর।

কর্তার পরিবার ছিল এখনও, এই দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সবাই। আর কর্তার সেই হঠাৎ চলে যাওয়াটার হদিশও পেল। ছিল গিন্নি রুগ্নটুগ্ন।

সব মিটে গেলে জীবনযুদ্ধে পরাজিতের চেহারা নিয়ে কুঞ্জ লিলিবালার অনেক খোঁজ করল, কিন্তু এই শহর কলকাতার রাক্ষসী ক্ষুধার জঠরে কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে এক ফোঁটা লিলিবালা, কে কার পাত্তা দেবে? নিমাই নামের যে অপদার্থ ছেলেটাকে ভর করে অবোধ দুঃসাহসী লিলিবালা ওই রাক্ষসীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল, সে ছেলেটা হয়তো পালিয়েছে প্রাণ বাঁচিয়ে।

আর লিলিবালা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় পথ ভুল করে ধীরে ধীরে নেমে গেছে মৃত্যুর অন্ধকারে।

তবু সাহস করে 'ভবানী অপেরা' পার্টির দরজায় এসে দাঁড়াতে পারেনি। যেখানে জীবন ছিল, আশ্বাস ছিল, আশ্রয় ছিল।

কোথায় কি থাকে সেটা টের পায় না বলেই না মানুষের এত ভুল পথে ঘুরে মরা!

জ্বলন্ত নাটক নিয়ে রাজবাড়ির যাত্রা প্রতিযোগিতায় আর যোগ দেওয়া হল না কুঞ্জর, কবে যেন হয়ে গেছে সে সব। বায়না করাতে এসেও ফিরে যাচ্ছে লোকে, প্রোপ্রাইটারকে পাচ্ছে না।

প্রোপ্রাইটার তখন লিলিবালার মৃত্যু সংবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওটা পেলেই যেন বাঁচে সে। নিশ্চিন্ত হয়ে কাজকর্ম করতে পারে।

সেই বাঁচাটা হল না কুঞ্জর। সে খবরটা না পেয়েই ফিরে এল একদিন কাটোয়ায়। দলের অবস্থা তখন শোচনীয়। কেউ কেউ ছেড়ে গিয়ে অন্য কাজে যোগ দিয়েছে। মাইনে পাচ্ছিল না ঠিকমতো, করবে কি? আর যারা কুঞ্জর নিতান্ত পুষ্যি, তারা পড়ে আছে আর অধিকারীকে দু'বেলা গাল পাড়ছে। কারণ খাওয়াদাওয়া খারাপ হচ্ছে।

বাসমতী আর নববালা স্টেশনের ধারে পানের দোকান দিয়েছে। পানের সঙ্গে না কি পানীয়ও রাখছে তফাতে, অতএব তাদের জন্যে ভাবনা নেই। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কুঞ্জ আসতেই ব্রজ বিপিন জগবন্ধু ছেঁকে ধরল, 'ভবানী অপেরা' কি উঠে যাবে?'

কুঞ্জ তক্ষুনি রোদ্দুরে তেতে পুড়ে এসেছে, তবু সমীহ করল না। যে মনিব অধস্তন সম্পর্কে উদাসীন, তাকে কে সমীহ করে? রোদ্দুরে তেতে পুড়ে এসেছে কুঞ্জ, তবু তেতে উঠল না। শান্ত গলায় বলল, 'বোস বোস, বল দিকি তোরা কি চাস?'

'আমরা?'

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ওদের ভূমিকা এখানে কি!

কুঞ্জ বলল, 'বল? বল কী চাস? থাকবে, না উঠে যাবে?'

ওরা একত্রে বলে উঠল, 'থাকবে, থাকবে।'

থাকবে না তো তারা কোথায় যাবে?

'বেশ, তবে থাকবে।...'ভবানী অপেরা' থাকবে, তোরা থাকবি। নতুন করে জাঁকিয়ে তুলি আর একবার, অনেকদিন অবহেলা করা হয়ে গেছে।'

বরুণ এ দলে নেই, বরুণের কাছে যেতে হয়। 'লেখক, কি লিখলে এর মধ্যে?'

'কিচ্ছু না।'

'সে কি হে? এতদিন সময় পেলে?'

'মন লাগেনি। আর ভালো লাগছে না। আমায় এবার আপনি ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব? তোমায়?' কুঞ্জ হেসে ওঠে, 'তোমায় ছাড়ব তো থাকবে কি আমার?'

'সবই থাকবে।' বরুণ নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'চলেই যেতাম! নেহাত আপনার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারা গেল না তাই—'

'দেখা করলেই পারা যাবে কেমন?'

কুঞ্জ বলে, 'এই তো হল দেখা, কই যাও?'

বরুণ হেসে ফেলে বলে, 'আপনি অনুমতি করলেই যেতে পারি।'

'ও', অনুমতির অপেক্ষা? অনুমতি না দিলে তো যাওয়া বন্ধ? ঠিক আছে, দিলাম না অনুমতি, এবার কি করবে কর?'

'করবার আর থাকছে না কিছু। কিন্তু বাস্তবিকই আমাকে আর আটকাবেন না। রাস্তার লোক আবার রাস্তাতেই ফিরে যাই।'

'হবে না নাট্যকার, ওসব হবে না।' কুঞ্জ আগের মতো উদাত্ত গলায় বলে, 'ভবানী অপেরা' পার্টিকে আবার নতুন করে জাঁকিয়ে তুলতে হবে। সম্বল সহায়হীন হয়ে পারব কি করে?'

বরুণ নির্নিমেষ চোখে একবার ওই অতি উৎসাহী মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'আর পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

কুঞ্জ ঈষৎ মলিন হয়ে যায়। বলে, 'পারব না বলছ?'

'বলছি না। মনে হচ্ছে, সেটাই বলছি।'

'কিন্তু আমি বলছি বরুণ, পারব! কেউ পাশে থাকলেই সব পারা যায়। একটা ভালোবাসার লোক কাছে আছে, এটুকু জানতে পারলেই মনে বল আসে ভাই।...হ্যাঁ, ভাই-ই বলব এবার থেকে।' কুঞ্জ একটু হাসে, 'বরাবর ইচ্ছে হত, মুখে এসে পড়ত, কিন্তু সামলে নিতাম। কেন জানো?'

বরুণ অবাক হয়ে তাকায়।

এই নির্দোষ সম্বোধনটা মুখে এসে পড়লেও সামলে নেবার কারণ আবিষ্কার করতে পারে না সে।

কুঞ্জ আর একটু হাসে, 'জামাই করব বলে।...বুঝলে? রেলগাড়িতে দেখে পর্যন্তই ওই বাসনা। দেখ মুখ্যুমি? মাথা নেই মাথা ব্যথা! মেয়ে নেই জামাই!...বল, লিলি কি আমার মেয়ে? অথচ তাকে 'মেয়ে' সাজিয়ে জামাই ঠিক করতে বসলাম! মুখ্যুমির ফল ফলল তো? ওর বাপ আমার মুখে জুতো মেরে গেল।'...

কুঞ্জ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'তবে আক্ষেপটা রয়ে গেল এই, মেয়েটা আমায় মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুর ভেবে গেল। মানে ভেতরটা তো ধরতে দিতাম না। ভাবতাম কে কখন সন্দেহ করে বসবে। হয়তো খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে কার গর্ভের মেয়ে।'

বরুণ ওই বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'সনাতন কোনো খবর করতে পারল না?'

'নাঃ! যে হারিয়ে যায়, সে নিজে না ধরা দিলে কার সাধ্য খুঁজে পায় রে ভাই! ভেবেছিলাম কষ্টে পড়লে ভুল বুঝবে। এসে দাঁড়াবে।...কিন্তু এখন বুঝছি ভুল ভেবেছিলাম, দাঁড়াবে কেন? শুধু তো সে তার বাপেরই মেয়ে নয়, মায়েরও মেয়ে যে! আমার মধ্যে কি আছে না আছে টের তো পায়নি, আসবে কি জন্যে?'

বরুণ বলে, 'ও নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না, মিস্টার দাস! ধরে নিন—সে যেখানে আছে ভালো আছে, সুখে আছে।'

'তাই, তাই ভাবছি ভাই এখন। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মরণ খবরটা পেয়ে একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে বসি। হল না। তবে ওটাই ভাবব, ভালো আছে সুখে আছে..তবে আর তোমার অপেরা পার্টি জাঁকিয়ে তুলতে বাধা কি ভাই?'

বরুণের হাতটা চেপে ধরে অধিকারী কুঞ্জ দাস।

বরুণ সে হাত ছাড়িয়ে নেয় না।

নরম গলায় বলে, 'না, বাধা আর কি। তুলুন জাঁকিয়ে।'

কুঞ্জ দাস সেই ধরা হাতটায় একটা নিবিড় চাপ দিয়ে বলে, 'তা হলে এবার আর ছাড়ছি না ভায়া, এবার একটা রোমান্টিক কাহিনি লিখতেই হবে।...আর 'চাবুক' নয়, 'দুঃশাসন' নয়, 'মহাকালের খাতা' নয়, শুধু ভালোবাসার কথা। স্নেহ প্রেম মায়া মমতা ভালোবাসা।...মহাকালের খাতায় কার কি জমা খরচ লেখা হচ্ছে, আমরা কি তার হিসেব রাখতে যাবার অধিকারী? তবু শুধু শুধু বড়াই কেন? ও খাতায় হাত দেবার আস্পর্ধা করতে গেলে কোন্ ফাঁকে নিজের জমার ঘরেই শূন্যি বসে যাবে কিনা কে জানে।'

—ঃ ঃ—

শুধু তারা দু'জন

'না না, মোটেই না। কারণ কিচ্ছু নেই।'

'কিচ্ছু'টার উপর বিশেষ একটা জোর দিল প্রদোষ, তার সঙ্গে হাতের সিগ্রেটটায় টোকা দিল। ছাইটা অ্যাশট্রেয় যতটা না পড়ল, উড়ল তার বেশি। তারপর প্রদোষ উদার গলায় বলল, 'বলেছি তো সি ইজ এ গুড গার্ল—ও, তুমি তো আবার সাহিত্যিক মানুষ, বাংলাতে ভাব প্রকাশ করতে না পারলে চটে যাও—'

আর একবার সিগ্রেটটায় টোকা দিল প্রদোষ, ছাই জমে ওঠেনি তবুও দিল।

প্রদোষ কি তার ভিতরের দ্বিধার ভস্মাবশেষটুকুকে ওইভাবে টোকা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছে? এটা তার প্রতীক?

প্রান্তিকের অন্তত তাই মনে হল। সাহিত্যিক প্রান্তিক সোম।

প্রদোষ হয়তো ওর ওই সাহিত্যিক বন্ধুর ভালোবাসাটুকু টোকা দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারছে না, তাই কৈফিয়ত দিচ্ছে, 'বাংলায় তাহলে কী বলব? তিনি একটি আদর্শ মহিলা তো? তাই বলছি। বাস্তবিকই সোম, ধরবার মতো কোনো দোষই নেই নন্দিতার। বরং হিসেব করে দেখলে, বলতেই হবে সর্বগুণসম্পন্না। বিষয় ধরে ধরে নম্বর দিলে প্রত্যেকটি বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। স্ত্রী হিসেবে অতি উত্তম, গৃহিণী হিসেবে অতুলনীয়া, জননী হিসেবে তো কথাই নেই—মা যশোদা হার মানেন, সামাজিক ভূমিকায়—কী বলে তোমাদের বাংলায়? অন—অনবদ্য? কী? ঠিক হল? আর—'

প্রদোষ ওর স্বভাবগত বঙ্কিম হাসিটি হেসে বলে, 'আর যদিও আপাতত পরীক্ষার সুযোগ আসেনি তবু মনে হয়, অবশ্য অন্যের কাছে, প্রেয়সী হিসেবে এখনও যথেষ্ট চার্মিং। কাজেই দোষ-টোষ কিছু দেখাতে পারছি না।'

প্রান্তিক ওর এই বাচালতার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। বরাবরই প্রদোষ বেশি কথা বলে, কথার কায়দা দিয়েই যেন নিজেকে বিশিষ্ট করতে চায়, কথার ফুলঝুরি কেটেই নিজেকে বিকশিত করে। তবু আজ যেন বেশি বাচালতা করছে। এটা কি দুর্বলতা ঢাকবার ছল? নাকি শুধু খেয়াল? কিন্তু এ কী সর্বনাশা খেয়াল? প্রান্তিক তীক্ষ্ম চোখেই তাকিয়ে বলে, 'দোষ দেখাতে পারছ না, তবু ত্যাগ করতে চাইছ?'

'ত্যাগ?' প্রদোষ শব্দ করে হেসে ওঠে। 'ত্যাগ করতে চাইছি এ-কথা কে বলল? বরং এ-কথা বলতে পার, তিনি আমার সম্পর্কে ভরসা ত্যাগ করুন এইটুকু প্রার্থনা করছি। সাদা বাংলায়, রেহাই চাইছি।'

প্রান্তিক ওদের দু'জনের বন্ধু। প্রদোষের, নন্দিতার। তাই প্রান্তিক ওদের জীবনের এই জটিলতার খবরে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। আর সেই 'বন্ধুর চিত্ত' নিয়েই এসেছে, যদি পরামর্শ আর সহানুভূতির স্পর্শে ওদের দাম্পত্য-জীবনের ভুল-বোঝাবুঝির ফাটলটা মেরামত করে তুলতে পারে।

কিন্তু প্রদোষ বলেছে, 'ভুল-বোঝাবুঝি? নাথিং। পরিষ্কার সূর্যালোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। শুধু একটি মাত্র কথা—আমার আর ওকে ভালো লাগছে না।'

আহত প্রান্তিক বলেছিল, 'শুধু তোমার আর ওকে ভালো লাগছে না? ওর কোনো দোষ নেই তবুও?'

প্রদোষ সেইভাবেই সোফায় হেলান দিয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে অলস বিলাসের ভঙ্গিতে বলে, 'তাই তো দেখছি। ভদ্রমহিলা তো সেদিকেও আমায় অসুবিধেয় ফেলেছেন। খানিকটা দোষ দেখাতে পারলে হয়তো তোমরা কিঞ্চিৎ শান্ত হতে।'

প্রান্তিক স্থির গম্ভীর গলায় বলে, 'শুধু আমাদের কথাই ভাবছিস প্রদোষ? আর তোর বিবেক? তাকে শান্ত করবি কী দিয়ে?'

'বি-বেক!' প্রদোষ আর একবার হেসে ওঠে। বলে, 'তুমি যে প্রায় 'বাবা মহারাজ'দের সুরে কথা বলছ হে! বিবেক দেখিয়ে আবার আমাকে সেই পুরনো ফ্রেমের খোঁটায় বেঁধে রাখতে চাও? তা বিবেকই যদি দেখাচ্ছ তো বলি, আমার বিবেক এইটাই বলছে, ভালো যখন লাগছে না আর তখন ওই এই ভালো লাগার ভাবনা কেন? সেটাই বরং অসততা।'

প্রান্তিক গাঢ় গম্ভীর গলায় বলে, 'কিন্তু প্রদোষ, তুমি জানো তোমাদের দু'জনের মধ্যেকার ভালোবাসা, তোমাদের সুখী সমৃদ্ধ দাম্পত্য-জীবন, আমাদের সকলের কাছে দৃষ্টান্তের মতো ছিল।'

প্রদোষ আর একটা সিগ্রেট ধরাবার আগে ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'তোমার নিজের কথার মধ্যেই কথার উত্তরটা রয়েছে সাহিত্যিক, 'ছিল'। এখন আর নেই।'

'কিন্তু কেন নেই? না-থাকবার একটা যুক্তি থাকবে তো?'

'যুক্তি' প্রদোষ আবার শব্দ করে হেসে ওঠে, 'সব কিছুতেই যুক্তি থাকবে এ তো তোমাদের ভারী আবদার হে! এই যে তোমার মাথাটা দেখতে পাচ্ছি, তুমিও অবশ্যই আর্শিতে দেখতে পাও, ওই মাথায় আগে কি বলে যেন—ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম? তাই না? ছিল কিনা? তোমার চুলের সৌন্দর্য দেখবার মতো ছিল। কিন্তু এখন? এখন আর নেই! এখন মাথা-জোড়া টাকের আভাস। এর যুক্তি কি?'

প্রান্তিক ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'এটা একটা তুলনা হল?'

'হল না কেন? তুমি বলছ একটা জিনিস যখন ছিল, এবং সুন্দর মূর্তিতে ছিল, সেটা চিরকাল থাকবে না কেন? না-থাকলে অন্তত তার যাওয়ার ব্যাপারে যুক্তি চাই। তাই উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি সবকিছুর পিছনেই যুক্তি থাকে না।'

প্রদোষের রং ময়লা, কিন্তু মুখের ছাঁদটি সুন্দর। মা-পিসি বলত—'কুঁদেকাটা মুখ'। বন্ধুরা বলত, গ্রিসিয়ান কাট। এখন ওর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে পাথর কাটা মুখই বটে। এ মুখের রেখায় রেখায় পাথরের নির্লিপ্ততা। প্রদোষ তার সেই নির্লিপ্ত মুখ নিয়ে বলছে, তার বিবাহিতা স্ত্রীকে তার আর ভালো লাগছে না।—না, কারণ কিছু নেই। শুধু ভালো লাগছে না। তা সেটাকেই যদি কারণ বল, তো কারণ।

প্রান্তিক ব্যথিত গলায় বলে, 'ষোলো বছর ঘর করে, কেন এই অদ্ভুত খেয়ালটা তোমায় পেয়ে বসল প্রদোষ?'

'তা যে-কোনো জিনিসই একঘেয়ে লাগবার জন্যে খানিকটা সময় তো লাগেই।'

প্রান্তিক রুষ্ট মুখে বলে, 'তোমার এই কন্দর্পকান্তিখানি তো বেয়াল্লিশ বছর ধরে দেখে আসছ, একঘেয়ে লাগছে না?'

প্রদোষ যেন ওর এই রোষে আমোদ পায়। তাই প্রদোষের মুখে একটা কৌতুকের আভাস ছড়িয়ে পড়ে।

প্রদোষ বন্ধুর কথার উত্তরে বলে, 'এখনও পর্যন্ত তো লাগেনি। বরং আর্শির সামনে দাঁড়ালে রীতিমতো ভালোই লাগে! একঘেয়ে লাগলে সুইসাইড করে ফেলতে পারি, বলা কিছু যায় না।'

'থামো! বেশি কথার কায়দা দেখাতে এসো না। মিসেস ভৌমিকের দিকটা একবারও ভেবে দেখবে না তুমি?'

'মিসেস ভৌমিক?' প্রদোষ এবার এলায়িত ভঙ্গি করে সোজা হয়ে বসে। সিগ্রেটটা অকারণেই একবার ঝাড়ে। তারপর বলে, 'তোমাদের মিসেস ভৌমিকের কোনো অসুবিধে ঘটাচ্ছি না আমি।'

'কোনো অসুবিধে ঘটাচ্ছ না?'

'না। অন্তত আমি তো মনে করি না ঘটাচ্ছি। তাঁর জন্যে ঘর-বাড়ি, টাকা-কড়ি, পদমর্যাদা, সামাজিক পরিচয় সবই রইল, শুধু প্রার্থনা—অনুগ্রহ করে আমায় ছেড়ে দিন। আমার ওপর যেন না সেই পুরনো প্রেমের ট্যাক্স বসাতে আসেন।'

'পুরনো প্রেম? বলতে লজ্জা করল না প্রদোষ?'

'লজ্জা? কই, করছে না তো! বরং এইটাই ভেবে লজ্জা করছে, যে ভালোবাসা আর নেই, যা কালের বাতাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তিনি সেইটার জন্যে হ্যাংলামি করছেন। অথবা সেইটার অভাবে রাগারাগি করছেন।'

প্রান্তিক ওই নির্মম মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'প্রদোষ, তোদের বিয়ের কথাটা তোর মনে পড়ে না?'

প্রদোষ বঙ্কিম হাসি হেসে বলে, 'সেন্টিমেন্টে আঘাত হানছ? কিন্তু বন্ধু হে, আমি তোমার গল্পের নায়ক নই যে, সহসা একটি কথার আঘাতে মুহূর্তে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবে। আমি হচ্ছি রক্তমাংসে গড়া বাস্তব মানুষ। আমি বুঝি ফাঁকা আইডিয়ার চরণে জীবনকে অর্ঘ্য দেওয়াটা প্রকাণ্ড একটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, একদা আমি শ্রীমতী নন্দিতার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। তাঁকে পাবার জন্যে বাড়িতে অপ্রিয় হয়েছিলাম, ওদের বাড়িতেও প্রায় অপমানিত হয়েছিলাম, তারপর ওকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করে এসে উভয় পক্ষের অভিভাবকের মুখ চুন করে দিয়েছিলাম। এবং তারপরে বেশ কিছুকাল ধরে প্রায় স্বর্গসুখে ভেসেছিলাম, এ সবই আমার মনে আছে। ভুলিনি কিছুই। শুধু সেই স্বর্গ আর এখন স্বর্গ বলে মনে লাগছে না।'

প্রান্তিক উঠে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'তা তো লাগবেই না। কারণ তুমি এখন নতুন স্বর্গ আবিষ্কার করেছ! তাই না?'

প্রদোষ আবার হো হো করে হেসে ওঠে, হাসির গলাতেই বলে, 'স্বর্গ কি নরক তা জানি না, তবে আপাতত 'স্বর্গ' 'স্বর্গই লাগছে। কিন্তু প্রান্তিক, সত্যি বল, তার জন্যে আমি নন্দিতাকে কিছু অসুবিধেয় ফেলেছি?'

'অসুবিধেয় ফেলেছ কিনা জিজ্ঞেস করছ?' প্রান্তিক ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'তার মানে, তোমার ধারণায় ফেলনি অসুবিধেয়?'

'অফকোর্স? আর সে ধারণাটা আমার ভুল নয়। নন্দিতাকে আমি বলতে গেলে সর্বস্ব দিয়ে রেখেছি। ব্যাঙ্কে আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, অতএব যখন ইচ্ছে, যখন দরকার, টাকা তুলে নিতে পারছে, ভাড়া দেওয়া বাড়িটা ওর একাকার নামে, কাজেই ভাড়াটের ছশো টাকা ওর নিজস্ব, সারা সংসারের চাবি ওর হাতে, ছেলেটা মানুষ হচ্ছে ওরই ইচ্ছানুযায়ী, কোথাও কোনোখানে আমার ইচ্ছের অঙ্কুশ আঘাত করছে না তাকে। আর কি করতে পারি বল? ওর থেকে আর বেশি কিছু করার নেই আমার।'

প্রান্তিক গাঢ় গলায় বলে, 'কিন্তু আগে এ-সবের ওপরে এর থেকে বেশি, অনেক বেশি কিছু করবার ছিল তোমার প্রদোষ! করেওছ। এই বস্তুপুঞ্জটাকেই 'সর্বস্ব' বলে মনে করনি। আরও কিছু দিয়েছ।'

প্রদোষ উদাস গলায় বলে, 'তখন যা দেবার ছিল এখন তা নেই। এছাড়া আর কোনো বক্তব্য নেই আমার।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার একই কথা বলে প্রদোষ। নন্দিতাকে সে কিছুমাত্র অযত্ন করছে না, বরং

যতদূর সম্ভব সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে চেষ্টা করছে। নন্দিতাকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, নন্দিতার গতিবিধি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করছে না, ইত্যাদি।

প্রান্তিক তবু চেষ্টা করছে। সে যেন ওদের লঘু একটু দাম্পত্য কলহ মিটিয়ে দিতে এসেছে, তাই সে বলে, 'অথচ আগে? মনে আছে তোমাদের, প্রদোষ? মিসেস ভৌমিক যদি একদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যেতেন, তুমি ছটফট করতে, রাগারাগি করতে রাতদুপুরে সেখানে গিয়ে হাজির হতে, নিয়ে চলে আসতে। ব্যাপারটা প্রত্যেকবারই এমন মহাভারত হয়ে উঠত যে, সে-সব এখন ভুলে গেছি বললে অবিশ্বাস্য হবে।'

প্রদোষ উঠে দাঁড়ায়, ঢিলে পায়জামার ঢিলে পকেটে হাত দিয়ে পায়চারি করতে করতে বলে, 'একদা আমি হামা দিতাম, সোম! আর একদা সিগারেট খেতে গেলেই কাশতাম। বুঝলে? আশ্চর্য, তুমি একটা নভেল-লিখিয়ে ব্যক্তি অথচ কিছুতেই কেন বোঝাতে পারছি না তোমাকে—যা ফুরিয়ে গেছে, তা দেব কোথা থেকে? তবে এর জন্যে নিজেকে আমি খুব একটা পাষণ্ড ভাবতে পারছি না—'

'ভাবতে পারছ না?'

প্রান্তিক উত্তেজিত গলায় বলে, 'তুমি একটা বিবাহিত ব্যক্তি, একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলের বাপ তুমি, হঠাৎ তোমার ভালোবেসে-বিয়ে-করা, আর এতদিনের-ঘর-করা স্ত্রীকে বলছ 'আমরা ওপর দাবি ত্যাগ কর' কারণ আমি এখন পরকীয়া প্রেমে মেতেছি। তবু তুমি নিজেকে পাষণ্ড ভাবতে পারছ না?'

'না, পারছি না। কারণ আমি মনে করি না মানুষ একটা ইঁট-কাঠের ঘর, যার পরিবর্তন নেই। তাছাড়া আমি তো স্বীকার করছি ভাই, ফ্রাঙ্কলি স্বীকার করছি, নন্দিতার মধ্যে আমি আর কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি মহৎ চরিত্র মহাত্মা নই, নেহাতই ক্ষুধা-তৃষ্ণার অধীন রক্ত-মাংসের মানুষ মাত্র, কাজেই—'

প্রান্তিক বোধকরি আজ ওদের সম্বন্ধে একটা হেস্ত-নেস্তই করতে এসেছে, তাই অন্যদিনের মতো তর্কের মাঝখানে রেগে উঠে যায় না। যদিও অন্যদিন তর্ক এতদূর গড়ায় না। প্রান্তিক তাই তীব্র গলায় বলে—'মানুষ বলতে তুমি কী বোঝ, প্রদোষ?'

প্রদোষ হাসির গলায় বলে, 'দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুইখানি হাত, দুইখানি পা ও একটি ধড়বিশিষ্ট একটি জীব। আবার কি?'

'শুধু জীব! ওঃ'—প্রান্তিক যেন ঘৃণায় চুপ করে যায়।

প্রদোষ এ ঘৃণায় বিচলিত হয় না।—প্রদোষ হেসে হেসে বলে, 'তবে? আমি তো তোমাদের মতো সাহিত্যিক নই, আর নিজেকে সনাতন ভারতের মহান ঐতিহ্যের ধারক বাহক বলেও দাবি করি না। অতএব কেন খামোকা জীবকে শিব ভাবতে বসব? কিন্তু আলোচনাটা বড়ো বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে সোম, একটু কফি খাওয়া যাক।'

'কফি!'—প্রান্তিক ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'তোমার চাকরের হাতের কফি খেতে বাসনা নেই আমার প্রদোষ, কফি থাক।'

প্রদোষ হেসে ওঠে, 'তা গৃহিণী যখন অনুপস্থিত তখন চাকরই তো ভরসা। তিনি তো প্রায় সপ্তাহখানেক তাঁর কোন্ এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে বসে আছেন।'

প্রান্তিক একটু চমকায়। প্রান্তিক বলে, 'বান্ধবীর বাড়িতে? কেন, ওঁর বাপের বাড়িতে নয়?'

'না,' প্রদোষ অবহেলাভরে আর একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'বাপের বাড়ি যাননি। বাপ-মায়ের অবাধ্য হওয়া লাভ-ম্যারেজের এই পরিণাম তাঁদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে নাকি ওঁর লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।'

'যাওয়াই তো উচিত।' প্রান্তিক রুক্ষ গলায় বলে, 'তোমার মতোন লাজলজ্জাহীন বেহেড কে হতে পারে?'

'আর এতে মোটেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে না, কেমন? প্রদোষ ব্যঙ্গতিক্ত মুখে বলে, 'কেউ কিচ্ছু টের পাচ্ছে না, তাই না? লজ্জা যদি তাঁর ভিতরে থাকত, এভাবে চলে যেতে পারতেন না।'

প্রান্তিক এই তিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অভিমান আবেগ রাগ দুঃখ এসব কিচ্ছু থাকবে না মানুষের?'

'থাকবে। থাকুক।' প্রদোষের মুখে একটুকরো ধারাল হাসি ঝলসে ওঠে, 'অতএব লোভ মোহ বাসনা কামনা এগুলোও থাকবে। এর সবগুলোই তোমাদের ওই প্রকৃতির গড়া বৃত্তি।'

প্রান্তিক হতাশ গলায় বলে, 'তবে যাও, লোভকে জয়যুক্ত করতে ব্যাঙ্ক লুঠ করোগে। বৃত্তিগুলো আছে বলেই প্রবৃত্তির দাস হব, এটা একটা শিক্ষিত মানুষের কথা নয়, প্রদোষ! বহু যুগ ধরে মানুষ সংযমের অনুশীলন করে করে একটা সভ্যসমাজ গড়ে তুলেছে, যে সমাজের আইন আছে, শৃঙ্খলা আছে, মানবিকতা বোধের সাধনা আছে, সেই বহুদিন-সঞ্চিত সম্পদকে কোনো মূল্য দেবে না তুমি? নিজেকে চেক্ করতে চেষ্টা করবে না?'

'ওরে বাপস্!' প্রদোষ আবার শব্দ করে হেসে ওঠে, অনেকক্ষণ ধরে হাসে! তারপর বলে, 'সত্যিই তোমার উপদেশগুলো প্রায় বাবা মহারাজদের কান-ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে চেক্! হাসালে সোম। কেন সে চেষ্টাটি করব বলতে পার? যাতে আমার সুখ, যাতে আমরা আহ্লাদ, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাতে যন্ত্রণা, যাতে জ্বালা, সেটা বেছে নিতে যাব? মাপ করো ভাই, তোমাদের হিসেবমতো মানুষ হবার ক্ষমতা যদিও বা থাকতে পারে, বাসনা আমার নেই।'

প্রান্তিক এবার উঠে দাঁড়ায়। প্রান্তিকের আর সহ্য হয় না। বলে, 'তার মানে তুমি সত্যিকার শয়তান! যদি নিজেকে সামলাবার আত্মপ্রকাশ করতে, হয়তো সামান্যতম সহানুভূতিও আসত তোমার উপর। কিন্তু তুমি জোর গলায় ঘোষণা করছ—সে ইচ্ছেই তোমার নেই। ছি ছি!'

এ ছি ছি-কারে প্রদোষের মুখের একটি রেখাও এদিক-ওদিক হয় না। প্রদোষ তেমনি পাথুরে মুখেই বলে, 'করলাম ঘোষণা। কারণ আমি অনেস্ট্।'

হ্যাঁ, শুধু এইটুকুই বলে প্রদোষ। অন্যদিনের মতো বলল না, 'কি হে, চটে-মটে যে চলেই যাচ্ছ। বন্ধুর থেকে বন্ধুপত্নীর প্রতি দরদটাই যে দেখছি প্রবল!'

বলত। অন্যদিন হলে বলত। আজকাল এই ধরনের কথাই বলছিল। বলতে পারত, 'মিসেস ভৌমিকের প্রতি তুমি যে-রকম সহানুভূতিশীল, তাতে আমার অনেকটা নিশ্চিন্ততা আসছে। হৃদয়রসস্পর্শের অভাবে গোলাপ গাছটি শুকিয়ে যাবে না। যে-কোনোখান থেকে একটু হৃদয়রসের স্পর্শ পেলেই কাজ চলে যায় মানুষের। ওটাই মানুষের ধর্ম। দেখতে পাও না কত ব্যক্তি নিজে বিয়ে-থা ঘর-সংসার করে না, অন্যের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে নিজেকে পরগাছার মতো জড়িয়ে রেখে দেয়! ওই থেকেই সুখ আহরণ করে। ওই থেকেই হৃদয়রস পায়। সে সংসারটি কোনো একটি তুতো বৌদির বা তুতো দিদির অথবা কোনো ভাইঝির কি ভাগ্নীর, ভাইপোর কি ভাগ্নের, বা নিঃসর্ম্পকের হতে পারে। সব রকম পরিস্থিতিই ঘটে মানুষের। তা সে এইরকমই কোনো জীবনের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় তারা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষই যে একটা নিয়মের ছাঁচে ঢালাই হবে, তার কোনো মানে নেই। অতএব তুমিও তা না পারতে পার। আর—'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে এটুকুও বলতে পারত প্রদোষ, 'আর বলেইছি তো, এ বাড়ির মহিলাটি এখনও প্রেয়সী হিসেবে চার্মিং।' কিন্তু এসব বলল না প্রদোষ।

তার মানে, আর এসব কথা ভালো লাগছে না ওর। তাই শুধু বলল, সত্যি কথাটা আমি স্পষ্ট করেই বলি, সোম। কারণ আমি অনেস্ট্।

প্রান্তিক ওই সত্যভাষণের গর্বে গর্বিত মুখটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রদোষ কেমন একরকম কৌতুকের দৃষ্টিতে ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরই অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়ায়। এভাবে বোকার মতো এতক্ষণ তর্ক করার কোনো মানেই হল না। সোজাসুজি বলে দিলেই হত, আমি শিশু নই প্রান্তিক যে, তুমি সদুপদেশ দিয়ে আমায় বিপথ থেকে সুপথে আনবে।

হ্যাঁ, অত কথা না-বলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হত। উপদেশ দেওয়ার মুরুব্বিয়ানা ঘুচে যেত সাহিত্যিকের। মুরুব্বিয়ানা করবার সুযোগ অনেকেই পেয়েছেন। এই তো সেদিন নন্দিতার বড়োদিদি এসে অনেক সাধুবাক্য বলে গেলেন। যেন দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে খেলা করতে করতে ঝগড়া করেছে, তিনি মিষ্টি তিরস্কার আর হিত উপদেশ দিয়ে মিটিয়ে দেবেন! রাবিশ্!

প্রদোষের পাজামার পা দুটো লটপটাচ্ছে, প্রদোষের গেঞ্জির স্ট্র্যাপটা কাঁধে ঝুলে পড়েছে, প্রদোষকে এখন খুব ঢিলে-ঢালা দেখাচ্ছে। তবু প্রদোষ সেই ঢিলে-ঢালা হয়েই ঘরের মধ্যে জোরে জোরে পায়চারি করতে থাকে। আর নন্দিতার উপর একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ অনুভব করে।—

এইটি করেছে নন্দিতা। এই অন্যকে মুরুব্বিয়ানার সুযোগ দেওয়া।

আত্মসম্মান! আত্মসম্মানের বড়াই নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন! কি? না, ভালোবাসাহীন স্বামীর ঘরে থাকবেন না আর! আত্মসম্মানের হানি তাতে। রাবিশ্!

আত্মসম্মানের বানানটাও জানে না। জানলে নিজের এই ব্যাঙ্ক-ফেলের খবরটা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াত না।

তুমি মহিয়সী মহিলা, নিজের কেন্দ্রে স্থির ছিলে বাবা, নিজের পদমর্যাদায় অটল। ইচ্ছে করলেই এই দৈন্যের খবরটা ছেপে ফেলতে পারতে তুমি। সংসারের সর্বেসর্বা কর্ত্রী হয়ে, ভৃত্যবর্গের উপর দুর্ধর্ষ মণিবাণী হয়ে, সন্তানের মাতৃরূপে মহিমময়ী হয়ে, এবং একটা তরলমতি স্বামীর সম্পর্কে অগ্রাহ্যবতী হয়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারতে তুমি।

অথবা তোমার অনুগতজনদের প্রশ্রয় দিয়ে বড়িতে ডেকে আড্ডা বসাতে পারতে রোজ, নিজে হাতে কফি বানিয়ে খাইয়ে ধন্য করতে পারতে তাদের, আবার তরুণীর ভূমিকায় 'লাভলি' হয়ে উঠতে পারতে। বয়েসটা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হলেও রূপলাবণ্যে আজও তুমি তেইশ-চব্বিশকে হারাতে পার। অতএব আমার এখন তোমাকে বোরিং লাগলেও, এখনও দু-চারটেকে ঘায়েল করবার ক্ষমতা তুমি রাখো।

হঠাৎ শব্দ করে উচ্চারণ করে প্রদোষ—আর তাতে আমি ঈর্ষান্বিতও হতাম না। বরং মুক্তিই পেতাম। তুমি তাহলে তখন যে বস্তু আমার আর নেই, ফুরিয়ে গেছে, সেটাকে পাবার জন্যে আমার ওপর জুলুম করতে আসতে না।

তারপর বসে পড়ে প্রদোষ। বিড়বিড় করে বলে, কিন্তু তুমি দুটোর একটাও করলে না। তুমি ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে বসে থাকলে। তার মানে, নিজের দৈন্যের ঘরটা খুলে খুলে দেখালে সবাইকে। চাকর-বাকরের কাছে হাস্যাস্পদ হলে, বন্ধুজনের কাছে হাস্যাস্পদ হলে। ছেলের কাছে ছোটো হয়ে গেলে।

এরপর আবার যেদিন তুমি এই চৌকাঠের মধ্যে এসে ঢুকবে, তখন কি সেই তোমার পুরনো পোস্টটা ফিরে পাবে?—পাবে না। তার কারণ ওই অবজ্ঞার দৃষ্টিগুলো সঞ্চয় করেছ তুমি। আর সেটা করেছ সম্পূর্ণ হঠকারিতা করে।

আমি তো বাপু তোমার অন্য কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিনি! তবে? তবে কেন তুমি এমন করে নিজের ক্ষতি করলে? ভেবেছিলে তোমার হতভাগ্য স্বামীটাকে লোকের কাছে হেয় করবে। হেয়টা যে তুমি নিজেই হয়েছ, হবে—তা ভেবে দেখছ না?

তোমার ওই বান্ধবী? যে তোমায় বড়ো সহানুভূতিতে আশ্রয় দিয়েছে? তোমার সেই মিস বান্ধবীটি হয়তো এখন মুখে তোমায় খুব সমর্থন করবে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বলব, কক্‌খনো, সে সত্যিকার সমর্থন করবে না তোমায়। মনে মনে তোমায় আত্মসম্মানহীন বোকাই বলবে।

জানি না, মেয়েদের কথা মেয়েরাই জানে, তবে আমার কথা যদি বলি, বলব এ রকম ক্ষেত্রে আমি তোমার মতো বোকামি করতাম না হে নন্দিতাদেবী! আমি আমার স্ত্রীর ভালোবাসা হারানোর খবর বা স্ত্রীর অন্যের প্রতি আসক্তির খবর ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াতাম না। সমাজের পোজিশনটা রাখতাম। যেমন রেখেছে চারুতোষ।...তার স্ত্রীকে আর স্ত্রীর প্রণয়ীকে সান্ধ্যবিহারের সুযোগ দিতে রোজ বলছে, 'মাথাটা কেমন ধরেছে, আমি আজ আর বেরব না।'।

অথবা কোনো কোনোদিন বাড়িতে বসে আড্ডা দেবার সুযোগ দিতে বলেছে, 'তোমরা বসো, আমি একটু ঘুরে আসি'।

এটুকু বলে কেটে পড়েছে, রাত দশটার আগে ফেরেনি! তারপর হাস্যবদনে এসে বলেছে, 'ইস্, এত দেরি করে ফেললাম!'

তার মানে, চাকর-বাকরদের সামনে সিন্ ক্রিয়েট করে মান খাটো করেনি। স্ত্রীর কাছেও এ খবরটা জানিয়ে খাটো হয়নি যে, তোমাকে হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি গো, আর কিছুই নেই আমার।

বুদ্ধিমান লোক চারুতোষ।

চারুতোষের বুদ্ধির কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ চারুতোষের বৌয়ের সেই সাপের মতো মসৃণ আর সাপের মতো চকচকে দু'খানি হাতের কথা মনে পড়ে যায় প্রদোষের। দু'ইঞ্চি চওড়া কাঁধের ব্লাউজের গহ্বর থেকে নেমে এসেছে যে দু'খানি হাত, কথা বলবার সময় লীলায়িত ভঙ্গিতে আন্দোলিত হবার জন্যে।

প্রদোষের হয়তো এখন আর মনে পড়ে না, কিন্তু প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল ওই হাতের সৌন্দর্যেই। নইলে চারুতোষের বৌ বিপাশা তো রূপে-রঙে নন্দিতার ধারে-কাছেও লাগে না। কিন্তু রূপ তো শুধু রঙে নয়, গড়নে নয়, অদৃশ্য কোনো লোকে তার বাস। আর সে শুধু এক-একজনের চোখে এক-একরকম হয়ে ধরা দেয়। ময়লা-রং বিপাশার ওই একেবারে নিরাভরণ সাপের মতো চকচকে হাত দুটো তো চারুতোষের চোখে কুদৃশ্য। অথচ প্রদোষ যেন ওই হাতের ভঙ্গিমায় আর আন্দোলনের ছন্দে পতঙ্গবৎ এগিয়ে গিয়েছিল।

চারুতোষ ওদের পুরনো বন্ধুদের দলের নয়, চারুতোষের সঙ্গে আলাপ ক্লাবের সূত্রে। সস্ত্রীক গিয়েছিল সেদিন সবাই ক্লাবে, কোন্ একটা বিশেষ উৎসবে। নন্দিতা বাড়ি ফিরে বলেছিল, 'উঃ তোমাদের ওই পালিত সাহেবের বৌটা কী বাচাল বাবাঃ! অতগুলো মেয়ে-পুরুষের মধ্যে যেন উছলে বেড়াচ্ছে। তাও যদি রূপ থাকত!'

প্রদোষ সেদিন অভ্যাসমতো কথা মেনে নেয়নি। প্রদোষ সূক্ষ্ম হাসি হেসে বলেছিল, 'রূপ থাকলে নেচে বেড়ানোর রাইট থাকে?'

'সে-কথা হচ্ছে না', নন্দিতা বলেছিল, 'কুচ্ছিৎরা নেচে বেড়ালে আরও বেশি খারাপ লাগে, তাই বলছি। ওই কালো সিড়িঙ্গে চেহারা, হাত দুটো আবার তেমনি লম্বা, সেই হাত দুখানা স্রেফ খালি করে—'

'স্রেফ খালি কেন? ঘড়ি ছিল তো?'

'ঘড়ি তো এক হাতে, অন্য হাতটা?' তখনও নন্দিতা নিঃসন্দিগ্ধ ছিল, তাই নন্দিতা বলতে পেরেছিল, 'যত কথা, তত হাত নাড়া! বাবাঃ!'

সেদিন প্রদোষ শেষ অবধি মৃদু হেসে বলেছিল, 'তোমরা মেয়েরা একজন আর একজনকে সহ্য করতে পার না।'

আর নন্দিতা মৃদু হেসে বলেছিল, 'আর তোমরা পুরুষরাও বাচাল মেয়েমানুষ দেখলেই আর ধৈর্য ধরতে পার না। অগ্নিতে পতঙ্গবৎ ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাও।' বলেছিল একথা নন্দিতা। নিতান্তই ব্যঙ্গ-কৌতুকে।

স্বপ্নেও ভাবেনি, বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। কি করে ভাববে?

বিপাশাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাববার কথা যে নন্দিতার কল্পনার বাইরে।

যা কল্পনার বাইরে, তা সন্দেহের মধ্যে আসবে কি করে? নন্দিতাকে যদি সেদিন নন্দিতার বিধাতা সতর্ক করেই দিতে আসতেন, নন্দিতা কি সেই পরামর্শ নিত সভয়ে?

নন্দিতা কি হেসে উড়িয়ে দিত না সেই সতর্কবাণী? তাই দিত। নন্দিতার বুক বাঁধা ছিল। তখনও ছিল। নন্দিতা ভাবতে পারেনি ওই সর্পবাহুযুগল নন্দিতার জীবনের মধুচক্রের দিকে প্রসারিত হবে। সাপের মতো ছোবল হেনে তুলে নেবে নন্দিতার জীবনের সুখগুলি, শান্তিগুলি, ছোটো ছোটো ইচ্ছার ফুলের তোড়াটি।

হ্যাঁ, ছোটো ছোটো ইচ্ছে নিয়েই জীবন ছিল নন্দিতার তখন। নন্দিতা তখন ভাবছিল ছেলেটার স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে দার্জিলিং বেড়াতে যাবে। দু'বার যাওয়া হয়েছে? তাতে কি? ভালো জায়গায় শতবার যাওয়া যায়।

নন্দিতার এ-যুক্তি খণ্ডন করে দিয়েছিল প্রদোষ, বলেছিল, 'আমার বোরিং লাগে।'

'বাঃ, টুবলু কি ভালো করে দেখেছে? একবার যখন যাওয়া হয়েছিল, ও তো জন্মায়নি, আর একবার নেহাত বাচ্চা মাত্র, মনেই নেই কিছু। টুবলুই দার্জিলিং-দার্জিলিং করছিল—'

প্রদোষ সেদিন আদর্শ পিতার চাইতে খারাপ কিছু ব্যবহার করেনি। প্রদোষ হেসে বলেছিল, 'তবে তাই! তোমার টুবলু যখন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন! এর ওপর আর কথা কি?'

নন্দিতা কালো দু'চোখে আলোর ঝিলিক হেনে বলেছিল, 'আহা, আমি বুঝি ছেলের সব ইচ্ছেকেই প্রশ্রয় দিই?'

'দাও কি না-দাও তুমিই জানো।' প্রদোষ বলেছিল, 'তোমাদের মাতা-পুত্রের ব্যাপার তুমিই জানো।'

'আহা রে! আমাদের মাতা-পুত্রের ব্যাপারে তোমার কোনো ভূমিকা নেই, কেমন?' নন্দিতা ঝলসায়, ঝঙ্কার দেয়, নন্দিতার মস্তবড়ো খোঁপাটা ঘাড়ে ভেঙে পড়ে, আর সেই মুহূর্তে রোজ ওই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত প্রদোষের হঠাৎ মনে হয়, একগাদা চুল কী বিশ্রী! মেয়েদের গ্রীবার যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে, এটা আমাদের মেয়েরা জানেই না। তারপর মনে হয়েছিল, কেউ কেউ জানে অবশ্য। তাই চুলগুলো ছেঁটে খাটো করে নেয়।

প্রদোষ সেই দৈবাৎ-দেখা এক-আধটা গ্রীবার সৌন্দর্যের কথা ভাবতে ভাবতে বলেছিল, 'আমার ভূমিকা? কই, খুঁজে তো পাচ্ছি না! এইটুকু শুধু জানি, তোমরা যেখানে যেতে ইচ্ছুক হবে, অমোঘ আইনের বলে আমাকেও সেখানেই যেতে হবে। কারণ ভোটে তোমাদের জয়ই অনিবার্য।'

তখনও সেই কথা বলেছিল প্রদোষ। হয়তো তখনও প্রদোষের সেই বিশ্বাসই ছিল।

কিন্তু—হঠাৎ যাত্রার ক'দিন আগে যখন প্লেনের টিকিট 'সংগ্রহ' হয়ে গেছে, তখন প্রদোষ বলে বসল, 'এই নন্দিতা, এক কাজ করো, তোমার ছোড়দাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'ছোড়দাকে? আমাদের সঙ্গে?' নন্দিতা বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'তার মানে?'

'মানে অতি প্রাঞ্জল, আমি আর ওই তোমার দার্জিলিংয়ে যাচ্ছি না, যাচ্ছি রানিক্ষেত। আমার টিকিটটা তো রয়েইছে, তাছাড়া তোমাদেরও একটা গার্জেন হবে, তাই বলছি ছোড়দাকে—।' অভ্যাসের অতিরিক্ত দ্রুত কথা বলেছিল সেদিন প্রদোষ।

কিন্তু নন্দিতা? নন্দিতা অভ্যাস-বহির্ভূত থেমে থেমে কথা বলেছিল, 'কিন্তু হঠাৎ তোমারই বা রানিক্ষেতে যাবার দরকার কি হল, আর আমাদেরই বা অভিভাবক বদলের প্রয়োজন হচ্ছে কেন?'

'বাঃ, আমি তো গোড়া থেকেই বলছি দার্জিলিংয়ে যাবার আমার কোনো আকর্ষণ নেই।'

নন্দিতা তখনও নিশ্চিন্ত, তাই নন্দিতা স্বামীর গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে বলেছিল, 'তা অন্য আকর্ষণ তো আছে? না কি নেই?'

প্রদোষের হঠাৎ মনে হয়েছিল, নন্দিতা কি ভারী! মনে হয়েছিল, নন্দিতার গায়ে বড়ো বেশি মাংস। তবু প্রদোষ তার মুখের ওপর বলেনি সে কথা। কারণ তখনও প্রদোষ অনেস্ট হয়নি। তাই প্রদোষ রহস্যের হাসি হেসে বলেছিল, 'সে আকর্ষণকে তীব্র করতে, মাঝে মাঝে বিরহ ভালো।'

'আর বেশি তীব্র দরকার নেই', নন্দিতা বলেছিল, 'যা করছিলে, করো। যেমন যাওয়া হচ্ছিল হোক। রানিক্ষেত যাব! অতয় কাজ কি? যখন যাব, সবাই যাব।'

বলেছিল। কিন্তু হয়নি।

প্রদোষ তার নবলব্ধ বন্ধু চারুতোষ পালিতের পরিবারের সঙ্গে রানিক্ষেত চলে গিয়েছিল।

নন্দিতাকেও অতএব ছোড়দাকে সঙ্গে নিতে হয়েছিল। এবং প্রদোষের সঙ্গে যথেষ্ট কথা-কাটাকাটি আর মান-অভিমানের পালা চললেও অন্যত্র বলেছিল, 'অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছেন আর জানোই তো পুরুষের একদিকে সমগ্র পৃথিবী আর একদিকে অফিস। তা পাল্লাটা ঝুঁকি হয় ওই শেষটাতেই।'

এই বলে মান বাঁচিয়েছিল নন্দিতা সেদিন।

অথচ প্রদোষ এখন নন্দিতাকে ঘৃণা করছে। প্রদোষ ভাবছে, নির্বোধ নন্দিতা তার ব্যাঙ্ক-ফেলের খবরটা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু একদিনে কি বলে বেড়িয়েছিল নন্দিতা? একদিনেই কি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল?

যখন প্রদোষ রানিক্ষেত থেকে ফিরে এসেছিল, আর বোঝা গিয়েছিল প্রদোষ তার আত্মাকে বিক্রি করে এসেছে, তখন কি বহু ছলনার মলাট দিয়ে দিয়ে নিজের জীবনের এই ব্যাঙ্ক-ফেলের কাহিনি ঢাকেনি নন্দিতা? ক্রমশ নন্দিতা ধৈর্য হারিয়েছে, প্রতিক্রিয়ায় প্রখর হয়েছে।

কিন্তু তার আগে? নন্দিতা তার স্বামীর বিকিয়ে-যাওয়া আত্মাকে ফিরে কিনে নেবার জন্যে অনেক মূল্য ধার্য করেছে, অনেক দর দিয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। নন্দিতা যত চেষ্টা করেছে, যত মান-অভিমান করেছে, প্রদোষের ততই নন্দিতাকে 'বোরিং' লাগতে শুরু করেছে, সাংসারকে বিরক্তিকর মনে হয়েছে, তার সন্তানকে অবান্তর লেগেছে।

প্রদোষের যে একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে আছে, এটা প্রকাশ করতে যেন এখন লজ্জাবোধ করে প্রদোষ। আর ওই ছেলেটার জন্যে নন্দিতাকে দায়ী করে। বিয়ের দু-বছরের মধ্যেই বাচ্চা-কাচ্চা আসুক এটা পছন্দ ছিল না প্রদোষের, কিন্তু 'চির যশোদা' নন্দিতা তুমুল ঝড় তুলে প্রদোষের এ মতবাদকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিল।

কিন্তু বিধাতা বাদী। নন্দিতার পক্ষে বাদী। ওই একটি সন্তানের সঙ্গে সঙ্গেই নন্দিতার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। বড়ো একটা অপারেশনের শেষে জবাব দিয়েছে ডাক্তার। তাই টুবলু নন্দিতার প্রাণ মন ইষ্ট।

কিন্তু প্রদোষেরও তো তাই হওয়া উচিত ছিল? হিসেবমতো তাই ছিল বৈকি। কিন্তু প্রদোষের মতে মানুষ ছাঁচের পুতুল নয়, মানুষ অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা নয়, মানুষ হচ্ছে জলজ্যান্ত প্রাণী। যার মধ্যে অজস্র ভঙ্গি, অজস্র রূপ, অজস্র রং। তাই মানুষের মন কেবল 'উচিতে'র খাতে বইতে পারে না। অতএব প্রদোষ ছেলেকে বলে তার 'মায়ের বিজনেস'।

ছেলের সম্পর্কে কোনো চিন্তা মাথায় নেয় না প্রদোষ। আর এতবড়ো একটা ছেলে আছে তার,

এটা ভেবে যেন অস্বস্তি পায়। কিন্তু তার জন্যে তো কোথাও কোনো অভিযোগ ছিল না। কাজেই সুখেরও বিঘ্ন ছিল না। পরিচিত মহলে সকলেই তো জানত ওরা একটি সুখী দম্পত্তি। ওদের ভালোবাসাটা তুলনাস্থল ছিল। কারণ ওদের ভালোবাসার গোড়ার ইতিহাসটা যে বেশ সমারোহময় ছিল।

আর এখন?

এখন প্রদোষ অনুপস্থিত নন্দিতার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুচ্চারিত উচ্চারণে বলে চলেছে, হ্যাঁ, স্বীকার করেছি হে মহিয়সী মহিলা, একদা আমি তোমার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। তোমার জন্যে লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়েছি, দিনের পর দিন কলেজ কামাই করেছি, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করেছি, নিজের বাড়িতে লড়েছি, তোমাদের বাড়িতে লড়েছি।...

তারপর তোমাকে জিনে এনে বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি। অনেকদিন ধরে বেড়িয়েছি। কিন্তু যদি আজ আমার তোমাতে ক্লান্তি আসে, সেই আদি প্রেমিক শিবঠাকুরের মতো সতীর মৃতদেহের ভার কাঁধে করে বেড়াব?

কেন?

কেন তা চাইবে তুমি?

তুমি থাক তোমার মনে, আমি থাকি আমার মনে। চুকে গেল। যা ছিল, কিন্তু আজ আর নেই, সে জীবন আর চেও না তুমি।

কিন্তু আর তো নন্দিতা তা চাইছে না। চেয়েছিল। প্রথমে চেয়েছিল, এখন নন্দিতা বিচ্ছেদ চাইছে। নন্দিতা ওই অপমানকর দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাইছে না।

অথচ প্রদোষ তা চাইছে না। প্রদোষ ওই সব গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে নারাজ। প্রদোষ জানে, চারুতোষের স্ত্রীর সঙ্গে তার এই লীলাসঙ্গিনীর সম্পর্কটাই শেষ কথা। কোনো কবি-কল্পনা, কোনো রোমাঞ্চময় স্বপ্নের মধ্যেও সে সম্পর্ক জীবন-সঙ্গিনীতে পর্যবসিত হবার প্রশ্ন নেই। আর তা চায়ও না প্রদোষ।

এই দায়হীন ভারহীন শুধু ভালোলাগার জীবনে যে মাধুর্য, সেটাই তো কাম্য। প্রেমের উপর যেই দায় চাপে, ভার চাপে, সে ক্লিষ্ট হয়ে যায়। এখন কি বিশ্বাস হয়, একদা প্রদোষ নন্দিতার জন্যে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করেছে? অথচ করেছে তা। আর তখন প্রদোষের নন্দিতাকে অসহ্য লাগছে।

কিন্তু নন্দিতাও তো সে একই দোষে দোষী। নন্দিতার বান্ধবী তো কম চেষ্টা করছে না ওকে সেদিনের কথা মনে পড়াতে! শিখা তো সেই তাদের মধুর রোমাঞ্চময় উন্মাদ-আবেগময় দিনগুলির সাক্ষী। শিখার জীবনে কখনও প্রেমের পদপাত ঘটেছে কিনা, শিখার অন্তরঙ্গ বান্ধবী নন্দিতাও জানে না। অতএব ধরে নিতে হবে ঘটেনি।

কিন্তু শিখা ওদের সেই 'ঘটনা'র দিনগুলি নিখুঁত মনে রেখেছে। তাই শিখা ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, 'প্রদোষের সেই বেলা চারটে থেকে পার্কের বেঞ্চে বসে রোদে পোড়ার কথা তোর মনে আছে নন্দিতা?...ওর সেই আমাদের কলেজের পথে ফুটপাতে পায়চারি করার কথা?...আচ্ছা, আর সেই একদিন তোকে নিয়ে সরে পড়ে স্টিমারে বেড়িয়ে আনা? শেষ অবধি আমাকে তোদের বাড়ি গিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হল, তুই রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই ছিলি!...প্রদোষের সেদিন কী কৃতজ্ঞতা! আর—'

নন্দিতাও এখন প্রদোষের মতোই অনমনীয়। তাই নন্দিতা বিরক্ত গলায় বলে, 'থাম্ থাম্, তোকে আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে আসতে হবে না। এখন বুঝছি ওসব স্রেফ্ জোচ্চুরি।'

শিখা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'আজ হয়তো তাই দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু তখন সেটা জোচ্চুরি ছিল না নন্দিতা!'

'আমি বিশ্বাস করি না। যদি খাঁটি হত তাহলে আজ এভাবে—'

'মানুষ মাত্রেরই মতিভ্রম হতে পারে নন্দিতা, এখন ওকে পেত্নীতে পেয়েছে, তাই ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ভুল ওর ভাঙবে। আমি বলছি, দেখিস তুই—'

নন্দিতা তার সুন্দর মুখটা বিকৃত করে বলে, 'ওঃ, তাহলে বলতে চাস্ তোর এই ভবিষ্যৎ বাণী ফলবার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনব বসে বসে? কবে তাঁর ভ্রষ্টবুদ্ধি ফিরে আসবে, কবে তিনি আবার এই দাসীর দরজায় এসে দাঁড়াবেন! গলায় দড়ি আমার! আমি তোর ওই যীশুখ্রিস্টের প্রেমের বাণী শুনতে চাই না বাবা, সাদা বাংলা হচ্ছে—ওকে আমি কোর্টে দাঁড় করাব।'

হ্যাঁ, এই সংকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছে নন্দিতা, এই মন্ত্র জপ করছে—ওকে আমি কোর্টে দাঁড় করাব। ওর সব কেলেঙ্কারী ফাঁস করে দেব। ষোলো বছর ধরে যে ফাঁকির মধ্যে বসে নির্বোধের মতো ঠকে এসেছি তার শোধ তুলব।

শিখা আবার বলে কিনা তখন সেটা ফাঁকি ছিল না। তার মানে খাঁটি-সোনার কণ্ঠহারটা আমার হঠাৎ একদিন পেতল হয়ে গেল! শিখা বলতে পারে, শিখা পুরুষজাতটার স্বরূপ জানে না। তাই উপদেশ দিতে পারে—ব্যাপারটাকে এতবড়ো করেই বা দেখছিস কেন?

এ যুক্তি প্রদোষও দিয়েছিল সেদিন, যেদিন চলে এসেছিল নন্দিতা। নন্দিতাকেও নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিল প্রদোষ। বলেছিল, 'ব্যাপারটাকে এতবড়ো করেই বা দেখছ কেন তা-ও তো বুঝছি না!'

'বুঝছ না?'

'সত্যিই বুঝছি না। কোথাও তো কিছু ব্যাহত হচ্ছে না তোমার! তোমার সংসারে তুমি যেমন ছিলে তেমনিই আছ, আমিও কিছু বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি না। বাইরে রাত্রিবাসও করছি না। শুধু তোমার সঙ্গে কপটতা না করে অকপটে স্বীকার করছি, তোমাতে আমি একনিষ্ঠ থাকতে পারছি না। শুধু এই—'

'শুধু এই! তা বটে।'

নন্দিতা অনেক ঢেউ খেয়ে তবে অকূলে নৌকো ভাসাতে নেমেছিল, তাই নন্দিতা আর রুদ্ধকণ্ঠ হল না। স্থির গলায় বলল, 'আমার সংসার, এই ফাঁকিটাকে আর হজম করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ভেবে দেখ—'

প্রদোষ ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে পায়চারি করতে করতে বলেছিল, 'এই ফাঁকিটাকে নিয়ে হই চই করে বেড়ালে—মান-সম্ভ্রম কমবে বৈ বাড়বে না।'

'তোমার ওই মেকি মান-সম্ভ্রমের দাম আমার কাছে কানা-কড়িও নয়।'

'তবে ব্যাপারটা হবে এই', প্রদোষ বলেছিল, 'তোমার আজকের এই 'ফাঁকি'র খবরটা এমন চাউর করে বেড়ালে, তোমার বিগত ষোলো বছরের জলজ্যান্ত জীবনটাও স্রেফ্ ফাঁকির খাতায় জমা হবে। লোকে ভাববে—'

'জলজ্যান্ত জীবন?' ঘৃণায় মুখটা বাঁকিয়েছিল নন্দিতা, 'আগাগোড়াই ধাপ্পাবাজি ছিল তোমার, এখন বুঝছি! লোকে যদি সেটা বুঝতে পারে বুঝবে।'

তখন প্রদোষ একটু যেন বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, 'আগাগোড়াই ধাপ্পাবাজি ছিল এতটা না-ভাবলেও পারতে নন্দিতা! যখন ছিল, সেটা খাঁটিই ছিল।'

নন্দিতা অপমানের জ্বালায় জ্বলছিল।

নন্দিতা তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে, চিরকালের মতো চলে যাবার জন্যে, ছোট্ট একটা সুটকেসে দু-একটা জামাকাপড় ভরে নিচ্ছিল, রাগে হাত-পা কাঁপছিল তার, তাই মুখবিকৃত করেছিল। বলেছিল, 'চুপ করো, চুপ করো। একটি কথা বলতে এসো না। খাঁটি ছিল! নির্লজ্জ মিথ্যেবাদী!'

প্রদোষ হেসে উঠেছিল। হেসে বলেছিল, 'নির্লজ্জ একশো বার, কিন্তু মিথ্যেবাদী নয়। আজ হয়তো সে প্রেমের কিছু অবশিষ্ট নেই, কিন্তু এক সময় ছিল। আর তার মধ্যে ভেজাল ছিল না।'

কিন্তু কে বিশ্বাস করবে ভেজাল ছিল না? কে বিশ্বাস করবে যখন ভালোবেসেছে প্রদোষ নন্দিতাকে, প্রাণ দিয়েই বেসেছে। না, বিশ্বাস করা যায় না। কারণ এখন প্রদোষ পরকীয় রসে ডুবে পড়ে আছে। এখন চারুতোষ পালিতের স্ত্রীর সাপের মতো চকচকে দু'খানা হাত অহরহ আকর্ষণ করছে প্রদোষকে।

প্রদোষ তবু চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে নন্দিতা, ওটা বাদ দিয়ে আর কিছু হয় না? মানে, আর কোনো নতুন একটা শাস্তি ঠিক কর না!—আর এটা তো ঠিক আমায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তোমার গৃহপালিত পোষ্যদের। তোমার এই 'গৃহিণীশাসিত সংসারে' ভৃত্যদের এমন অবস্থা যে, নির্দেশ ব্যতীত কোনো কাজই করতে পারে না তারা। তোমার ওই অঞ্চলের নিধি পুত্রকে এমন খোকা করে রেখেছ যে, মা ছাড়া তার বিশ্বভুবন অন্ধকার—'

এইভাবে ম্যানেজ করতে চেষ্টা করেছিল প্রদোষ। যেন নন্দিতার এই চলে যাওয়াটা একটা হাস্যকর ছেলেমানুষী! যেন নন্দিতা চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছে।

কিন্তু নন্দিতা তখন মরিয়া। তাই নন্দিতা বলেছিল, 'ধরে নিতে হবে ওর মা মরে গেছে। হঠাৎ একটা মৃত্যু, সংসারে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।'

'মৃত্যু! কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে একটা সান্ত্বনা থাকে। নিরুপায়তার সান্ত্বনা। যেহেতু সেটা অমোঘ, অনিবার্য।'

'এটাকেও তাই বলে ভাবা হোক।'

'কিন্তু আমি বলছিলাম, মাত্র আমাকে, মানে মাত্র আমার হৃদয়টুকুকে বাদ দিচ্ছি বৈ তো নয়। সেই তুচ্ছ একটা হাইফেনের অভাবে এ সংসারের কী এমন ছন্দপতন হবে? বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি না আমি, আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইছি না—'

'থামো, চুপ কর। নির্লজ্জ, বেহায়া, অসভ্য!' নন্দিতা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে আরও জোরে জোরে হাতের কাজ সেরে নিয়েছিল।

আর সেই সময় আরও একবার মনে হয়েছিল প্রদোষের, নন্দিতার গায়ে কত বেশি মাংস!

আরও কিছু কথা-কাটাকাটির পর নন্দিতা বেরিয়ে গিয়েছিল।—গিয়েছিল, তবু প্রদোষ ভাবেনি সেই যাওয়াটা সত্যি চিরতরে যাওয়া হবে। ভেবেছিল সংসার-অন্ত-প্রাণ নন্দিতা ক'দিন ওর এই সাধের সংসার ছেড়ে থাকতে পারবে? বাপের বাড়ি বসে বসে ভাববে চাকররা ওর তোলা দামি চায়ের সেটগুলো বার করে ব্যবহার করে ভাঙছে কিনা, ওর ভাঁড়ারঘরের আধিপত্য পেয়ে একমাসের রসদ তিন দিনে শেষ করছে কিনা, ওর বাসন-কোসন, চাদর-পর্দা চুরি করে লোপাট করছে কিনা, আর ওর সাধের পুত্তুরটিকে সম্যক যত্ন করে খেতে দিচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে প্রধান।

স্বামীর কথা হয়তো ভাববে না রাগে অন্ধ হয়ে, কিন্তু টুবলুর কথা না-ভেবে পারবে না। এইসব ভেবে স্বস্তিতেই ছিল প্রদোষ, ছিল নিশ্চিন্তে। কিন্তু ক'দিন পরে জানল বাপের বাড়িতে যায়নি নন্দিতা।

সেরেছে! তবে কোথায়? রাগের চরম নিদর্শন দেখাতে কোনো মফঃস্বলে স্কুলে মাস্টারি করতে যায়নি তো? গল্পে-উপন্যাসে যা দেখা যায়। খোঁজ করতে লাগল। কারণ সংসারটা ছন্নছাড়া করতে চায়নি প্রদোষ। সমস্ত ছন্দ অব্যাহত রেখে ও শুধু জীবনে একটু নতুন রসের আমদানি করতে চেয়েছে।

আশ্চর্য, সেটা কি এতই বেশি চাওয়া? আচ্ছা, নন্দিতাই বা এই ষোলো বছরের পুরনো জীবনটাতে ক্লান্ত হচ্ছে না কেন? এ জীবন রসহীন লাগছে না কেমন ওর?

ওই অভ্যাসের সংসারে বাঁধা নন্দিতাকে করুণা করেছিল সেদিন প্রদোষ, তার বেশি নয়। কিন্তু এখন রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে তার। কারণ এখন শুনছে নন্দিতা ডিভোর্স চাইচে। বান্ধবীর বাড়িতে খুঁটি গেড়ে তার তোড়জোড় করছে। আর করছে হয়তো প্রদোষেরই টাকায়। সর্বস্ব তো নন্দিতার অধিকারেই ছিল। সেই অধিকারের সুখটা কিছুই নয়?

প্রদোষকে সে কোর্টে দাঁড় করিয়ে ছাড়বে, আর সেই সঙ্গে প্রকাশ করে দেবে চারুতোষ পালিতের স্ত্রীর সঙ্গে প্রদোষের কেলেঙ্কারীর কাহিনি। ইঁটের মতো কঠিন মুখে হঠাৎ একা ঘরেই অদৃশ্য নন্দিতার সামনে বুড়ো আঙুল দেখাল প্রদোষ। কিছু প্রমাণ করতে পারবে না হে, মহিলা! চারুতোষ নিজে সাক্ষী দেবে তার স্ত্রীর মতো পতিব্রতা সতী স্ত্রী দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

তাছাড়া—কবে তুমি আমাদের দুজনকে একত্রে দেখেছ? না, তেমনভাবে কিছুই দেখনি। কারণ তুমি আগে টেরই পাওনি কে তোমার স্বামীর হৃদয় হরণ করেছে। হারানোর অনুভবটাতেই উন্মাদ হচ্ছিলে তুমি।

আমি, এই আমি, তোমার সত্যবাদী স্বামী নিজে মুখে যদি না-বলতাম, অন্ধকারেই থাকতে তুমি। এখন তুমি সেই সুযোগটি নিচ্ছ।

ঠিক আছে, দেখি তুমি কী করতে পার!

যদি তুমি নিজে এই ঘর-ছাড়ার কেলেঙ্কারীটা না করতে, হয়তো আমি তোমার প্রতি সামান্যতম মমতাটুকু অন্তত রাখতাম। কিন্তু আর এখন ওই মমতার প্রশ্নটুকুও থাকবে না।

যেন আক্রোশের মনোভাব নিয়েই বেরিয়ে পড়ল প্রদোষ চারুতোষ পালিতের বাড়ির লক্ষ্যে। খেয়াল করল না, আর একটা জায়গায় হয়তো একটু মমতার প্রশ্ন রাখা উচিত ছিল।

বাবার বেরিয়ে যাওয়া তাকিয়ে দেখল টুবলু তার দোতলার পড়ার ঘর থেকে। গাড়ির গর্জন শুনতে পেল, ধপাস করে দরজা বন্ধ করার শব্দটাও শুনতে পেল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বসে রইল টুবলু হাতের বইটা টেবিলে ফেলে রেখে। টুবলু জানে বাবা কোথায় যাচ্ছে। শুধু আজ বলেই নয়। অনেকদিনই ধরেই জানে। কারণ অনেকদিন থেকেই তো বাবার অনিয়মিত গতিবিধি নিয়ে মায়ের অনুযোগ-অভিযোগ শুনছে। শুনছে তর্ক-ঝগড়া, আর কথা-কাটাকাটি।

এক একদিন রাত্রে উদ্দাম হয়ে উঠত মায়ের কণ্ঠ, আর মনে হত—মা বুঝি ফেটে পড়বে।

মনে হত, মা বুঝি এই দণ্ডে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তা সেই বেরিয়েই গেল মা। রাত্রে না হলেও গেল। দিনে-দুপুরেই গেল। টুবলুকে একবার বলেও গেল না।

প্রথম ক'দিন কথাটা মনে করলেই টুবলুর চোখ দুটো জ্বালা করে উঠত, এখন আর করে না। এখন শুধু একটা দাহ! চোখে, মনে, সর্বাঙ্গে। একটা বেলা নাকি মা টুবলুকে চোখের আড়াল করতে পারত না। স্কুল থেকে এন.সি.সি-র ক্যাম্পে যাবার কথা হয়েছে, মা নানা ছল-ছুতোর টুবলুর (বহির্জগতে যার নাম কৌশিক) যাওয়া বন্ধ করেছে। টুবলু রাগ করলে মা কত তোয়াজ করে করে ভুলিয়েছে, কত প্রলোভন দেখিয়ে বশে এনেছে।

আর অন্য যে-কোথাও যেতে চাইলে? মা বলত, আহা-রে বাহাদুর সর্দার, তোমায় আমি একলা ছাড়ব? যা বেহুঁশ ছেলে তুমি। বলে নিজের হাত-পায়েরই ঠিক নেই তোমার! কেউ ডেকে না-খাওয়ালে তো তিনবেলা না খেয়ে পড়ে থাকবি।

তা কোথায় গেল তোমরা সেই মাতৃ-স্নেহের গৌরব?

টুবলু—না, টুবলু না বলে যাকে এখন কৌশিক বললেই বেশি মানাবে, সে মনে মনে তীব্র প্রশ্ন করে, কোথায় গেল? মনে হত অন্ধস্নেহে বিগলিত তুমি, কোথায় সেই স্নেহ-সমুদ্র?

তার মানে ছিলই না কোনোদিন সে জিনিস। তার মানে সবটাই তোমার 'শো' ছিল। ভাবতে গেলেই যেন মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, সমস্ত অতীতটা তালগোল পাকিয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। টুবলুর সেই মা, টুবলুর বিগত সমস্ত জীবনটা ভরে আছে যার অস্তিত্বে, সেই মা টুবলুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত না বলে চলে গেল টুবলুর মুখে কালির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে।

টুবলু কি আর বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারছে? রাস্তায় বেরোতে পারছে? জানলায় বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়ায় না টুবলু। ওর মনে হয় যেন বিশ্বসুদ্ধ লোক শুধু টুবলুর দিকেই তাকাচ্ছে। তাকাচ্ছে, আর ভাবছে এর মা এর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আর এখন—বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা তুলতে যাচ্ছে!

টুবলু আর ভাবতে পারে না।

টুবলুর সমস্ত শরীরটা ঘেমে যায়। তবে টুবলু একটা আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ও নিজে কোনো বন্ধুর বাড়িতে না গেলেও বন্ধুরা পাছে ওর বাড়িতে আসে এই ভয়ে কোনো পরিচিত গলাই বিশেষ একটি জানলার নীচে থেকে ডেকে উঠল না 'কৌশিক! কৌশিক!'

না, এই ক'দিনের মধ্যে একদিনও না!

তার মানে কৌশিকের বন্ধুরা কৌশিককে ঘৃণা করছে। অথবা কৌশিকের এই পরিস্থিতিকে ভয় করছে। বড়োলোক বাবার একমাত্র ছেলে কৌশিক, স্নেহ-বিগলিত মায়ের একমাত্র সন্তান, কাজেই কৌশিক ছিল বন্ধু-মহলে যেন মধ্যমণি। সেই কৌশিক এখন ঘৃণ্য, হাস্যাস্পদ।

যাক্, তবু এও ভালো। ঘৃণা করে ত্যাগ করেছে তারা কৌশিককে। যদি তারা নিষ্ঠুর কৌতুকে কৌশিককে বিঁধতে আসত তাহলে কৌশিককে হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হত। কৌশিকের মা যেমন গেছে। নির্মম নির্লিপ্ত চিত্ত নিয়ে। মনে হত এ বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই মায়ের অপত্য স্নেহ। এই বাড়িটার শোভা সৌন্দর্য আর পরিচ্ছন্নতা রাখবার জন্যে মা প্রাণপাত করতে পারে।

সেই প্রাণতুল্য বস্তুগুলোকে মা পথের ধুলোর মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারল? হঠাৎ যেন বিশ্বাসই হয় না কৌশিকের, মা তার এই প্রিয় জিনিস-পত্তরগুলি, যা সে বাঘিনীর মতো আগলাত, সে-সব আর কোনোদিন হাত দিয়ে ছোঁবে না। বিশ্বাস হয় না, মায়ের ওই তিন আলমারি শাড়ি ব্লাউজ, আরও কত কি যেন, মা কোনোদিন আর পরবে না।

কৌশিক সেই অবিশ্বাস্য কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হওয়ার মতো ভয়ঙ্কর দুঃখের সময়ে ভাবতে চেষ্টা করে, কত লোকের তো মা মারা যায়, কৌশিকেরও তাই—কিন্তু মারা যাওয়ার মধ্যে তো শুধু ভয়ঙ্কর ওই কষ্টটাই থাকে, এমন লজ্জা থাকে কি?

আশ্চর্য! কৌশিক লজ্জায় মরে যাচ্ছে। অথচ কৌশিকের মা-বাবার মধ্যে লজ্জার লেশ নেই। না নেই।

সেদিনের সেই রাত্রেই জেনে ফেলেছিল কৌশিক। হ্যাঁ, যেদিন মা চলে গেল তার আগের রাত্রে।

গভীর রাত্রে, কৌশিক তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভেঙে গেল একটা তীব্র চেঁচামেচির শব্দে। হতচকিত কৌশিক বিছানায় উঠে বসল। অনুমান করতে চেষ্টা করল এ গলা কার! তারপর ভয়ঙ্কর এক ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেল কৌশিক। এ গলা কৌশিকের মায়ের গলা? মা এইরকম সব অকথ্য কথা বলছে?

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে, চাকর-বাকর কান ফাটিয়ে মা বাবাকে বলছে, 'ছোটোলোক, ইতর নীচ নোংরা, রাস্তার কুকুর।'

মায়ের সেই কোমল সুন্দর মুখটা থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে এই সব গালিগালাজ? এই সব! আরও কত সব!

কৌশিক যে-সব কথার মানে জানে না, শুধু ছায়া-ছায়া একটা আতঙ্কের মতো যা চেতনার মধ্যে সবেমাত্র সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে, কৌশিকের মা সেই সব বলছে? জানা জগৎটায় এমন ভয়ানক অনিয়মের ঘটনা এর আগে ঘটতে দেখেনি। কৌশিক তাই ভয় পেল। তারপর কৌশিক একটা কাচের গ্লাস ভাঙার শব্দ পেল। কৌশিক একটা সিদ্ধান্তে এল।—বাবা তাহলে মদ খাচ্ছিল।

মা তাই—

কিন্তু তাই কি? আরও যে কী সব ভাঙছে মা আছড়ে আছড়ে। কী ও-সব? ফুলদানি? পুতুল? পাথরের সেই অ্যাশট্রেটা? হ্যাঁ, মা ভাঙছে। ওই আছড়ে ভাঙার শব্দগুলোর ওপর মায়ের গলার শব্দটাও যে আছড়ে আছেড়ে পড়ছে। 'ভাঙব, ভাঙব। তছনছ করে দেব তোমার মান-সম্ভ্রম, তোমার মুখোশ! তোমার জীবন ধ্বংস করে ছাড়ব!'

বাবার গলাও কিছু বলছে, কিন্তু সে ভাষা উদ্ধার করতে পারছে না কৌশিক। সে গলা অনুত্তেজিত। কৌশিক ভাবল তবে কি মা নয়? আর কেউ? কিন্তু আর কে? তাছাড়া—

কিছুদিন ধরেই তো বাড়িতে চলছে ঝগড়া অশান্তি। বাবা যে হঠাৎ খারাপ কিছু করছে, এবং মা তার প্রতিবাদ করছে, এটা টের পাচ্ছে কৌশিক। কিন্তু কি সেই খারাপটা ধরতে পারছে না। শুধু দেখছে বাবার রাত্রের খাওয়াটা অনিয়মিত হচ্ছে, রাত্রের ফেরাটা অনিয়মিত হচ্ছে।

কৌশিক ভাবত তাসের আড্ডায় দেরি করে বাবা। তারপর কৌশিক ভাবতে শুরু করল, মদ। নিশ্চয় মদ। কিন্তু আজ তো শুধু সেইখানেই থেমে থাকতে পারছে না কৌশিক। কৌশিকের কানের পর্দা ফুটো করে এক-একটা জ্বলন্ত শব্দ ঢুকে পড়েছে যে!—

'মিথ্যেবাদী, শয়তান! চরিত্রহীন, ময়লার মাছি, নর্দমার পোকা!' মা, মা জানত এ-সব কথা? মায়ের স্টকে ছিল এইসব শব্দ? যে মা, কৌশিক একদিন বাড়ির চাকরকে 'পাজী' বলেছিল বলে, ছেলের অধঃপতনে মরমে মরে গিয়েছিল।

কৌশিক তারপর বাবার উত্তেজিত গলাও শুনতে পেল, 'তুমি থামবে কি না?'

কৌশিকের মা বলল, 'না, থামব না।'

'তবে চেঁচাও'—কৌশিকের বাবা বলল। 'তবে এটা বোধহয় তোমায় শেখাতে হবে না, ধমকে ভালোবাসা আদায় করা যায় না। আর দুটো প্রাণকে একটা দড়ি দিয়ে একটা খোঁটায় বেঁধে রাখলেই তারা একাত্ম হয়ে যায় না।'

'তা যায় না। একাত্ম হয় শুধু—' আরও একটা কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দ পেল কৌশিক। আর হঠাৎ কৌশিক ভয় থেকে মুক্ত হল। মাঝখানের দরজাটা খুলে ফেলল।

দুটো ঘরের মাঝখানে যে বন্ধ দরজাটা ছিল।

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ রুক্ষ গলায় বলে উঠল কৌশিক, 'ভেবেছ কি তোমরা? বাড়িতে কাউকে ঘুমোতে দেবে না?'

হঠাৎ দুটো উত্তেজিত সাপ যেন মন্ত্রপূত হল। চুপ করে গেল।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যে? বড়োজোর কয়েক সেকেন্ড। ফণিনী আবার ফণা তুলল, 'তুই ছেলেমানুষ, এর মধ্যে কথা কইতে এসেছিস কেন?'

কিন্তু টুবলু কি তখন আর ছেলেমানুষ ছিল? টুবলু হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক ধাক্কায় বড়ো হয়ে ওঠেনি কি? তাই টুবলু কৌশিকের গলায় বলল, 'নিজেরা ছেলেমানুষের বেহদ্দ করছ বলেই বলতে হচ্ছে।'

'তুই থাম্।'

'না, থামব না। তোমাকেই থামতে হবে।' বলল কৌশিক জোর দিয়ে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখের ভঙ্গিটা কেমন যেন বদলে গেল। মা বলল, 'আমায় থামতে হবে? তুইও তাই বলবি? ওঃ! অন্নঋণ? আচ্ছা, ঠিক আছে।'

সে রাত্রে আর গোলমাল হল না। তারপর দিনই চলে গেল মা। আর যাবার সময় টুবলুকে কিছু বলে গেল না।

টুবলুকে আর কেউ কিছু বলছেও না। সে জানে না মা কোথায় আছে। টুবলুর মাথায় কুশ্রী একটা লজ্জার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোথায় বসে বসে ষড়যন্ত্র আঁটছে খুব ঘৃণ্যতম একটা ঘটনা ঘটাবার।

'দাদাবাবু!' চাকরটা এসে দাঁড়াল। বলল, 'এখন কি খেতে দেওয়া হবে আপনাকে?'

'চাকর-বাকরদের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না কৌশিক, তাই 'না' 'হ্যাঁ' ছাড়া বলাও হয় না কিছু। এখন 'হ্যাঁ' বলে দিলে আর একবার ডাকের সম্মুখীন হতে হবে না, তবু কৌশিক বলে ফেলল, 'না'।

চাকরটা চলে গেল। ওরাও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে বইকি! 'মা' সত্যিই চিরকালের মতো চলে যাবে, এটা অবিশ্বাস্য, অথচ সেই অবিশ্বাস্য কথাটাই ক্রমশ সত্য হয়ে উঠছে। আর মায়ের উপর রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে তাদের। সঙ্গে সঙ্গে বাবুর উপর সহানুভূতিতে মন ভরে উঠছে।

আশ্চর্য! স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া আবার কোন্ সংসারে না হয়? বোঝা যাচ্ছে বটে ইদানীং বাবুর স্বভাব-চরিত্তির খারাপ হয়েছে, তা সেটাই বা কী এমন আশ্চর্য ঘটনা? তাই বলে চলে যাবে মানুষ ঘর-সংসার স্বামীপুত্তর ফেলে? এটাকে তারা ফ্যাশন ভাবছে, পয়সার গরম! অতএব তাদের মজলিশে এই নিয়ে আলোচনা এবং হাসাহাসির অন্ত নেই। পুরনো দিনের ভৃত্য নয়, তাই মনিব বাড়ির অশান্তিতে অশান্তি বোধ করে না, করে আমোদ বোধ।

তবে দাদাবাবুটাকে দেখলে কষ্ট হয়। আহা, বেচারার খাওয়া গেছে, খেলাধুলো গেছে, ঘুমও গেছে। তাই ওর সামনে বেশি কথা বলতে সাহস হয় না।

চাকরটা চলে গেল। আর একটু পরেই ঢুকল প্রদোষ। নন্দিতা গিয়ে পর্যন্ত এ ঘরে কোনোদিন ঢোকেনি সে, আজ ঢুকল। ঢুকেই বলে উঠল, 'তুমি নাকি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছ?'

কৌশিকের মুখটা শক্ত হয়ে গেল, কৌশিক কাঠ হয়ে বসে রইল।

বাবা আবার বলল, 'ওরা বলছিল, যাচ্ছ না। স্কুল কামাই করবার মানে কি?'

কৌশিক তবু তেমনিই বসে থাকে।

বাবা আবার বলে, 'ও রকম করার কোনো মানে নেই। কাল থেকে স্কুলে যাবে।'

এবার কাঠের মুখ কথা বলে ওঠে, 'না!'

'না? স্কুলে যাবে না?'

'না।'

'চমৎকার! তাহলে তুমি হবেটা কি? রাস্তার ঝাড়ুদার?' প্রদোষ ভাবছিল টুবলুকে শাসন করছে সে। প্রদোষ ভেবে দেখেনি টুবলু নামের সেই সর্বদা-আহ্লাদে-উছলে-পড়া ছেলেটা আর নেই। সে ছেলেটা মরে গেছে। তার চেয়ারে যে বসে আছে সে একটা বড়ো ছেলে। যার নাম কৌশিক।

তাই প্রদোষকে শুনতে হল, 'রাস্তার ঝাড়ুদাররা আমাদের থেকে অনেক ভালো।'

'ওঃ, তাই নাকি? তা বেশ, জ্ঞান যখন জন্মেই গেছে, তখন এটাই ভাবা উচিত, নিজের আখেরটা গুছিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

কৌশিক তিক্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা, মনে রাখতে চেষ্টা করব।'

প্রদোষ চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে এল।

বলল, 'তা তুমিই বা কেন একবার চেষ্টা করলে না, মায়ের রাগ ভাঙাবার? অনেকটা তোমার ওপর রাগ করেও—'

'কথা ভালো লাগছে না আমার। মাথা ধরেছে।' বলে উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল কৌশিক।

প্রদোষ একবার দাঁতে দাঁত পিষল, তারপর হঠাৎ শীস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

বিপাশা বলল, 'কী ব্যাপার এত রাত্রে আবার?'

প্রদোষ মুখে একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ঢুকতে দেবেন না বুঝি?'

হ্যাঁ, 'আপনি' বলেই কথা বলে ওরা।

কারণ পালিশটা হারাতে হাজী নয়, রাজী নয় মুখোশটা খুলতে। কেউটে সাপ খেলাবে, তবু ভাব দেখাবে যেন রবারের সাপ নিয়ে খেলছে।

ব্যঞ্জনার হাসি বিপাশাও হাসতে জানে বৈকি। সেই হাসির সঙ্গে তীক্ষ্ণ কথার হুল বসায় সে, 'না-দেওয়াই তো উচিত।'

'তাহলে ফিরে যেতে হয়।'

বিপাশা মুখ টিপে হাসে, 'আমিও তাই বলছি।'

'এক পেয়ালা কফি না-খেয়ে নড়ছি না। হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে জেগে উঠল—'

'রাত্তির এগারোটায় আর কফি খায় না।'

'এগারোটা নয়, পৌনে এগারোটা।'

'ওই একই কথা।'

'দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন মনে হচ্ছে। সত্যিই ঢুকতে দেবেন না নাকি?'

'ভাবছি—'

'অপমানিত হচ্ছি কিন্তু।'

'হচ্ছেন বুঝি?'

হাসির ছুরি ঝলসায়। 'তাহলে তো দরজা ছাড়তেই হয়। শেষে পরে আবার বন্ধু এলে লাগিয়ে দেবেন!'

'বন্ধু এলে?'

প্রদোষের চোখের কোণে এক ঝিলিক আগুন জ্বলে ওঠে, 'পালিত ফেরেনি এখনও?'

'কোথায়! বারোটার আগে কবে ফেরে? পকেটের সব টাকা ফুরিয়ে গেলে তবে তো ফিরবে।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বসে প্রদোষ।

সোফায় গা হেলিয়ে বলে, 'আচ্ছা, ও কেন তাস খেলে?'

'খেলতে জানে না বলে খেলে।'

'বাস্তবিক, আপনার বারণ করা উচিত। রোজ যখন হারে।'

বিপাশা মুচকে হেসে বলে, 'হারাই ওর ভাগ্য। সব খেলাতেই হারছে।'

'তার মানে ওর পার্টনার আনাড়ি।'

'যা বলেন।'

প্রদোষ চঞ্চল গলায় বলে, 'ও সত্যি বারোটার আগে ফেরে না?'

বিপাশা আবারও সেই হাসি হাসে, 'গ্যারান্টি দিতে পারছি না। এক্ষুনিও এসে যেতে পারে।'

'তার মানে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'কী আশ্চর্য, এর মধ্যে আবার ভয়ের প্রশ্ন কি? এখন বলুন পুনরাগমনের হেতুটা।'

'যদি বলি হতভাগ্য আশ্রয়হীন, আশ্রয় চাইতে এসেছে?'

বিপাশা বলল, 'মনে করব তামাশা করছেন।'

'দেখছি লোকের মর্মান্তিক যন্ত্রণা আপনার কাছে তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়! এই সব মেয়েকেই সাধুভাষায় বলে পাষাণী।'

'তা পাষাণী দেখতেই তো আপনি অভ্যস্ত।' বিপাশার সব মুখটা বিদ্রুপে কুঁচকে যায়।

'তা যা বলেছেন, সাধে বলি হতভাগ্য!'

'গিন্নির গোঁসা ভাঙেনি?'

'কখন আর ভাঙল? এই তো ঘণ্টা দেড়েক আগে গেছি। এর মধ্যে আর—'

'এক মুহূর্তে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তছনছ হয়ে যেতে পারে।'

'পারে? আপনি বলছেন পারে? স্বর্গ-মর্ত্য তছনছ হয়ে যেতে পারে?'

'নিয়তিতে থাকলে পারে বৈকি।'

প্রদোষের চোখে আবার আগুনের ঝিলিক ঝলসে ওঠে, 'তাহলে দায়ী হচ্ছে নিয়তি?'

'তা বলে সব ক্ষেত্রে নয়'—বিপাশা হেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা ভারী কাঁচের ফুলদানি টেবিল থেকে তুলে উঁচু করে ধরে বলে ওঠে, 'যেমন ধরুন, এইটাকে যদি ধরে আছাড় মেরে ভাঙি, সেটার জন্যে নিয়তিকে দায়ী করব না।'

প্রদোষ উঠে দাঁড়িয়েছিল, চঞ্চল পায়ে এদিক-ওদিক করছিল, আবার ঝুপ করে সোফায় বসে পড়ে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলে, 'হাতিয়ার হাতে রাখছেন? এত ভয়?'

বিপাশার কাঁধের কাপড় খসে পড়েছিল, বিপাশা ফুলদানিটা নামিয়ে রেখে ধীরে-সুস্থে 'চ্যুত অঞ্চল' বিন্যস্ত করে অবোধের গলায় বলে, 'ভয়—হাতিয়ার—এসব অদ্ভুত শব্দগুলো ব্যবহার করছেন কেন বলুন তো? বিরহের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বুঝি?'

প্রদোষ ওই বাঁকানো ঠোঁটের অসাধারণ কুটিল একটা ভঙ্গির সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ ওই তামাশার কথাগুলো মেলাতে পারে না, তাই প্রদোষ আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে দাঁড়ায়, বলে, 'যদি বলি তাই? যদি বলি এই বিরহ আর বরদাস্ত হচ্ছে না?'

'তবে যান গিয়ে পলাতকার পায়ে ধরুন গে।'

'তার কথা ছাড়ুন', প্রদোষ উত্তেজিত গলায় বলে, 'ওই এক সেন্টিমেন্টাল মহিলাকে নিয়ে জীবন বিষময় হয়ে গেল আমার। অকারণ খানিকটা সিন্ ক্রিয়েট করে—ছেলেটিও হয়েছেন মায়ের উপযুক্ত।'

'ওকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিন না।' বিপাশা সচিবের ভূমিকা নেয়, 'বাইরে কোনো বোর্ডিংয়ে। তাতে ওর মন ভালো থাকবে।'

'আমি তা ভেবেছি', প্রদোষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'কিন্তু যা একবগ্গা, হয়তো যেতেই চাইবে না।'

বিপাশা ক্রূর হাসি হাসে, 'তাহলে নাচার। তবে শুনছি তো গিন্নি কেস ঠুকছেন।'

প্রদোষ ওই কালো-রঙা মুখের গাঢ় রক্তিম ঠোঁট দুটোর দিকে চেয়ে দেখে, যেন কোন্ এক অজানা দেশের ভয়ঙ্করী পাখি, ওই চড়া রঙের ঠোঁট দুটো দিয়ে ঠুকরে তুলে নিতে এসেছে প্রদোষের সারা জীবনের স্বস্তি শান্তি, সভ্যতা সম্ভ্রম, অতীত ভবিষ্যৎ।

প্রদোষের শক্তি নেই ওর কবল থেকে সেগুলি রক্ষা করবার। অতএব প্রদোষ নিয়তিকে মানবে। নিজেকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করবে। প্রদোষ ভাববে—শুধু কি আমিই একলা? জগতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এই নিয়তির দাসত্ব করছে না? প্রদোষের ঘটনার অনেক আগে লেখা হয়ে গেছে, 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। প্রদোষ বিহ্বল গলায় বলে, 'চুলোয় যাক ও-কথা।'

'চুলোয় যাক?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ওসব কেয়ার করি না। ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। অনেক বলেছিলাম—অকারণ কতকটা কেলেঙ্কারী করার মানে হয় না। তা কানেই নিলেন না। আমাকে কোর্টে দাঁড় না-করিয়ে ছাড়বেন না।'

পাখির ঠোঁট দুটো আগুনের মতো জ্বলে।

'গিন্নির অবাধ্য হচ্ছেনই বা কেন?'

'হচ্ছি কেন?' প্রদোষ হঠাৎ উঠে সেই চকচকে সাপের মতো নিরাভরণ আর নিরাবরণ হাত দুটোর মূল অংশটা চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় বলে, 'বলব—কেন হচ্ছি?'

গাঢ় রাত্রি, নির্জন ঘর, স্বামী নেই বাড়ি, তবু একবিন্দু বিচলিত হয় না বিপাশা। শুধু আস্তে কৌশলে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে অবহেলার গলায় বলে, 'থাক্! আপনার গৃহবিবাদের কাহিনি শুনে আমার লাভ কি?'

'বিবাদটা যে আপনাকে কেন্দ্র করেই।'

'ওমা, সেকি?'

বিপাশা আকাশ থেকে পড়ে, 'আমি আবার হঠাৎ আপনাদের কি বলে—দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে গিয়ে পড়লাম কোন্ অধিকারে? এত বাজে কথাও বলতে পারেন! দাঁড়ান, কফি খান একটু—না-খেয়ে নড়বেন না মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিদায় হবেন।'

বিপাশা দরজার দিকে এগোয়।

প্রদোষ তীব্র আর তীক্ষ্ণ হেসে বলে, 'বেহায়াদের কাছে সব হিন্টই ব্যর্থ। যদি বলি আজ আর শুধু হাতে বিদায় নেব না প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি?'

'সর্বনাশ! একেবারে প্রতিজ্ঞা! আরে চারু এসে গেল মনে হচ্ছে যেন। গাড়ির শব্দ হল।' বলে টুক করে কেটে পড়ে বিপাশা?

নাগিনী-কন্যা তার সাপের ঝাঁপিটা একটুখানি খোলে আর বন্ধ করে ফেলে। দেখতে দেয় না সত্যি কি আছে। কিন্তু পালিত এসেছে বলে অবহিত করিয়ে দেবার কি ছিল? কবেই বা এসময় সজ্ঞানে বাড়ি ফেরে চারুতোষ পালিত?

আর সজ্ঞানে যখন থাকে? তখন তো বড়ো বেশি অজ্ঞান! তাই বন্ধুকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পায়।

বলে, 'আপনাকে দেখে আমার ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড ফিল্ করছি, অথচ গ্লোবের দুটো টিকিট কাটা রয়েছে, আর মিসেসকে কথা দেওয়া রয়েছে! অনুগ্রহ করে যদি এই ঘণ্টাতিনেক সময়টি আমার হিতার্থে ব্যয় করেন!'—এই হচ্ছে চারুতোষ।

কাজেই চারুতোষ যদি রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে দেখেও তার বাড়ির সন্ধ্যার অতিথি দ্বিতীয় আবির্ভাবে আবার মধ্যরাতের অতিথি হয়েছে, শানানো ছুরি নিয়ে অথবা জিভে ছুরি শানিয়ে তেড়ে আসবে না।

তবু ঘোষণাটা করে গেল বিপাশা। হয়তো সত্যিও নয়, হয়তো গাড়ির শব্দ পায়নি, তবু এইভাবেই ঘুঁটি চালে বিপাশা।

খানিকটা পরে যখন কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে ফিরে এল বিপাশা, তখন ঘরের উষ্ণ বাতাস মিইয়ে গেছে। প্রদোষ সেই 'মিয়োনো'র প্রতীকের মতো বসে আছে পাইপটা ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে।

প্রদোষ হাত বাড়াল না চট করে, শুধু সোজা হয়ে বসল, বলল, 'মুখে যতই সাহস দেখান, আসলে আপনি একটা ভীরু মহিলা।'

'ভীরু?' বিপাশা একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে, 'কে? আমি?'

'নিশ্চয়।'

'তা বেশ। ভীরুই। নিন, এখন এটা খান।'

'দিন'—হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা ধরে প্রদোষ, তার সঙ্গে পেয়ালাধরা হাতটাও। বলে, 'যতটুকু লাভ। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক।'

'বাকির কোনো খাতাই নেই!' বিপাশা বলে গম্ভীর গলায়।

প্রদোষ হাতটা ছেড়ে দেয়। বলে, 'রাগ করলেন তো?'

'সেই তো মুশকিল, আপনারা চির-রহস্য। বোঝা যায় না কোন্‌টা আপনাদের সত্যি, আর কোন্‌টা তামাশা। কোন্‌টা পছন্দ করছেন, কোন্‌টা পছন্দ করছেন না।'

'ওঃ, সব কিছুই বুঝে ফেলতে চান? খুব সাহস তো!'

'নাঃ, সাহস আর কোথায়?' প্রদোষ হতাশ গলায় বলে, 'ঠিকই বলেছেন, ভীরু আমি। ভালো ভালো নভেলের নায়করা কখনও আমার মতো এমন অনুকূল অবস্থাকে অপচয় করে না।'

বিপাশা হঠাৎ ভারী ঘরোয়া বৌয়ের সুর আনে গলায়। বলে, 'নভেলের কথা নভেলেই মানায়।'

প্রদোষ কফির পোয়ালাটা হাত থেকে নামায়। প্রদোষের চোখের কোণায় আগুন জ্বলে ওঠে। 'কেন, শুধু নভেলেই বা মানাবে কেন? নভেলের বাইরেই বা মানাবে না কেন? মানুষকে নিয়েই তো নভেল।'...

'তা হোক', বিপাশা তার গলায় সেই ঘরোয়া সুরটাই বজায় রাখে, তবু একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, অবস্থা অনুকূল হলেই মানুষ পশু হয়ে উঠে বন্ধুর বিশ্বস্ততা নষ্ট করে তাঁর স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, অথবা মেয়েরা সুযোগ, অথবা বলা যেতে পারে কুযোগ, জুটলেই এক মুহূর্তে সততা সভ্যতা পবিত্রতা, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বসতে পারে! অথচ, আপনাদের ওই আধুনিক সাহিত্যের পাতা খুললেই এই সব ঘটনা।'

বলে, এই রকম সুন্দর আর সৎকথা মাঝে মাঝেই বলে বিপাশা, শুধু ওর গলার সুরের সঙ্গে চোখের কটাক্ষের মিল থাকে না।

এখনও রইল না।

প্রদোষ ওর কটাক্ষের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বলে, 'তার কারণ হচ্ছে আধুনিক লেখকেরা ধরে ফেলেছে আসল মানুষটা হচ্ছে ওই। সভ্যতা নামের একটা আবরণ চাপিয়ে সেই আসল মানুষটাকে চাপা দিয়ে দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'তাহলে আর আসল মানুষটা বলছেন কেন? বলুন আসল জানোয়ারটা!'

প্রদোষ হেসে ওঠে। 'তা, তাও বলতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ঢাকা এক-একটা জানোয়ারই। মানুষ যে তার ওপর দেবত্ব আরোপ করতে চায়, সেটা হচ্ছে কবির কল্পনা। এই আমি এই মুহূর্তে জানোয়ার হয়ে উঠতে পারি—'

'ওরে সর্বনাশ!' চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলিয়ে বিপাশা ভয় পাওয়ার অভিনয় করে বলে ওঠে, 'তাহলে তো আত্মরক্ষার্থে সরে পড়াই উচিত।'

বলে, কিন্তু সরে পড়ে না। আর তার নিরুদ্‌বিগ্ন মুখচ্ছবি দেখে মনেও আসে না আত্মরক্ষার গরজ তার বিন্দুমাত্রও আছে।

এক চোখে প্রশ্রয়, আর-এক চোখ শাসন নিয়ে সে যেন এক অভিনব খেলার মজা উপভোগ করে বসে বসে। আর হয়তো মানুষ যে জানোয়ার, প্রদোষের এই কথাটার প্রমাণপত্রের অপেক্ষা করে। এবং অপেক্ষায় হতাশ হলে ভাবে...ভীরু, ভীরু! পুরুষ জাতটাই এক নম্বরের ভীরু!... চারুতোষটাকে অমানুষ ভাবি, কোন্‌টাই বা মানুষ? অথবা জানোয়ার?

প্রান্তিক সোম টেবিল ছেড়ে অস্থির হয়ে উঠে পড়ল। লেখা আসছে না। কতদিন থেকেই আসছে না। প্রদোষ আর নন্দিতার জীবনে অশুভ গ্রহের ছায়াপাত প্রান্তিক সোমকেও বিপর্যস্ত করছে।

না, এই অবস্থাটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না প্রান্তিক। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছে না, প্রদোষ আর নন্দিতা চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

নন্দিতার সেই সংসারটি, যার কেন্দ্রবিন্দুটিতে নন্দিতা ছিল স্থির, উজ্জ্বল দীপ্তিময়ী, যেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন হৃদয়ের আশ্রয় মিলত, একটি নির্মল কল্যাণের স্পর্শ পাওয়া যেত, সেখানে আর নন্দিতাকে দেখা যাবে না কোনোদিন। নন্দিতা নিজেকে সেখান থেকে উপড়ে নিয়ে যে একটা ভয়াবহ গহ্বর সৃষ্টি করে দিয়ে এসেছে, সেটাই শুধু চিরদিন 'হাঁ' করে গ্রাস করতে আসবে তার সংসারের অতিথিদের, বন্ধুদের।

কেন, নন্দিতা এই ভয়াবহতার নায়িকা হয়েই বা থাকবে কেন? প্রদোষ উচ্ছন্নে গেছে বলে সে-ও যাবে উচ্ছন্নে?

প্রান্তিক যেন ক্রমশ নন্দিতার ওপরই ক্রুদ্ধ হচ্ছে। যেন নন্দিতা ইচ্ছে করলেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আর সে ইচ্ছে নন্দিতার করাই উচিত। শুভবুদ্ধিকে ঠেলে রেখে অশুভ বুদ্ধির বশে চলবে কেন নন্দিতা?

প্রান্তিক সোম অতএব নন্দিতা ভৌমিকের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে আসে। কারণ নন্দিতাও তার বন্ধু। বন্ধুর বৌ হবার আগে থেকে বন্ধু।

প্রন্তিক সোমই ওদের বিবাহের ঘটক, বিবাহের সাক্ষী। বিয়ের পর দু'জনের ঘর সাজিয়ে দিয়েছিল প্রান্তিক সোমই, তাদের সন্তানলাভে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে গেলে ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছে। আর প্রান্তিক সোমই সে ছেলেকে লায়েক করে তোলায় সক্রিয় সাহায্য করেছে।

ওদের সুখ যেন প্রান্তিকেরও সুখ, ওদের প্রেম যেন প্রান্তিকেরই গৌরব। অন্য অন্য বন্ধুদের কাছে কত সময়েই প্রান্তিক তার বন্ধু-দম্পতির নিটুট নির্ভেজাল প্রেমের উদাহরণ দেখিয়েছে, সে গৌরব-মন্দির সহসা ধূলিসাৎ হয়ে গেল প্রান্তিকের।

তাই প্রান্তিক এক বন্ধুর কাছে আবেদন করে ব্যর্থ হয়ে আর-এক বন্ধুর শুভবুদ্ধির দরজায় আবেদন করতে আসে। আধুনিক লেখক হয়েও তার যুক্তিটা সেকেলে। নইলে বলে কিনা—'বুঝলাম তো সবই, কিন্তু মনে রাখতে হবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে—তুমি হচ্ছ 'মা'।'

নন্দিতা ওর এই সেকেলে ভাবপ্রবণতাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে বলে, 'রাখ তোমার ওই পচা কথা, ওই মিথ্যে সেন্টিমেন্টের বেড়ি পায়ে পরিয়ে রেখে চিরটাকাল তোমরা মেয়েদের নিরুপায় করে রেখেছে। এই কেস-এর ব্যাপারে তুমি যদি কোনো সাহায্য করতে পার তো এসো এখানে, নচেৎ তোমার সেই শয়তান বন্ধুর কাছে বসে বসে সিগারেট ওড়াওগে। বলছ কি করে যে, এরপরে আবার আমি ওর ঘরে ফিরে যাব, আবার ওর স্ত্রীর পরিচয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াব!'

প্রান্তিক ম্লান হাসে। বলে, 'এর চেয়ে অনেক বেশি নারকীয় পুরুষের স্ত্রীর পরিচয় নিয়েও অনেক মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে হয়, নন্দিতা!'

হ্যাঁ, কখনও বলে মিসেস ভৌমিক, কখনও বলে নন্দিতা। আজ ইচ্ছে করে 'নন্দিতা'টাই ব্যবহার করছে। কল্যাণকামী বড়ো ভাইয়ের গলায় কথা বলছে। সেই গলাতেই বলে, 'এর থেকে অনেক বেশি নারকীয় পুরুষের স্ত্রীর পরিচয় নিয়েও অনেক মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে হয় নন্দিতা! কারণ মেয়েরা স্বভাবতই ক্ষমাশীল।'

'ওর ওই নতুন প্রেমের নায়িকার চুনকালি-মাখা মুখটা একবার দেখুক ও।'

'চুনকালি?'

প্রান্তিক বিষণ্ণ হাসি হাসে, 'তুমি কি জান নন্দিতা, কতটা চুনকালির সঞ্চয় থাকলে তবে এদের মতো চরিত্রের মুখে চুনকালি মাখানো যায়? দেখবে তোমার এই আত্মসম্মান তখন আত্মহত্যার পথ খুঁজতে চাইবে।'

'ওঃ তোমার মতে আইনটা কেউ কাজে লাগাচ্ছে না?'

'লাগাবে না কেন, লাগাচ্ছে। হয়তো অনেকেরই অন্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু তুমি নন্দিতা, তুমি কি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে?'

'রক্ষে কর! জীবনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

'তবে? তবে শুধু আপাতত সেপারেশনটাই থাক্ না! তাতে অন্তত—'

নন্দিতা রূঢ় গলায় বলে, 'ওঃ, তুমি বুঝি ওর চর হয়ে এসেছ? অথবা ওর উকিল? যাতে ওর সব দিক রক্ষে হয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ নতুন প্রেমের পানসিটিও ভাসে, তার ব্যবস্থাতেই? আমি ওর প্রতিষ্ঠা ঘোচাব, এই হচ্ছে আমার শেষ কথা।'

তা শেষ কথার পরও অনেক কথা বলে প্রান্তিক, অনেক শুভ প্রেরণা দিতে চেষ্টা করে। ছেলের মুখ চাইতে বলে, মা-বাপের মুখ চাইতে বলে, কিন্তু নন্দিতাকে সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না।

নন্দিতা বলে, 'একদিনে অসহিষ্ণু হইনি প্রান্তিক, একদিনে এ সঙ্কল্প করিনি। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে তবেই—ও যদি সাধারণ চরিত্রচ্যুত লোকের মতো লুকোচুরি করত, আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলত অথবা ধরা পড়ে গেলে ঘটনাটাকে অস্বীকার করত আমি হয়তো ক্ষমা করতে পারতাম। সেখানে দুর্বলচিত্ত পুরুষের বাঁদরামি বলে উড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ও তা করেনি। ও দিনের পর দিন আমার মুখের ওপর বলেছে, 'তোমাতে আমার আর রুচি নেই।' বলেছে, আমাকে তুমি রেহাই দাও।' দেব রেহাই! তবে ওর ইচ্ছেমতো ওর সংসারের গিন্নি সেজে বাঁদীগিরি করে নয়।'

তবু প্রান্তিক ক্ষমার কথাই তোলে। বলে, মেয়েরা ক্ষমাপরায়ণা।'

'সে তোমার উপন্যাসের মহৎ নায়িকারা প্রান্তিক, রক্তমাংসের মানুষ মেয়েরা নয়। ক্ষমা? ক্ষমা মানুষ কাকে করে? অনুতপ্তকে, ক্ষমাপ্রার্থীকে। বল তাই কিনা? একটা নির্লজ্জ জানোয়ারকে ক্ষমা করতে যাব আমি?'

'কিন্তু চিরদিন সে জানোয়ার ছিল না, নন্দিতা! আজ শুধু সাময়িক একটা বিভ্রান্তি তাকে এমন করে তুলেছে!'

'থাম, তোমার ও-কথা বিশ্বাস করি না আমি। এখন বুঝছি চিরকাল ও আমায় ঠকিয়েছে।' হ্যাঁ এই চিন্তাতেই ক্ষেপে গেছে নন্দিতা। 'চিরকাল ঠকিয়েছে! আমায় সরল পেয়ে ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে চালিয়েছে, আর আমি চোখে মায়ার কাজল পরে বসে বসে ঠকেছি। ছি ছি! আবার আমি সেই ভুলের সুখকে বুকে ভরতে যাব? গলায় দিতে দড়ি জুটবে না আমার!'

প্রান্তিক ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'তোমার এটা ভুল ধারণা, নন্দিতা! আমি বলছি এটা সাময়িক। বলতে পার এ একটা ব্যাধির মতো অকস্মাৎ এসে পড়েছে। তুমি তোমার স্বামীর সেই ব্যাধির কালে চিকিৎসার চেষ্টা না-করে তাকে ত্যাগ করে চলে এসেছ, চিরদিনের মতো ত্যাগ করতে চাইছ।'

'কী করব বল?' নন্দিতা কঠিন গলায় বলে, আমি 'পাপিয়সী। আমি তোমার ওই কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত বন্ধুকে নার্সিং করে সারিয়ে তুলতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছি। তবে উদাহরণটা যুক্তি নয় প্রান্তিক, আত্মপ্রবঞ্চনাটা সত্য নয়। বল তো তুমি এক্ষেত্রে তোমার গল্পের নায়িকাকে দিয়ে কী করাতে? এই অপমান-শয্যাতেই ফেলে রাখতে তাকে? আর গালভরা গলায় উপদেশ দিতে, 'সকলের ওপর তুমি মা!' বলতে—'তোমার স্বামীর হঠাৎ একটি ছোঁয়াচে অসুখ ধরেছে, তুমি তাকে নার্সিং করে সারিয়ে তোলো'?...বল? বল শীগগির বলতে পারবে না, উত্তর নেই।'

প্রান্তিক আরও ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'জীবনকে গল্পের নায়িকার ছাঁচে ফেলতে যাওয়ায় সুখ নেই, নন্দিতা! তোমরা দীর্ঘ ষোলোটা বছর পরস্পরের সুখে-দুঃখে জড়িত হয়ে যে ঘরটা গড়ে তুলেছ, এক মুহূর্তের অসহিষ্ণুতায় সে ঘরটা ভেঙে গুঁড়ো করবে?'

'ঘর?' নন্দিতাও এবার একটা ক্ষুব্ধ হাসি হাসে। নিজে ভেঙে গুঁড়ো করছি না প্রান্তিক, ভেঙে ধ্বসে পড়ছে দেখে ছাদ-চাপা পড়ে সমাধি হবার পরিণাম এড়াতে পালিয়ে এসেছি। ঘর? ঘরের মূল্য তোমরা কতটুকু বোঝ? ঘর মেয়েদের জীবনের কতখানি তা জান?...বই লেখ বলেই সব বুঝে ফেলেছ তা ভেব না। তবু সেই ঘর যখন কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসে, জেনো অনেক দুঃখেই আসে। তবু এও জেনো, ঘর যতই মূল্যবান হোক, আত্মসম্মানের থেকে বড়ো নয়। যদি তোমার মহৎ নায়িকারা তাকে সে প্রাধান্য দেন তো বুঝব হয় তাঁদের আত্মসম্মানবোধই নেই, নয় তাঁদের ওই ইঁট-কাঠের ঘরটার ওপরই নির্লজ্জ লোভ। তুমি আর আমায় সুবুদ্ধি দিতে এস না প্রান্তিক, কেস আমি করবই। ওকে আমি কোর্টে দাঁড় করাবই।'

প্রান্তিক হার মেনে ফিরে গেল। শিখা তো আগেই হার মেনেছিল। তবু সুমতি দিতে আসবার লোক আরও ছিল বৈ কি! নন্দিতা একটা বড়ো সংসারের মেয়ে তো বটে।

নন্দিতার দিদি এল গোড়ায়, বলল, 'তিলকে তাল করিসনে নন্দি, ইচ্ছে করে লোক হাসাসনি। প্রদোষের অধঃপতনে যদি বা লোকের তোর ওপরে সহানুভূতি আসছিল, তোর এই মামলা করার কেলেঙ্কারীতে সে সহানুভূতি ঘুচবে।'

'লোকের সহানুভূতি?' নন্দিতা ব্যঙ্গ হাসি হাসল, 'জিনিসটা একদম অসার দিদি, কিছুমাত্র ফুড্‌ভ্যালু নেই।'

'তা যাক্, মা-বাবার মুখটার দিকেও চাইবি না? একবার তো বিয়ের সময় যথেষ্ট মুখ পুড়িয়েছিলি, আবার সেই সাধের বিয়ের কেচ্ছা-কাহিনি নিয়ে—'

নন্দিতা গম্ভীর হয়। নন্দিতা সেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে, 'দেখ দিদি, মুখ যদি তাঁরা পুড়ছে কল্পনা করেই পোড়ার জ্বালা অনুভব করেন, আমার কি করবার আছে? ছেলেমেয়েরা বড়ো হলে যে তারা আর তাঁদের শিশুটি থাকে না, পুরো একটা মানুষ হয়ে ওঠে, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, সমস্যা-প্রতিকার তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়, এগুলো মা-বাবারা ভুলে যান বলেই এত জ্বালা। আমার ভালোবাসাকে তাঁরা সমর্থন করেননি, বিয়ের সময় অকারণ প্রতিকূলতা করে অনেক কষ্ট দিয়েছেন আমায়, তারপর শুধু শুধুই কতকাল নির্লিপ্ত থেকেছেন, ঠেলে রেখেছেন, সে তো তোমার অজানা নয়! বলতে গেলে তোমার চেষ্টাতেই আবার তাঁরা আমাকে মেয়ে বলে স্বীকার করেছিলেন, নচেৎ হয়তো করতেন না। এখনও আমার জীবনের এই সমস্যার দিকে তাঁরা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন না। জামাইকে নিন্দেমন্দ করলেও, তাঁর দোষটাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করছেন না, ভাবছেন আমিই অসহিষ্ণু। আমিই বা তবে তাঁদের মুখের কথা ভাবতে যাব কেন?'

দিদি হতাশ হয়ে বলেন, 'তবে আর কি বলব। তবে টুবলুর কথাটাও একবার ভাবলে পারতিস!'

'ভেবেছি।'

নন্দিতা তীব্র গলায় বলে, 'তার সম্পর্কে বেশি ভাবনা না-করলেও চলবে। সে ঠিকই সাপের তেলে 'সলুই' হচ্ছে। সেও তার বাপের মতো আমায় আসে ধমকাতে, চুপ করাতে।'

'তা তোরা রাতদুপুরে পাড়া জানিয়ে ঝগড়া করবি—সে ছেলেমানুষ, মা ছাড়া জানত না—'

'দিদি থাম। ভয়ানক মাথা ধরেছে। মোটেই আর সে ছেলেমানুষ নেই। আমার জন্যে তার কিছুই এসে যাবে না। বাপের পয়সা আছে, চাকর-বাকর আছে, ইচ্ছে হলে বোর্ডিংয়ে পাঠাবে, দু-দিন বাদে বিলেত পাঠাবে, মিটে যাবে সমস্যা।'

'তাহলে বলতে হবে তোর সেই মাতৃস্নেহটাও মিথ্যে ছিল।'

নন্দিতা মুখটা অন্যদিকে ফেরায়। নন্দিতা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'তাই ছিল তাহলে। তবে—এটা জেনো, আমার কাছে স্নেহ প্রেম সব কিছুর বড়ো আমি যে একটা মানুষ, সেই চেতনাটুকু।'

অতএব লড়াই বাধে।

একদিন মা এসে মাথার দিব্যি দিয়ে যান, বাপ এসে অভিসম্পাত, তবু বাধে।

পিসি-মাসি দাদা-বৌদি এবং আরও অনেকেই আসেন, শেষ অবধি রাগ করে ফিরে যান। কারণ নন্দিতা আপন সংকল্পে অটল।

শিখার বাড়িতেই রয়ে গেছে নন্দিতা, তাই শিখা আর সাহস করে বেশি কিছু বলে না, কি জানি বন্ধু যদি আহত হয়। যদি বলে আমাকে ভারস্বরূপ লাগছে বলেই বুঝি সেই নোংরা লোকটার সঙ্গে মিটমাট করতে বলছ?

আসল কথা নিয়তি। ওর বাড়া অমোঘ, ওর বাড়া অনিবার্য আর কি আছে? নন্দিতার এই নিয়তি, তাকে রোধ করবে এ সাধ্য কি নন্দিতার আছে? নেই।

তাই নন্দিতা অসাধ্য সাধন করে বেড়ায়! নন্দিতা উকিলবাড়ির মাটি নেয়, নন্দিতা পড়ে পড়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন মুখস্থ করে ফেলতে বসে।

কিন্তু জায়গায় জায়গায় খটকা লাগছে। নিজের দিকে যেন উপকরণ কম। উকিল বলছে, 'শুধু স্বামী অনাসক্ত, অথবা আপনার প্রতি উদাসী, এটুকুতে কাজ হবে না। সলিড্ কিছু চাই। প্রমাণ করতে হবে মিস্টার ভৌমিক চরিত্রহীন।'

প্রমাণ!

নন্দিতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তার গতিবিধিই তার প্রমাণ।'

'ওতে হয় না।' উকিল কুটিল হাসি হাসেন, 'আরও কিছু দরকার।'

অতএব সেই 'দরকারি' বস্তুটা নির্মাণ করতে বসেন উকিলবাবু। নন্দিতাকে বাঁশ-দড়ি খড়-মাটির জোগান দিতে হয়।

মিছে কথা? কে বলেছে মিছে কথা? নন্দিতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এইটুকুই হয়তো বানানো, তাছাড়া? তবু খারাপ লাগে বৈকি! নিজেকেই যেন ক্লেদাক্ত মনে হয়, অশুচি মনে হয়। কিন্তু উপায় কি? নাচতে নেমে তো ঘোমটা চলে না। 'প্রত্যক্ষদর্শী'র মহিমা নিতে হলে যা মুখস্থ করবার, করতে হবে বৈকি। দিনরাত্তিরের চিন্তাতেই তাই লেগে থাকে একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি।

বিশ্বাস হয় না, কিছুদিন আগেও এই নন্দিতা প্রত্যেকটি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর ঘট সামনে দিয়ে ধূপ-ধুনো ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করতে বসত। বিশ্বাস হয় না, পাঁজী দেখে নীলষষ্ঠী মহাষ্টমীর দিন বরের কাছে বায়না করত—'গাড়িটাকে চালিয়ে একটু এগিয়ে নিয়ে চল দিকিনি, একটু বড়ো গঙ্গায় স্নান করে আসি। এখানের ঘাটে যা কাদা, নামতে ইচ্ছা করে না।'

আর এও বিশ্বাস হয় না, রান্নার বই দেখে দেখে নতুন রান্না করে স্বামী-পুত্তুরকে খাওয়ানোর জন্যে দুপুরের বিশ্রামের হাতছানিকে আমল দিত না।

এ যেন আর এক নন্দিতা। লজ্জা-সরম বিবর্জিত, শালীনতা-অশালীনতা বিসর্জিত একটা প্রতিহিংসা-সাধনের যান্ত্রিক মূর্তি।

আবার একদিন প্রান্তিক এল। বলল, 'প্রদোষ একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

দপ্ করে জ্বলে ওঠে নন্দিতা, 'দেখা! আমার সঙ্গে! মানে?'

'মানে হচ্ছে—বলছিল টুবলুকে কোনো বোর্ডিংয়ে ভর্তি করে দেওয়া দরকার কি না সেই পরামর্শ করতে।'

'পরামর্শ? আমার সঙ্গে?' নন্দিতা ধারালো গলায় বলে, 'ন্যাকামিরও একটা সীমা থাকে, প্রান্তিক! কিন্তু দেখছি তোমার এই নির্লজ্জ বন্ধুটির কোথাও কোনোখানে সীমা নেই।'

প্রান্তিক মিটমাটের সুরে বলে, 'বন্ধুর হয়ে আমি কিছু বলতে আসিনি নন্দিতা, আর তোমরা

দু'জনেই আমার বন্ধু। আজ থেকে নয়। কিন্তু সে কথা যাক্, ও বলছিল, 'চিরদিনই তো ছেলেটাকে তার 'মায়ের বিজনেস' বলে ভেবে এসেছি, তাই ওর সম্পর্কে কি করা সঙ্গত বুঝতে পারছি না।'

নন্দিতা এ কথায় গলে না। নন্দিতা তীব্রস্বরে এইটুকুই জানিয়ে দেয়—প্রদোষ ভৌমিক খোকা নয়, আর তার ছেলেও খোকা নেই। নন্দিতার কোনো 'বিজনেস' নেই। নন্দিতা ধরে নিয়েছে ত্রিভুবনে তার কেউ নেই, সে কারও নয়।

প্রান্তিক বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল একটু। প্রান্তিকের মনে ক্ষীণ একটু আশা জাগছিল, ছেলের প্রশ্ন নিয়ে হয়তো একবার ওরা মুখোমুখি হবে। আর সেই মুখোমুখির ঘটনাতেই হয়তো সমস্ত পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যাবে। জগতে এমন ঘটনা ঘটে বৈকি। দুরন্ত রাগ, দুর্জয় অভিমান, হঠাৎ হয়তো একবার কাছাকাছি আসার সূত্রে ভেঙে যায়, গলে যায়। একটু নির্জনতায়, একবার চাহনিতে যে কী হয়, কী না হয়!

কিন্তু প্রান্তিকের আশা রইল না। নন্দিতা যেখানে দেখা করতে চাইল, সেখানে হৃদয়-সমস্যার সমাধান হয় না। তবু নন্দিতা সেই স্থানটাই নির্বাচন করল। বলল, 'বোলো দেখা করব। কোর্টে। তার আগে নয়।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'কী হে ভগ্নদূত, দেখলে তো? বলিনি? চিনি তো মহিলাকে!'

প্রান্তিক রুক্ষ গলায় বলে, 'এমন ছিল না ও প্রদোষ, তুমিই করে তুলেছ।'

'অস্বীকার করছি না। যাক্, আমি আর টুবলুর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব না। ইচ্ছে হয় স্কুলে যাবে, না হয় স্কুলে যাবে না। রাস্তার রকবাজ ছেলে হয়ে ঘুরে বেড়ানোই যদি ওর, তোমরা গিয়ে কি বলে, নিয়তি হয়, তাই হবে।'

'তাই হবে?' প্রান্তিক রুক্ষগলায় বলে, 'আর তুমি সে দৃশ্যের দর্শক হয়ে দার্শনিক-সুখ অনুভব করবে?'

'উপায় কি?' প্রদোষ অবহেলাভরে ধোঁয়ার রিং সৃষ্টি করতে করতে বলে, 'সুদপদেশ দিতে গেলে নেবেন বাবু? জানো, ও আমার সঙ্গে কথাই বলে না। কোনো একটা প্রশ্ন করলে দশবারে উত্তর দেয়। আর যখন দেয় বা যেটা দেয়, মনে হয় তার থেকে একটা চড় বসিয়ে দিলেও অনেক কম অপমানিত হতাম। রাতদিন খোকামি করে বেড়াত, চকলেটের জন্যে বায়না করত, জামা-জুতোর ঠিক রাখতে পারত না। অথচ এখন দেখছি একটি বিষধর সর্পশিশু!'

প্রান্তিক ওর ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকায়। প্রান্তিকের সহানুভূতি আসে না। প্রান্তিক রুক্ষ গলাতেই বলে, 'স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক? হুঁ, সবাইয়ের সব কিছুই স্বাভাবিক, শুধু একটা মানুষ যদি কোনোখানে একটু জীবনের রস অন্বেষণ করতে চায়, সেটাই বিশ্বছাড়া অস্বাভাবিক। কি বল?' প্রদোষ বাঁকা গলায় বলে, 'কি হল? ভালো বাংলা বললাম না?'

প্রান্তিক রুদ্ধগলায় বলে, 'উচ্ছন্নে যাও তুমি।'

'আহা, সে আর নতুন করে কী যাব? গিয়েই তো বসে আছি। শুধু ভাবছিলাম তুমি যদি শ্রীমতী নন্দিতার এই দুঃসময়ে তাঁকে একটু হৃদয়রসস্পর্শ জোগাতে পারতে, বিবেকের দংশনটা একটু কম অনুভব করতাম।'

প্রান্তিক তীব্রস্বরে বলে, 'আর কোর্টে গিয়ে বলবার মতো দুটো কথাও পেতে।'

প্রদোষ হেসে ওঠে। হা হা করে অস্বাভাবিক হাসি।

তারপর বলে, 'তোমাদের সাহিত্যিকদের এই এক দোষ, বড়ো তাড়াতাড়ি ভিতরের কথা বুঝে ফেল।'

হঠাৎ ধমাস করে একটা শব্দ হয়।

এরা দুজনেই চমকে ওঠে।

তারপর লক্ষ করে বসবার ঘর আর টুবলুর পড়বার ঘরের মাঝখানে যে দরজাটা রয়েছে, টুবলু সেটা যতটা সম্ভব জোরে বন্ধ করে দিয়েছে। এটা তারই শব্দ।

প্রদোষ তিক্ত হাসি হেসে বলে, 'দেখলে তো? এই ছেলেকে আমি 'আহা মাতৃহীন' বলে পিঠে হাত বোলাতে যাব?'

না, টুবলুর পিঠে হাত বোলাতে যাবার সাহস শুধু তার অপরাধী বাপেরই নেই তা নয়, কারোরই নেয়। মাসি একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল, হয়তো ওই পিঠে হাত বোলাবে বলেই, টুবলু যায়নি। অতঃপর মাসিই একদিন এল। পিঠ পর্যন্ত নিয়ে গেল হাত, বলল, 'চল্ না তোতে আমাতে তোর 'হাড়মুখ্যু' মা-টার কাছে যাই। দেখি তোকে দেখে কেমন মুখ্যুমি বজায় রাখতে পারে!'

কিন্তু টুবলু সে হাতকে আর অগ্রসর হতে দিল না। টুবলু ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর মাসিকে একটা কথাও না-বলে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

এরপর আর কার কাছে বসে থাকবে মাসি? কত আর অপমান সইবে? গজগজ করতে করতে চলে গেল, 'শনি, শনি ঢুকেছে বাড়িতে! সব কটার বুদ্ধিবৃত্তি ভব্যতা-সভ্যতা হরে নিয়েছে। নইলে—এই বাড়িই এই সেদিন পর্যন্তও ইন্দ্রভবন লেগেছে। আর এই সেদিনও ওই ছেলে 'মাসি একটা গল্প বল না' বলে কাছ ঘেঁষে বসেছে।'

তবে? তবে আর কি, শনিই। শনি ভিন্ন আর কোনো পাপগ্রহ এমন করে সব ধ্বংস করে দিতে পারে?

শিখাও সেই কথা বলে।

নন্দিতা যখন রুক্ষচুল শুষ্কমূর্তি নিয়ে এসে বাসায় ফেরে, শিখা বলে, 'শনি, শনিই ধরেছে তোকে। নইলে এমন বিটকেল মূর্তি হয়? এসে দাঁড়ালি যেন রাক্ষুসী! তোর বরের বাড়ির মতো বড়ো আর্শি আমার না থাক, তবু ওই ছোটো আর্শিতেই নিজেকে দেখেছিস কোনোদিন?'

নন্দিতা মৃদু হাসে, 'হঠাৎ আর্শিতে মুখ দেখে কী হবে?'

'কী হবে জানিস? পাঁচজনে তোর কী মুখখানি দেখছে সে বিষয়ে অবহিত হবি। লোকে বোধহয় নন্দিতা ভৌমিকের প্রেতাত্মা বলে মনে করছে তোকে।'

তা তাই-ই।

আর্শিতে না-দেখেও নিজেকে নন্দিতা ভৌমিকের প্রেতাত্মাই ভাবছে নন্দিতা। যে প্রেতাত্মাটা অহরহ শুধু ভাবছে, কবে প্রদোষ ভৌমিকের নামটা কাগজে কাগজে ছড়াবে। কবে প্রদোষ ভৌমিক সেই ছড়ানো নামের লজ্জায় গুটিয়ে যাবে মাথা হেঁট করে। এই শুধু এই নন্দিতার ধ্যান-জ্ঞান।

অতএব চালিয়ে যাও কুশ্রীতার যুদ্ধ। দেখা যাক যুদ্ধফল। যুদ্ধে নামলে তো দু'পক্ষই সমান নির্লজ্জ হয়ে উঠবে, সমান নোংরা, সমান ইতর। যুদ্ধের নিয়মই তো তাই। যুদ্ধক্ষেত্রের মানুষকে তো মানুষ বলে চেনা যায় না। কাজে কাজেই বলা যাচ্ছে না কে জয়ী হবে। তবু জয়ের মালা বুঝি প্রদোষ ভৌমিকের দিকেই হেলছে।

কারণ চারুতোষ পালিত নিজে এসে সাক্ষী দিয়ে গেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই অমূলক। ভৌমিক, পালিত এবং মিসেস পালিতের মধ্যে যে একটি নির্মল বন্ধুত্ব আছে, সেই বন্ধুত্বের জন্য গর্ববোধ করে থাকে সে।

মিসেস ভৌমিক যে সেই নির্মল এবং পবিত্র বস্তুটিকে কালি-মাখা করে উপস্থাপিত করেছেন, সেটা কেবলমাত্র মেয়েলি ঈর্ষা-সঞ্জাত।

এরপর নন্দিতার পক্ষে শক্ত ভূমিতে দাঁড়ানো শক্ত হবে।

অতএব আবার উকিলের উপর চাই বড়ো উকিলের পরামর্শ। সেই ধান্ধায় ঘুরছে নন্দিতা—দিন নেই রাত নেই।

শিখা বলছে, 'তোকে ঠিক একটা বাঘিনীর মতো দেখতে লাগছে।'

'লাগুক'—বাঘিনীই তো হয়ে উঠেছে নন্দিতা!

কিন্তু খবরের কাগজগুলোকে 'বোবা'য় পেয়েছে নাকি? আইন আদালতের পাতাগুলো যেন তার সমস্ত তীক্ষ্ণতা আর সরসতা হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

কই, প্রদোষ ভৌমিক আর বিপাশা পালিতের নাম জড়ানো রসালো খবরগুলো কোথায়? যাতে দেশসুদ্ধ লোক টের পেয়ে যাবে প্রদোষ ভৌমিক নামের লোকটা কী চরিত্রের!

এ প্রশ্নে মুহুরি জীবনকৃষ্ণ হেসে ওঠে, বলে, 'এসব সংবাদ আর আজকাল কাগজে ওঠে না।'

'ওঠে না?'

'নাঃ। এ কেস তো আজকাল আকছার হচ্ছে। হাজারটা ডিভোর্স কেস ঝুলছে, কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেবে। কাগজে অত জায়গা নেই।'

'কাগজে অত জায়গা নেই?'

নন্দিতা হঠাৎ যেন ঝুলে পড়ে। নন্দিতার সব উত্তেজনা শিথিল হয়ে যায়। এ কেস আজকাল আকছার হচ্ছে? তবে নন্দিতা কী জন্যে এই ভয়ঙ্কর স্নায়ুযুদ্ধে নেমেছিল? হাজারটার উপর আরও একটা হবার জন্যে? শুধু এই? আর কিছু না?

নন্দিতার জীবনের এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা, 'আকছার'-ঘটে-চলা একটা বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন ঘটনা-প্রবাহের বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র? তবে আর ও যুদ্ধে ফল কি? শুধু শেষ ফল ঘোষণাটুকুর আশায়? সেও তো বোঝা যাচ্ছে ক্রমশ। সেই শেষ ফলও হবে এমনি বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন বোদা বিস্বাদ। কেউ বাহাদুরি দিয়ে বলবে না—ওঃ, লড়ল বটে নন্দিতা! কেউ ধিক্কার দিয়ে বলবে না—ওঃ, শয়তান বটে ওই প্রদোষ নামের লোকটা!

নন্দিতা তবে এখন আবার বড়ো উকিলের বাড়ি ছুটবে কেন? নন্দিতা বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়বে না কেন? এ সময় শিখা বাড়ি থাকে না, চাকরটা কোথায় কোথায় বেড়াতে যায়, অতএব অবস্থাটা ঘুমের পক্ষে ভারী অনুকূল।

নন্দিতা তাই ডুপ্লিকেট চাবিতে দরজাটা খুলে নিয়ে শিখার সরু খাটটার উপর শুয়ে পড়ল ঝুপ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়ে কত সব যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল নন্দিতা। কত কথা, কত লোক, নন্দিতা একটা বড়ো গাড়ি চড়ে কোথায় যাচ্ছে, হঠাৎ নন্দিতা সামনে আর রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে শুধু অথই জল!

স্বপ্নের মধ্যেও ভাবছে নন্দিতা, কলকাতার রাস্তার মাঝখানে এতবড়ো নদী এল কোথা থেকে? নন্দিতার আর ওই যুদ্ধের কথা মনে পড়ছিল না। আর নন্দিতা এও টের পাচ্ছে না, তার ঘুমের অবসরে যুদ্ধফল ঘোষণা হয়ে গেল। কিন্তু সে কি লোকলোচনের অন্তরালে? সে কি বর্ণহীন? বৈচিত্র্যহীন? না, এতে একটা রং আছে বৈকি। চড়া রং, তাতে 'ও তো হাজারটার একটা' বলে উদাসীন দর্শক চোখ ফিরিয়ে চলে যাবে না। আর খবরের কাগজের খবর সংগ্রহকারীরা 'কাগজে অত জায়গা নেই'—বলে অবজ্ঞা করে ঠেলে রাখবে না। শহরের নিত্যঘটনার একটা হলেও, যে শুনবে বলবে, 'ইস্‌।' বলবে, 'তা হবেই তো এই সব।'

কিন্তু খবরটা প্রথমে নন্দিতার কাছে আসেনি। নন্দিতা তো তখন ঘুমোচ্ছিল।

খবর এল প্রদোষ ভৌমিকের কাছে। প্রদোষ ভৌমিক তখন তার বান্ধবীর সঙ্গে বাহুলগ্ন হয়ে সেই মাত্র একটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরোচ্ছে। সামনেই প্রান্তিক সোম। প্রদোষ হই চই করে উঠল, 'কী ব্যাপার? তুমি? তুমিও এসেছিলে বুঝি? বাস্তবিক ছবিটা দেখবার মতো, কি বলো?'

প্রগল্‌ভ লোকটা লজ্জা ঢাকতে আরও একটু প্রগল্‌ভ হচ্ছে। কিন্তু তার বন্ধু তাকে অন্যদিনের মতো ধমক দিল না। বলল না, 'বাজে কথা রাখো।' শুধু কালো শুকনো মুখে বলল, 'গাড়িতে উঠে এসো।'

'গাড়িতে? তোমার গাড়িতে? কেন?'

'কথা বলার সময় নেই, এসো।'

বিপাশা পালিত ওর ওই গাম্ভীর্য দেখে একবার হেসে ওঠার চেষ্টা করল, হল না। প্রান্তিক সোমের মুখ দেখে থতোমতো খেলো। প্রদোষও বোধহয় তাই নিঃশব্দে উঠে এল প্রান্তিকের গাড়িতে।

হাত নেড়ে বলল বিপাশাকে, 'তুমি যাও।' কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে প্রদোষ ভৌমিক।

প্রান্তিকের ওই নিঃশব্দ শাসন আর অনুরক্ত ঘৃণা-আঁকা চোখের তারায় কী ছিল কে জানে! তাই প্রদোষ কথা বলতে পারে না।

কিন্তু প্রান্তিকই বা বলেছে কৈ, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে প্রদোষকে? কী করবে সেখানে গিয়ে প্রদোষ? কী দেখবে? নন্দিতা ভৌমিক বনাম প্রদোষ ভৌমিকের লড়াইয়ের রেজাল্ট?—থই থই জল থেকে টেনে তুলে অজস্র কৌতূহলী দৃষ্টির নীচে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যাকে?

প্রদোষ ভৌমিক আসতেই ভিড় সরে গেল, আর সবগুলো দৃষ্টি এবার তার উপরেই পড়ল। অনেকগুলো চোখ, অনেক অর্থবহ। বিস্ময় ধিক্কার ঘৃণা সমবেদনা—কতরকম যেন। প্রদোষ কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পেল না। কারণ প্রদোষ এই প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল।

প্রদোষ তাই খানায় পড়ে-যাওয়া অন্ধের মতো চিৎকার করে উঠল, 'সোম—নন্দিতা?'

প্রান্তিক সোম শান্ত গলায় বলল, 'তাকে আনতে লোক গেছে। এতক্ষণ তোমাকে খুঁজে পেতেই—অফিসে নই, বাড়িতে নেই, শেষকালে পালিতের বাড়ির একটা চাকরের কাছ থেকে—'

প্রান্তিক সোম না প্রদোষ ভৌমিকের চিরদিনের বন্ধু ছিল?

তবে অমন করে প্রদোষ ভৌমিকের ভিতরকার সবচেয়ে নরম জায়গাটায় অমন করে করাত চালাচ্ছে কেন? ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নুন লাগাচ্ছ কেন? হ্যাঁ, তাই তো লাগাচ্ছ।

নইলে বলছে কেন, 'তোমার বাড়ির চাকরের মুখে জানতে পারলাম, কাল রাত থেকে খায়নি। আজ বেলা দশটার সময় বেরিয়ে গেছে, না স্নান, না আহার। আশ্চর্য, একটা লাইন লিখে পর্যন্ত রেখে যায়নি।...'

করাত চালাচ্ছে।

অথচ অদ্ভুত শান্ত আর মোলায়েম মুখে। ও কি ভাবছে তাতেই করাতের দাঁতটা গভীর হয়ে বসবে? উত্তেজিত হলে জোরটা কমে যাবে, হাত থেকে খসে পড়বে করাতটা?

তা, শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজে নাম বেরোল প্রদোষ ভৌমিকের।

বড়ো বড়ো অক্ষরে অবশ্য নয়, ছোটো ছোটো অক্ষরে।

ঘটনা ও দুর্ঘটনার কলমে ছাপা হল নামটা।

"কল্য বেলা তিনটা নাগাত সময়ে আজাদ হিন্দ বাগে একটি কিশোর বালকের (১৪) মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতের নাম কৌশিক ভৌমিক। বালকের পিতা শ্রীপ্রদোষকুমার ভৌমিক একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত, অসাবধানতা বলিয়াই মনে হয়। বালকটি সেন্ট

জোনস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের দিন সে স্কুলে না গিয়া শহরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তে আসিয়াছিল কেন, এ রহস্য এখনও অজ্ঞাত। তবে স্কুল-কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্যে জানা যায় কিছুকাল হইতেই বালকটি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিতেছিল।"

খবরটা কেউ পড়ল, কেউ পড়ল না, কারণ শহরের এই নিত্য খবরগুলোর দিকে সবাই আর নজর দেয় না।...যারা নজর দেয়, তাদের কেউ বলল, পরীক্ষায় ফেল বোধহয়। তা ছাড়া আর কি হবে? বয়েস তো চোদ্দ। কেউ কেউ বলল, আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই, চৌদ্দতেও পাকা-পক্কান্ন হয়। হয়তো হতাশ প্রেম হবে।

একটা ছোটো ছেলে লাইনের নীচে আঙুল দিয়ে পড়ে হেসে উঠে বলল, 'কৌশিক ভৌমিক। দুটো ঔকার। হি হি!'

হ্যাঁ, কৌশিক।

সকলের মুখে মুখে ওই নামটাই ফিরছে। টুবলু নামের যে উজ্জ্বল ছেলেটা শহরের দক্ষিণ প্রান্তের কোনো একটা বড়োসড়ো বাড়িতে যথেচ্ছ খেলে বেড়াত, দুমদাম করত, রেডিও খুলত, রেকর্ড বাজাত, আর স্কুল থেকে ফিরে যেখানে সেখানে জুতো-জামা ছড়িয়ে বলে উঠত, 'মা, শীগগির—ভীষণ খিদে—' সে ছেলেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 'টুবলু' বলে কেউ নেই। কেউ ছিল না।

কোনো একটা অতলস্পর্শ অন্ধকারের তল হতে যদি সেই অর্থহীন নামটা আর্তনাদ হয়ে আছড়ে আছড়ে এসে পড়তে চায়, কেউ তো শুনতে পাবে না সেই আর্তনাদ, শুধু যুদ্ধোন্মাদ দুটো পক্ষ তাদের জয় আর পরাজয়ের সমস্ত উত্তেজনা হারিয়ে একটা অর্থহীন শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যাবে।

—ঃ ঃ—

নতুন প্রহসন

সময়ের সুতোর গুলিটা যেন গড়িয়ে পড়ে গেছে কার কোল থেকে, সুতো খুলতে খুলতে এগিয়ে যাচ্ছে লাফ খেতে খেতে, ঘণ্টা-মিনিটগুলোর উপর দিয়ে। বড়ো যেন তাড়াতাড়ি লাফাচ্ছে।

সকাল থেকে দুপুরে পৌঁছে গেল দিনটা এর মধ্যেই।

আর একটু পরেই চারটে বাজবে।

বিকেল চারটে।

ইলাকে পৌঁছতে হবে সেইখানে সম্বুদ্ধ এসে অপেক্ষা করবে। অথচ ভয়ানক এখন আলস্য হচ্ছে ইলার, ইচ্ছে হচ্ছে এই নরম বিছানাটায় পড়ে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে নেয়।

ঘুম। নরম মিষ্টি আর নিরুদ্বেগ একটু ঘুম। কত দিন যেন তেমন একখানা ঘুম ঘুমোয়নি ইলা। অনেক দিন। সেই যেদিন থেকে সম্বুদ্ধকে দেখেছে, সেদিন থেকে। দিনের শান্তি আর রাতের চিন্তা কেড়ে নিয়েছে সম্বুদ্ধ ইলার।

ইলার পাহাড়ি ঝরনার মতো বাধাবন্ধহীন নিরুদ্বেগ কৈশোর জীবনটা তরতরিয়ে এগিয়ে চলছিল নুড়ি ছাপিয়ে ওঠার গুঞ্জন গান গেয়ে, সম্বুদ্ধ এসে সামনে দাঁড়াল বড়ো একখানা পাথরের চাঁইয়ের মতো।

ওকে অগ্রাহ্য করে ভেসে বহে যাবে, এ পারছে না ইলা। আবর্ত উঠেছে ওকে ঘিরে ঘিরে। যন্ত্রণা আছে তার, আছে অস্বস্তি।

তবু সুখও আছে। অসহ্য সুখ!

'পূর্বজন্ম মানতে হচ্ছে আমায়,' ইলা বলেছিল সম্বুদ্ধকে, 'শত্রু ছিলে তুমি আমার। মহাশত্রু ছিলে পূর্বজন্মে।'

সম্বুদ্ধ অবশ্য এ অপমানে ক্ষুব্ধ হয়নি, বরং হেসেই উঠেছিল। হেসে হেসে বলেছিল, 'অথবা মহাজন। অধমর্ণ ছিলে তুমি আমার। ধার রেখে মরেছিলে। এ-জন্মে সেই ধার শোধ নিচ্ছি কড়ায়-গণ্ডায়।'

'মায় সুদ।' ইলা বলেছিল রেগে উঠে। আরও বলেছিল, 'কে আসতে বলেছিল তোমাকে আমার সামনে? কত সুখে থাকতাম যদি জন্মেও তোমার ওই হাড়-বিচ্ছিরি মুখটা না দেখতাম।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত,' সম্বুদ্ধ গম্ভীর মুখটা নিয়ে বলেছিল, 'আমারও মনে হয় ও-কথা। ওই পোড়া কাঠের মতো 'তুমি' কে যদি না দেখতাম। এতদিনে—'

'এই, ভালো হবে না বলছি।'

'ভালো হবার কিছুই তো রাখনি। তোমার কবলে না পড়লে জীবনে কত কি ভালো ভালো ঘটতে পারত।'

'বটে না কি!' ইলা চোখ কুঁচকেছে, শুনি সেই ভালোর লিস্ট?'

'যথা, ভালো কনে, ভালো একখানা শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরের দেওয়া ভালো ঘড়ি, ভালো আংটি, ভালো ভালো যৌতুক—'

'ইস্! আশা কত! কোন্ শ্বশুরের দায় পড়ত তোমাকে জামাই করে ওই সব ভালো ভালো দিতে! কারুর যদি কানা-খোঁড়া একটা মেয়ে থাকত, হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে গছিয়ে দিত।'

দেখা হলেই ঝগড়া করা একটা রোগ ওদের। আর দেখা করবার জন্যেই ছটফটানি।

সকালবেলা ঘুম ভাঙা থেকে ঘুমের মধ্যের স্বপ্ন সব ভরে থাকে সেই চিন্তায়। কিন্তু শুধু এক-আধবার দেখা হওয়ায় ক'দিন আশ মেটে? সর্বদা দেখতে ইচ্ছে করে, আরও নিবিড় করে পেতে ইচ্ছে করে, কেড়ে নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে ইলাকে ইলাদের বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে।

'কিন্তু—' ইলা বলেছে, 'ওই বর্বর ইচ্ছেগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। কেড়ে নিয়ে পালাতে গেলে ছেড়ে দেবে না তোমাকে কেউ, তেড়ে গিয়ে হাতে হাতকড়া লাগাবে।'

'ওই তো! ওই দুঃখেই তো! দৈবাৎ তুমি এই বাইশের তিন রামদয়াল রোডে জন্মে ফেলেছে বলে যে, এদেরই সম্পত্তি হয়ে গেছ, এ-কথায় বিশ্বাসী নই আমি, অথচ মানতেই হচ্ছে সেই কথা।'

'তা হোক—' ইলা বলে, 'কোনো কিছু মানব না, এ-ইচ্ছেটা বুদ্ধিমানের ইচ্ছে নয়।'

অতএব বুদ্ধিমানের মতোই ইচ্ছেটা করে ওরা। সম্পর্কটা আইনসঙ্গত করে নেবার ব্যবস্থা করে। যাতে ইচ্ছে করলেই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই চেষ্টাই করছে। কিন্তু সেটা কি এমন লুকিয়ে-চুরিয়ে ছিঁচকে চোরের মতো?

ইলা বলে, 'তুমি আমায় নিয়ে যাবে দেউড়ি দিয়ে রাজসমারোহে, সেটাই সুখ, সেটাই গৌরব—'

সম্বুদ্ধ হেসে ওঠে, 'দেবে সেই পাসপোর্ট তোমার রামদয়াল রোড?'

তবু ইলা বলেছিল, 'না হয় দিদি-জামাইবাবুকে বলি।'

সম্বুদ্ধ বলেছিল, 'খেপেছ! এ-সব ক্ষেত্রে কেউ নিরাপদ নয়। দিদি-জামাইবাবু তোমায় নিয়ে 'ফর অ্যাডাল্ট' দাগা বিলিতি প্রেমের সিনেমা দেখতে যায়, অথবা 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম' নিয়ে আলোচনা করে তোমার সঙ্গে বলে, ভেব না, তোমার প্রেমে পড়াকে অ্যালাউ করবে। সেরেফ তোমার মা-বাবাকে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের পারানি নৌকোখানাকে বিশবাঁও জলে ফেলে দেবে।'

ইলা মুখ ভার করে বলে, 'সত্যি, কি সেকেলেই আছে এখনও আমাদের দেশ! বিশেষ করে এ-ব্যাপারে!'

সম্বুদ্ধ অবশ্য হাসে। বলে, 'শুধু আমাদের দেশ নয়, পৃথিবীর সব দেশেই।'

'সব দেশেই? কী যে বল? ওদেশে—'

'ওদেশের প্রগতিশীলতার নমুনা শুধু এইটুকু—গার্জেনের অনুমোদিত পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে যদি ওদের মেয়ে-ছেলেরা প্রেমে পড়ে, তাহলে ওরা খুব পিঠ চাপড়ায়। নচেৎ রাগারাগি, বকাবকি, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ইত্যাদি পুরনো পদ্ধতিগুলো ঠিকই আছে। আর আমাদের দেশে প্রেমটাই অননুমোদিত। সবটাই রাগারাগির—'

'তবু ওরা রাগারাগির ধার ধারে না। নিজেরা বেরিয়ে পড়ে।'

'সেটা আমরাও করতে পারি। কোনো কিছুর ধার না ধারলে আর চিন্তা কি? তবে আমরা না হোক, তোমরা অনেক ধার ধারতে চাও।'

সম্বুদ্ধ হেসে কথাটা শেষ করে, 'মা-বাবা যদি আর তোমার মুখ না দেখেন, এই ভেবে তোমার ভয়, দিদি-জামাইবাবু পাছে তোমায় ধিক্কার দেয়, তাতে তোমার ভয়, অতএব এই চোরের পথ ধরা।'

আজ সেই দিন। চোরের পথ ধরে বিয়ে করতে যাবে ওরা। বিকেল চারটের সময় প্রতীক্ষা করবে সম্বুদ্ধ। আর ইলার এখন কিনা ইচ্ছে দুপুরের নির্জনতায় জানলা-দরজা বন্ধ করে নরম ছায়াময় ঘরে একটু গা ছেড়ে-দেওয়া ঘুম দেয়।

তবু সে-ইচ্ছেকে বাদ দিয়ে উঠতেই হল ইলাকে। চুল বাঁধল, প্রসাধনের টুকিটাকি সেরে নিল, তারপর নিত্যদিনের সাজ সেজে বেরিয়ে পড়ল পৌনে চারটের চড়া রোদ্দুরে।

প্রায়ই এ-সময় ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে যায় ইলা, কাজেই ইলার মা অমলা প্রশ্ন করলেন না। শুধু বললেন, 'উঃ, যা রোদ! একটা ছাতা নিলে পারতিস।' বলে পাশ ফিরে শুলেন।

ছাতা ইলা নেয় না। কোনোদিনই নেয় না, তবু অমলা রোজই বলেন। আর রোজই ইলা সে-উপদেশ উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। ভাবে, বয়েস হলেই মানুষের উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছেটা এমন বাড়ে কেন! কিন্তু আজ তা ভাবল না।

আজ মায়ের ওই উপদেশ-বাণীটুকুর মধ্যেই যেন অবাধ একটা স্নেহের স্পর্শ পেল ইলা, আর চোখের কোলে এক ঝলক জল এসে গেল।

অকৃতজ্ঞ! অকৃতজ্ঞ!

ইলার মতো এমন অকৃতজ্ঞ মেয়ে আর ক'টা আছে? যদিও সম্বুদ্ধ অনেক উদাহরণ দেখিয়েছে তাকে এমন গোপন বিবাহের, এবং পরে আবার সব ঠিক হয়ে গেছে, সে-উদাহরণও দেখিয়েছে, তবু ইলার ওই কথাই মনে এল। আর সত্যিই ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা টেনে বের করে ঠুকে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক পরে, চোখের জল শুকোলে মনে পড়ল সম্বুদ্ধ নিশ্চয় হাসবে। বলবে, 'হঠাৎ? ছাতার আড়ালে আত্মগোপন নাকি?'

উত্তরটা প্রস্তুত করে রাখল ইলা। বলবে, 'তা নয়। রোদে ঘেমে কালো হয়ে যাই, এ ইচ্ছে নেই আজ।'

ওদের প্রোগ্রামে আছে, রেজিস্ট্রি-অফিস থেকে বেরিয়ে কোথাও ঢুকবে দুজনে একসঙ্গে খেতে। এই।

এর চাইতে বেশি কোনো অনুষ্ঠান আর কি সম্ভব? কিন্তু শুভরাত্রিটা?

ফুলশয্যার সেই অনুষ্ঠানটা? সেও কি শূন্য একটা সন্ধ্যার যন্ত্রণার মধ্যেই সমাপ্ত হবে? কোনো কিছু উপায় নেই?

খেতে ঢুকল ওরা দুজন, আর উইটনেস্ দুজন। অসীম আর কুমকুম। দুজনেই এদের দুজনেরই বন্ধু।

আর ওরা নিজেরাও পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছে যেন ক্রমশ। তবে ওদের আর এদের মতো লুকোচুরির সুড়ঙ্গ পথ ধরতে হবে না। ওদের দুজনেরই প্রগতিশীল বাড়ি।

তা, ওরাই উপায়টা বাতলাল। বলল, একটা নেমন্তন্নর ব্যাপার ঘটানো ছাড়া উপায় নেই, এবং সেটা যাতে বেশ খানিকটা সময় আহরণ করতে পারে।

কুমকুম বলল, 'বেশ, আমি নেমন্তন্ন করছি গিয়ে। বলব তোর মাকে, বাড়ি থেকে আমরা সবাই আমাদের চন্দননগরের বাড়িতে যাচ্ছি, ইলাও চলুক আমার সঙ্গে। ফিরতে রাত হয়ে গেলে ভাববেন না। তারপর অবশ্য কোনো আকস্মিক অনর্থপাতে রাত হয়ে যাবে। আমি বাড়ি থেকে ফোন করে দেব, ইলা আজ এখানেই—'

ইলা রাগ করে বলে, 'আমাদের বাড়িতে ফোন কোথায়?... আর সে তুই যতই খবর দিস, বাবা ঠিক এসে হাজির হবেন। রাত দুটো বাজলেও।'

'বেশ, তবে বলব চন্দননগরে থাকা হবে একটা রাত।'

ইলা মাথা নেড়ে বলল, 'তাহলে তো আসতেই মত দেবেন না।'

সম্বুদ্ধ বলে, 'ঠিক আছে। চল, এখনই গিয়ে দুজনে প্রণাম করে আসি, সব গোল মিনটে যাক।'

ইলা শিউরে উঠে বলল, 'ওরে বাবা! সে অসম্ভব।'

'তবে নিরীহর মতো যাবি চন্দননগরে, রাতে ফিরবি না। আমি সকালে তোকে এনে দেব সঙ্গে করে, বলব রাতে ভীষণ জ্বরে ধরেছিল—'

হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমকুম।

কিন্তু ইলা এই হাসি-তামাশার মধ্যে নিজেকে পৌঁছতে পারে না। ইলার বুকের মধ্যে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা ধাক্কা দিচ্ছে। ইলা যেন এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে।

এদের কাউকেই এখন ভালো লাগছে না। অসীম কুমকুম কাউকে না।

মনে হচ্ছে এতদিন ধরে ওরাই যেন তাকে প্ররোচনা দিয়ে দিয়ে একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সম্বুদ্ধও। সম্বুদ্ধকেও যেন এখন ভয়ের মতো মনে হচ্ছে।

তাই ইলা কুমকুমের হাসির পর নীরস স্বরে বলে, 'ও-সব কথা রাখ, ও হবে না! রাত দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যে যাতে ফেরা যায় সে-রকম কোনো ব্যবস্থা—'

সম্বুদ্ধও প্রায় রেগে ওঠে।

সম্বুদ্ধ বলে, 'তা তোমার যখন এত অসুবিধে, তখন থাক না হয়।'

ইলা ভ্রূভঙ্গি করে। বলে, 'তা, তোমার যদি খুব সুবিধে থাকে তো চল না তোমাদের বাড়িতেই। তোমার বউদিরা ফুলের বিছানা পেতে রাখুন, বরণডালা সাজিয়ে বসে থাকুন। আমি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে গিয়ে উঠছি।'

সেটা হবে না।

এইটাই হচ্ছে কথা। অগাধ লোক সম্বুদ্ধদের বাড়িতে। আর তারা নাকি মারাত্মক রকমের সেকেলেপন্থী। এখনও ব্রাহ্মণ-কায়স্থে বিয়ে অনুমোদন করে না। সম্বুদ্ধ যে এই বিয়েটা করেছে, সে শুধু শীঘ্রই একটা ভালো পোস্ট পেয়ে মাইশোরে চলে যেতে পারবে বলে। যতদিন না যাচ্ছে, ততদিন যা হোক করে—

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, শুধু কুমকুমের বাড়িতে নেমন্তন্নর ছুতো করে রাত দশটা পর্যন্ত কোনো একটা হোটেলে গিয়ে—

'একবার অন্তত একত্র রাত্রিবাস না হলে বিয়েটা মঞ্জুর হবে কি করে?'

কুমকুম হেসেই অস্থির, 'কী ভীতু তুই বাবা! বিয়ে হয়ে গেল, তবু এখনও এত ভয়?'

চুপি চুপি কানে কানে বলল ইলার। বলল, 'এখনও কি পরপুরুষ বলে মনে হচ্ছে নাকি রে? কৌমার্য-ভঙ্গের অপরাধে কেস্ করবি?'

ইলা আরক্ত মুখে বলল, 'থাম। অসভ্যতা করিসনে।' আর মনে মনে বলতে লাগল, সে-কথা তো অস্বীকার করতে পারছি না। বিয়ে হয়ে গেছে, এ-অনুভূতি কই আমার?

প্রতিদিনের চেহারায় নতুন কি রঙ লাগল?

তারপর ভাবল, ছি ছি! লুকোচুরি করে আবার বিয়ে! নাঃ, আজই খুলে বলব। যা থাকে কপালে। মায়ের কাছে হয়তো পারব না, দিদির কাছে বলব।

তারপর অকারণেই নিজেকে ভারী দুঃখী মনে হল ইলার। যেন কে ওকে খুব বড়ো ঠকানো ঠকিয়েছে।

ওই, ওই লোকটা। ভালোমানুষের মতো বসে আছে এখন।

ওই তো 'বিয়ে বিয়ে' করে এত অস্থির করেছে।

অবশ্য তার দিকে যুক্তি এই—তুমি যখন বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অপাপবিদ্ধা থাকতে চাও, পৃথিবীর ধূলি-মালিন্যের ছায়া দেখলে শিউরে ওঠ, তখন, বিয়েটার জন্যে ব্যস্ত হওয়া ছাড়া উপায় কি আমার?

তা কই? বিয়ে হলেই বা কী লাভের আশা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

আসল কথা, রাজপথ ছেড়ে গলি রাস্তা ধরলে হবেই অসুবিধে।

বিয়ে। বিয়ে না ছাই। মনে মনে ভাবতে থাকে ইলা, একে আবার বিয়ে বলে। সকাল থেকে সাতবার খেয়ে, নিত্যি-পরা একটা শাড়ি পড়ে নিজে নিজে এলাম আমি বিয়ে করতে! ছিঃ! জীবনের এই পরম শুভদিনে, মা-বাপের সঙ্গে পঞ্চাশ গণ্ডা মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে আমায়। আর—আর স্বামীর কাছে প্রথম আত্মনিবেদনের রাত্রিটি আসবে অবৈধ মিলনের আতঙ্কিত কুৎসিত চেহারা নিয়ে।

বারে বারেই চোখে জল আসে ইলার।

গল্পে মন বসে না, পরামর্শে মন বসে না। ইলা বলে, 'আমি যাই এবার।'

'আমরা ঠিক করেছিলাম চারজনে একটা সিনেমা দেখে তবে—'

'না-না, মা-র কাছে ধরা পড়ে যাব।'

সম্বুদ্ধ রাগ করে। কিন্তু বলতে পারে না,—পড় ধরা, আমি আছি।

ও থাকবে। পরে থাকবে।

যখন মাইশোরের চাকরিটার তারিখ আসবে, এখানের কাজের তারিখ শেষ হবে। তখন সম্বুদ্ধ ইলার মা-বাপের নাকের সামনে বিয়ের এই দলিলটা ধরে দিয়ে, তাঁদের মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। এই পরিকল্পনা সম্বুদ্ধর। নিজের বাড়ির সামান্যতম সাহায্যমাত্র নেবে না। কেউ যেন বলতে না পারে 'ঠাকুরপোর বিয়ে দিলাম আমরা।'

দিদির বাড়ি ইলাদের বাড়ির কাছেই।

ইলা ভেবেছিল আগে দিদির বাড়ি নেমে দিদির কাছে অপরাধ ব্যক্ত করে ফেলবে।

হয়ে গেছে বিয়ে, আর তো লাগিয়ে দিয়ে তাদের জীবন-তরণীকে বিশবাঁও জলে ঠেলে দিতে পারবে না দিদি-জামাইবাবু।

বলবে। না বলে থাকতে পারবে না।

এতখানি ভার বহন করে ঘুরে বেড়ানো বড়ো কঠিন। কিন্তু হল না।

শুনল দিদিরা ও-বাড়িতেই গেছে।

বলল দিদির বাড়ির চাকর।

শুনে হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিথর হয়ে এল ইলার। কেন! কেন হঠাৎ?

এ-ঘটনা যে সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন ঘটে, সন্ধ্যাবেলা যে দিদি বাপের বাড়ি, আর জামাইবাবু শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বসে থাকে, সে-কথা মনে পড়ল না ইলার। ওর মনে হল সব বোধ হয় ফাঁস হয়ে গেছে।

আর ওঁরা সবাই একত্রিত হয়ে বোধ হয় ইলার জন্যে ফাঁসি-কাঠের ব্যবস্থা করছেন।

সম্বুদ্ধ যে ওকে আশ্বাস দিয়েছিল, আইনত তোমায় কিছু করতে পারবেন না ওঁরা, তুমি নাবালিকা নও। বড়োজোর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তা সেও লোকে পারে না। কেলেঙ্কারির ভয় আছে। লোকলজ্জার ভয় আছে। ওইখানেই জব্দ গার্জেনরা—সে আশ্বাসও কাজে লাগছে না।

পালাবে? কিন্তু কোথায়?

কে বরণডালা নিয়ে বসে আছে ইলার জন্যে?

আস্তে আস্তে বাড়ি এল।

বাইরে থেকে জামাইবাবুর দরাজ গলার হাসি শুনতে পেল।

যাক, তবে পরিস্থিতি খুব খারাপ নয়। বোধ হয় ফাঁস হয়ে যায়নি।

স্বস্তিবোধ করে এগিয়ে আসে, আর আবার সেই হাসির আওয়াজ যেন বসবার ঘরটার ছাদ

ভেদ করে। ওই রকম আমুদে মানুষ হেমন্ত। দরাজ হাসি, দরাজ গলা, প্রচুর খাওয়া, প্রচুর স্বাস্থ্য। জামাইবাবুকে ইলার খুব ভালো লাগে।

কিন্তু আজ হঠাৎ জামাইবাবুর ওপর খুব একটা হিংসে হল ইলার।

শ্বশুরবাড়িতে এসে দিব্যি জমিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক। প্রায় রোজই আসেন, তবু মায়ের জামাই-আদরের কমতি নেই।

জামাতা না দেবতা!

অথচ ইলার বর এই আদরের কণিকাপ্রসাদও পাবে না। ইলার বর কোনোদিন এ-বাড়িতে এমন জমিয়ে বসে দরাজ গলায় হাসতে পাবে না।

অথচ সম্বুদ্ধ কম বাক্যবাগীশ নয়। কথায় তার ছুরির ধার।

মা বলেন, 'আমার বড়ো জামাইটি যেমন, ছোটোটি যদি তেমন হয় তবেই আমোদ। তা এমনটি কি আর হবে? হয়তো গোমড়ামুখোই হবে।'

মা-র সেই ছোটো জামাইয়ের মুখটা কেমন, তাই দেখবেন না মা।

এ-বাড়িতে কি কোনোদিন আসেনি সম্বুদ্ধ?

এসেছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছে, ইলার ছোটো ভাই কি চাকরের সঙ্গে কথা বলেছে। কথা আর কি, ইলাকে ডেকে দেওয়ার কথা। একদিন ইলার বাবা দোতলার বারান্দা থেকে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'নীচে ছেলেটি কে সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে?'

ইলা বলেছিল, 'ওঁর ভাগ্নীর সঙ্গে পড়েছিলাম আমি, লাইব্রেরির একখানা বই ছিল ওঁর কাছে—'

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছিল ইলা এই ফাঁকা উত্তরটা দিয়ে।

পরে বলেছিল সম্বুদ্ধকে 'কিরকম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তা বল? আমাদের ক্লাশের নন্দিতা বলে একটা মেয়ে বলেছিল, 'ওই যে কবিতা-টবিতা লেখেন সম্বুদ্ধ ঘোষ, উনি আমার সম্পর্কে মামা হন।' কাজে লাগিয়ে দিলাম কথাটা। তা ছাড়া লাইব্রেরির বইটাও দিলাম ঢুকিয়ে।'

কিন্তু এত বুদ্ধি প্রকাশ করেই কি পার পেয়েছিল নাকি ইলা? পরে বারবার জেরা করেননি ইলার বাবা? ছেলেটি কে? কোথায় থাকে? নাম কি? ইত্যাদি।

এমনভাবে বলেছেন, যেন জেরা নয়, শুধু গল্প করা।

নামটা শুনে ভুরুটা একবার কুঁচকে ছিলেন। কিন্তু এ-কথাটা তো বলতে পারেননি, 'ঘোষেদের ছেলের সঙ্গে মেশবার এত কি দরকার তোমার?'

তাই বলেছিলেন, 'রাস্তায় ঘোরে, এটা দেখতে ভালো নয়। বাড়িতে এনে বসাও। তোমার মা-র সঙ্গে আলাপ করে দিও। খুশি হবেন।'

ইলা বলতে পারেনি খুশি হবার মতো কি পাবেন মা-বাবা? মা তো কারও সামনে বেরোতেই চান না। এখনও সেই মধ্যযুগীয় প্রথায়।

বড়ো জামাইয়ের সঙ্গেও প্রথম প্রথম ঘোমটা দিয়ে কথা বলতেন ইলার মা। এখন খুব 'ফ্রী'। সম্বুদ্ধর সঙ্গে মা-র এই ফ্রী কি জীবনে আসবে?...যদি সম্বুদ্ধর কথামতো পরে ভবিষ্যতে 'সব ঠিক হয়ে যায়ও'।

হয় না। কাটা গাছ জোড়া লাগে না।

ভাঙা মন ঠিক খাপ খায় না।

ঘোষের ছেলেকে কিছুতেই সমাদরে 'জামাই' বলে গ্রহণ করবেন না অমলা!

হিংসের নিশ্বাসটা ত্যাগ করে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল ইলা।

আর সঙ্গে সঙ্গে আর একবার মনে হল তার এই সুখস্বর্গ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে সে। এই জমজমাট মজলিশের মাঝখানে কোনোদিন আর এসে বসতে পারবে না।

ইলা দুঃখী। ইলা নির্বোধ।

ওকে দেখেই দিদি হইহই করে উঠল। 'এতক্ষণে আসা হল মেয়ের! কোথায় থাকিস সন্ধে পার করে?'

'ওই তো,' অমলা বলে ওঠেন, 'রোজ সেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি। কী যে এক রিসার্চ ধরল! চেহারা হয়েছে দেখ না! সেই ভর দুপুরে বেরিয়ে—নিসনি তো ছাতা!'

ছাতা।

এতক্ষণে মনে পড়ল ইলার, ছাতা বলে একটা বস্তু ছিল তার কাছে। ছিল, এখন আর নেই। কে জানে কোথায় পড়ে আছে। অতএব একটু হাসল। দিদি বলল, 'এখন আর দেরি করে লাভ নেই, উঠছিলাম। এই চটপটই বলি—একটি ছেলের ফটো এনেছি, দেখ দিকি কিরকম লাগছে? পছন্দ অপছন্দ খুলে বলিস বাপু। তোর জামাইবাবুর আবার অনেক ঢং কি না। বলেন, আগে ছোটোশালী পাত্রের চেহারাটা অ্যাপ্রুভ করুক, তারপর কথা পাড়া যাবে।'

ইলার মাথা থেকে পা অবধি একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহে যায়।

ছেলের ফটো!

বিয়ের তোড়জোড়! হঠাৎ আজই!

এটাই কি তাহলে এদের শাস্তির ধরন নাকি? ফাঁস হয়ে গেছে ইলার গোপন তথ্য, সেটা নিজেরা জেরা না করে ইলার মুখ থেকেই বার করতে চায়? নইলে আজই কেন? বুক কেঁপে ওঠে ইলার, তবু মুখে হারে না। বলে 'জামাইবাবুর বিবেচনার শেষ নেই। তবে বিবেচনাটা মাঠে মারা গেল। আমি ওই সব পাত্রাপাত্রের মধ্যে নেই।'

ইলার বাবা ছিলেন না ঘরে, মা ছিলেন। বলে উঠলেন বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়েই। 'তা থাকবে কেন? দুপুর রোদ্দুরে টো টো করে ঘুরে শুধু বস্তা বস্তা বই গিলবে।'...

মা হঠাৎ আজকেই দুপুর রোদ্দুরের কথা তুললেন। অথচ প্রায়ই তো যায় ইলা।

নির্ঘাত।

নির্ঘাত।

ওঁরা কিন্তু আর বেশি বললেন না।

ইলার দিদি নীলা বলল, 'যথেষ্ট আদিখ্যেতা হয়েছে, রাখ তুলে। ফটোটা নিয়ে যা, ঘরে রাখ গে, নির্জনে বসে দেখগে যা।'

হেমন্ত বলে, 'আর সেই যে ছেলের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করে এনেছিলে, সেটাও দিয়ে দাও শালীকে। এক সঙ্গে রূপ-গুণ দুইয়েরই বিচার হয়ে যাক।'

'হুঁ, তোমার যত অসভ্যতা!' নীলা বলে, 'ওটা বাবাকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি—'

'আহা বুঝলাম! কিন্তু যে-মহিলা বিয়েটা করবেন তাঁকে আগে দেখানোই যুক্তিসঙ্গত।'

তা, যুক্তিসঙ্গত কাজই করে নীলা। ইলার শোবার ঘরের টেবিলে ছবিটা আর লেখাটা রেখে দিয়ে আসে।

লজ্জাশীলা এখন লজ্জা করছেন, একা ঘরে নিবিষ্ট হয়ে দেখবেন।

ছবি হেমন্তর অফিসের এক সহকর্মীর ভাইপোর। সম্প্রতি 'ওদেশ' থেকে ঘুরে এসেছে, এদেশ থেকে যথারীতি শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আর চেহারাখানা দেখুক ইলা।

'রঙ অবিশ্যি ফরসা নয়' বলে গেছে নীলা। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছে, 'পুরুষ-মানুষের ফরসা রঙ একটা কুদৃশ্য।'

হেমন্তর রঙ ফরসা।

তাই এই ধারালো কটাক্ষ নীলার।

দুপুর রোদ্দুর থেকে পরা শাড়ি-ব্লাউজ বদলাতে ইচ্ছে করছিল ইলার, কিন্তু কী যে এক লজ্জা এল! মনে হল, মা হয়তো ভাববেন মেয়ে ওই ছবিটা দেখবে বলেই শাড়ি বদলানোর ছুতো করে ঘরে ঢুকল।

অথচ এই আজই ইলার বিয়ের এই তোড়জোড় দেখে তো হাসিই পাবার কথা।

বারবার ইচ্ছে হল ইলার, মনে মনে খুব হাসে। হাসে এঁদের এই গতানুগতিক প্রথার পথ ধরে মেয়ে পারের চেষ্টা দেখে, মেয়ে যে ইতিমধ্যে ডানা ঝাপটে উড়ে গেছে, একথা ভেবে হাসে, কিন্তু পারে না।

বরং ভয়ানক যেন একটা অভিমান আর আক্রোশ আসে। বলতে ইচ্ছে করে, এতদিনে টনক নড়ল তোমাদের? ক'টা দিন আগে হলেও হয়তো এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তাম না।

ক'টা দিন কেন, কাল, গত কাল রাত্রেও যদি দিদি আসত, হয়তো আপাতত পিছিয়ে রাখতাম সম্বুদ্ধকে।

আজ, আজ আসার বাসনা হল দিদির।

তারপর হঠাৎ খেয়াল হল এই চিন্তাগুলো সম্বুদ্ধর প্রতি তার নিষ্ঠার পরিপন্থী।

ছি ছি, এসব কি ভাবছে সে!

বরং ভাবা উচিত, ভাগ্যিস বাবা-মা এর আগে মেয়ের বিয়ের চিন্তা করতে বসে যাননি। তাহলে হয়তো লড়াইয়ের মুখে পড়তে হত।

কোথাকার কে এক ইঞ্জিনিয়ার—তার ছবি দেখতে আমার দায় পড়ে গেছে।

শাড়ি বদলাতে গেল খেতে বসার আগে। দিদি চলে গেছে তখন।

তাড়াতাড়ি চলে এল, কিছুতেই না মা ভাবতে পারেন ছবিটা দেখছে ইলা।

খিদের নাম ছিল না, তবু 'খাবে না' বলতে অস্বস্তি। যদি মা প্রশ্ন করেন, 'খিদে নেই কেন? কোথাও কিছু খেয়ে এলি বুঝি?' তাই খেতে বসা।

বিয়ে করে বেরিয়ে 'বিয়ে হওয়া বিয়ে হওয়া' ভাব মনে আসেনি, এল এখন। মায়ের সঙ্গে খেতে বসে।

ঠিক বিয়ে হয়ে যাওয়ারই যে অনুভূতি তাও নয়, তবু কিছু যেন একটা হয়ে যাওয়া। কেন আজ সকালে যে-ইলা মায়ের সঙ্গে খেতে বসেছিল, সে-ইলা নয় সে। এখনকার এই ইলা, অন্য ইলা, আর একজন ইলা।

মায়ের সঙ্গে যেন বহুযোজন দূরত্ব এসে গেছে এ-ইলার। খেতে বসে দুই মায়ে-ঝিয়ের সেই প্রাণ-খোলা আর গলা-খোলা গল্পের স্রোত যেন আর বইবে না। যেন বড়ো একখানা পাথরের চাঁই এসে পড়েছে তার মুখে।

'খাচ্ছিস না তো মোটে—'

বললেন অমলা।

ইলা বলল, 'খাচ্ছি তো!' খেতে লাগল জোর করে।

মা মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, হঠাৎ বিয়ের কথা শুনে মনটা উচাটন হয়েছে।

হবে, হতেই পারে।

অমলার যখন প্রথম বিয়ের কথা হয়েছিল, সাতদিন খেতে পারেনি ভালো করে।

হেমন্তর যেমন কাণ্ড, আগে কনে পাত্র পছন্দ করবে, তবে নাকি বিয়ের প্রস্তাব। শুনেও বাঁচি না। ক্রমশ দেশের চাকা যেন ঘুরে উলটে গেছে। তা, এ-ছেলেকে আর অপছন্দ করতে হয় না। গুণেই তো পছন্দ। তাছাড়া দেখতেও ভালো। রঙ ময়লা বলেছে, সে তো ফটোতে তত বোঝাও যাচ্ছে না। এমনিতে নাক-মুখ-চোখ পরিষ্কার তীক্ষ্ণ, যাকে প্রশস্ত ললাট বলে, তাই। আর সবটা মিলিয়ে একটা বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্নতা। অমলার খুব ভালো লেগেছে।

অমলার মেয়েরও লাগবেই।

তা, অমলার অনুমান হয়তো মিথ্যা নয়। অমলার মেয়ে সেই ছবিখানা হাতে নিয়ে বসে রয়েছে দীর্ঘ একটা সময়। রাত্রে ঘুমের সময়।

অমলার ঘরের পাশেই ইলার এই ছোট্ট ঘরটা। মাঝখানে দরজা, পরদা ফেলা থাকে। মানে থাকত।

সম্বুদ্ধর সঙ্গে ভাব হবার পর থেকেই কৌশলে ওই দরজাটা বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করে ফেলেছে ইলা। বলে, পড়ার অসুবিধে।

কেন?

খুব স্পষ্ট একটা কারণও অথচ নেই। মাঝে মাঝে চিঠি লেখার শখ ইলার, তাই লেখে। সেটা কিছু না। আসলে নিজেকে একলা করে নিয়ে বসার একটা আলাদা সুখ, আলাদা রোমাঞ্চ।

মাঝখানের দরজা খোলা থাকলে মনে হয় যেন ইলার চিন্তাগুলো মা-র কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। যেন মায়ের চোখ ইলার নিভৃত হৃদয়ের দরজায় এসে দৃষ্টি ফেলছে। পরাধীনতার একটা বন্ধন যেন লেগে থাকে সর্বাঙ্গে। দরজার ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন লাগে।

তাই এ ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

আজও দরজাটা বন্ধ করে দিল। বেশ একটা নিশ্চিন্ত সুখের আশা পেল যেন। বসল বিছানায়।

ভাবল ওই ছবি ওখানে থাক পড়ে। দায় পড়েনি আমার কার-না-কার একটা ছবি দেখতে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল না।

বসেই রইল।

বসে থাকতে থাকতে মন ঘুরে গেল। ভাবল, দেখলেই বা কী?

ওই একটা ছবি দেখা না-দেখায় আমার কি এসে যাবে? বরং ওই না দেখে ফেলে রাখাটাই ওকে বড়ো বেশি গুরুত্ব দেওয়া যেন।

নিক্তির কাঁটা এদিকে ঝুঁকল।

ছবিখানা অবহেলাভরে হাতে তুলে নিল। একবার দেখেই ফেলে রাখল। তারপর আবার যেন নতুন কিছু একটা কৌতূহলে ফের তুলে নিল।

তারপর দেখছে।...দেখে দেখে যেন শেষ হচ্ছে না।

মুখ-চোখ মন্দ নয় লোকটার।

নেহাত বোকাটে বলেও মনে হচ্ছে না।...বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার শুনছি, বোকা হবার কোনো কারণও নেই অবশ্য।

তা, কনে একটা ভদ্রলোকের জুটবেই ভালো মতো।

ওদের বাড়িটাও ভালো বলেই বোধ হয়। সম্বুদ্ধদের মতো গোয়ালবাড়ি নয়। ভালো ভাবছি এই জন্যে, মা-বাপ আছে বলছিল দিদি, আর সে মা-বাপ যখন খরচা করে বাইরে পাঠিয়েছে ছেলেকে, ভালো হওয়াই স্বাভাবিক।...

নিজেদের জানাশোনা কারুর সঙ্গে বিয়েটা হলে মন্দ হত না। একটা জানা মেয়ের ভালো বিয়ে হত।

জানা মেয়ে খুঁজতে লাগল মনে মনে। হরিকাকা, মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে পাগল হচ্ছেন।

হন বাবা! এই রূপে-গুণে আলো করা ছেলের সঙ্গে হরিকাকার মেয়ে! ছি ছি! বিদ্যে-বুদ্ধির বালাই মাত্র নেই মেয়েটার।

ন-মামার মেয়ে অতসী?

নাঃ, সে মেয়ে তো একটি ফ্যাশনের অবতার।

কেন একটা ভালোমানুষ ছেলের মাথাখাওয়া হবে!

বেলামাসির মেয়েটাও বিয়ের মতো হয়েছে, কিন্তু টাকাই আছে বেলামাসিদের, 'কালচার' নেই।

তবে কে? তবে কাকে?

আরও অনেক মাসি-পিসি-কাকার কথা মনে মনে তোলপাড় করল ইলা। যাঁরা নাকি মেয়ের বিয়ের কথা বলে থাকেন। একটাকেও পছন্দ হল না। কোনোটাকেই যোগ্য মনে হল না।

এই সভ্য-ভব্য মার্জিত চেহারার লোকটার সত্যিকার একটা ভালো কনে হওয়া উচিত।

কে কোথাকার ওই লোকটার কনের চিন্তায় ইলা কেন মাথা ঘামাচ্ছে, সে কথা ভাবল না ইলা।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পরও আরও অনেকক্ষণ ঘামাতেই লাগল মাথা।

পরদিন স্নান করে এসে প্রথম চমক লাগল আরশির সামনে দাঁড়িয়ে।

বিয়ে হয়ে গেছে ইলার। অথচ সিঁথিতে এখনও কুমারীর নির্মল শুভ্রতা।

সিঁদুর এক প্যাকেট এনেছিল কুমকুম, বলেছিল বাইরে এসে সম্বুদ্ধ আংটি করে লাগিয়ে দেবে—আভাসে।

ইলা রাজী হয়নি। বলেছিল, 'জীবনে প্রথম সিঁদুর পরব যেখানে সেখানে?' বলেছিল, 'থাক, ওই শুভরাত্রি না কি ওই দিনই যা হয় হবে।'

তবু আজ সিঁথিটা দেখে মনটা কেমন করে এল। ইলার যদি সহজ স্বাভাবিক বিয়ে হত, আজ ইলার চেহারায় লাগত কী অপূর্ব রঙের ছোঁয়াচ। লাল শাড়িতে মহিমান্বিত নববধূ মূর্তির সিঁথির সেই অরুণ-রাগ, সারা মাথাটাই যাতে লালে লাল হয়ে গেছে, সেই মূর্তিটার বিরহ লাগল যেন ইলার। ইলা তাই আবার স্নানের ঘরে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এল চোখের জল ঢাকতে।

ছবিখানা এখনও পড়ে আছে টেবিলে।

উলটো করে রেখে দিয়েছে ইলা।

খুলে রেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন ইলার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ-হাসি হাসছে।

এখন আর দেখতে পাচ্ছে না, তবু রাস্তায় হঠাৎ দেখতে পেলে ঠিক ওকে চিনে ফেলতে পারবে ইলা। ছবির মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন মুখস্থ হয়ে গেছে ইলার।

ইলার নিজের কোনো সিঁদুর কৌটো নেই।

মায়ের ঘরে এসে কৌটোটায় হাত দিল। লুকিয়ে চুলের মধ্যে পরবে নাকি একটু!

ধ্যেৎ। প্রথম সিঁদুর নিজে নিতে আছে নাকি!

তর তর করে দোতলা থেকে নীচে নেমে এল ইলা, মাকে বলল, 'মা, কুটনো কোটা হয়ে গেছে তোমার? আমায় কেন ডাকলে না?'

মা বললেন, 'তুই অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করছিলি, তাই আর ডাকিনি। ভারী তো কুটনো, ও আর আমার কতক্ষণ।'

কথাটা সত্যি।

অমলার দরকার হয় না মেয়ের সাহায্য নেবার।

ভারী পরিশ্রমী অমলা।

নিপুণ হাতে সংসার করেন। স্বামী-সন্তানদের প্রতি যত্নের অবধি নেই।

ইলা ভাবল মা-র বিয়েটা গতানুগতিক প্রথাতেই হয়েছিল। প্রেমে পড়ার যে কী রোমাঞ্চ, কী অনির্বচনীয় অনুভূতি, এ-সবের স্বাদ জানেন না মা।

অথচ মা সুখী, সন্তুষ্ট, আনন্দময়ী।

মা আর বাবা দুজনেই পরস্পরের প্রতি কী রকম সর্বাত্মক ভাবে নির্ভরশীল।

মা একদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারেন না। বলেন সংসারের কাজের ভাবনায়, ওটা বাজে কথা। বাবাকে ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারেন না মা। বাবাও তাই। বাবার বন্ধু পরেশবাবু ছুটি হলেই একা এখান-সেখান বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন, বাবাকে কতবার বলেছেন, বাবা যেতে চাননি।

ইলা জানে ওই একই কারণ।

ইলা জানত। কিন্তু এমন স্পষ্ট করে ভাবত কি কোনোদিন?

আজ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন নতুন করে মনে পড়ল ইলার, মা চিরদিন সন্তুষ্ট আর সুখী। চিরদিন শান্তিময় জীবন মা-র।

তারপর উঠল প্রবল কম্পনোচ্ছ্বাস।

মা-র এই চিরশান্তির প্রাণে আগুন জ্বালল ইলা, চির সুখের প্রাণে বাজ হানল।

এর পর আর কোনোদিন অমন প্রসন্ন প্রশান্ত মুখখানি নিয়ে ছোটাছুটি করে সংসার করে বেড়াবেন না অমলা।

ইলা নামের এই মেয়েটার ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার খবর পাবার পর মন ভেঙে যাবে তাঁর। ক্লিষ্ট হয়ে যাবেন, ক্লান্ত হয়ে যাবেন। পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাস হারানো একটা কঠিন কঠোর মুখ নিয়ে সংসার করে যাবেন।

বাইরের লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারবেন না অমলা আর অরবিন্দ। আত্মীয়দের কাছে পারবেন না কথা বলতে। মুখ লুকিয়ে বেড়াবেন। দেখা হলেই তো প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠবে ওরা।

বলবে, 'হ্যাঁ গো, ইলা নাকি...?'

'হ্যাঁরে ইলা না কি?' যখন তখন এই শব্দটা ঘুরবে লোকের মুখে মুখে।

'রাশি রাশি মেয়েই তো এ রকম করছে আজকাল।'

নিজেকে বোঝাল ইলা, বহু বারের পর, আর একবার। বরং তাদের মা-বাপ পরে সুবিধে বুঝে একদিন আবার 'বিয়ে বিয়ে' নাটকটা অভিনয় করে।

গহনা-কাপড় দেয়, লোকজন খাওয়ায়। আলো জ্বালে, বাজনা বাজায়। চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু—হ্যাঁ এই ভেবেই মনে বল পায় না ইলা, তারা হয়তো আস্তে আস্তে মনকে প্রস্তুত করে নেবার সময় পায়।

ইলার মা-বাপ পেলেন না।

এ-কথা তুলেছিল ইলা। আগে একদিন বলেছিল, 'ওঁরা প্রস্তুত হতে সময় পাবেন না।'

সম্বুদ্ধ বলেছিল, 'পেলেই দেবেন ভেবেছ? ঘোষের ছেলের হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন? তোমার বাবা? যিনি এখনও ধুতির ওপর কোট আর কোটের ওপর উড়ুনি চাপান।'

তা সত্যি, এ রকম সেকেলে সাজই করেন অরবিন্দ।

নীলা ইলা কত ঝগড়া করে, অরবিন্দ হাসেন। বলেন, 'এই পোশাকে কর্মজীবন শুরু করেছি, এই পোশাকেই শেষ করব সে-জীবন...তারপর দেখিস কি ফুলবাবুটি না সাজি। গিলেকরা পাঞ্জাবি, চুনটকরা ধুতি—'

মেয়েরা হেসে অধীর হয়।

'রিটায়ার করে সাজবে তুমি ওই রকম করে?'

'না সাজলে?' অরবিন্দ হাসেন, 'তোদের মেয়েদের পছন্দ হবে কেন আমাকে?'

হা-হা করে হাসেন আবার।

এই রকম সাদাসিধে পুরনো ধরনের মানুষ অরবিন্দ। ঠাট্টা-তামাশা কথাবার্তা সবই চিরকেলে। আধুনিকতার ছাপ পড়েনি সেখানে।—

কিন্তু অরবিন্দ কি কখনও কাউকে ঠকিয়েছেন? কারও মনে কষ্ট দিয়েছেন? কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?

করেননি।

ইলার বাবা নয়, মা নয়, দিদি-জামাইবাবু কেউ নয়। ওঁরা জানেন না খুব ভয়ানক একটা মিথ্যাচরণ করেও এমন হাসিমুখে ঘুরে বেড়ানো যায়।

ইলা জানে। ইলা এ-সব পারে। ইলা তাই করেছে।

আর এখন ইলাকে ততদিন ধরে তাই করতে হবে, যতদিন না সম্বুদ্ধর মাইশোরে যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়।

আচ্ছা, আজ যদি ইলা সম্বুদ্ধর কাছে না যায়?

মেয়ে হয়ে রোজ রোজ যদি সে যেতে না পারে? ইলার তো একদিন জ্বর হতে পারে? অন্তত কোনোরকম শরীর খারাপ?

ভয়? কেন? কাকে? সম্বুদ্ধকে?

কেন ভয় করবে? সম্বুদ্ধ অভিমান করবে বলে?

করুক না একটু। দাম বুঝুক ইলার। রাগ করবে? করুক! রাগ করে বিয়ে ভেঙে দিতে পারবে? পারবে না। একখানি দলিলের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে সম্বুদ্ধ।

বেশ একটা বুকের বল নিয়ে বাড়িতেই রয়ে গেল ইলা।

অথচ আগে পারত না। আগে পর পর দুদিন সম্বুদ্ধর সঙ্গে দেখা না করতে পারলেই ভয় পেত। মন হত, ও যদি বিরূপ হয়ে সরে যায়।

আজ আর তা মনে হল না।

বাড়িতেই রইল। বই পড়ত লাগল।

দিদি এল দুপুরে।

জামাইবাবু ছাড়া একা।

এ দৃশ্য প্রায় দুর্লভ।

এসে বলল, 'তোর জামাইবাবুর খিদমদগারি করতে করতে মলাম।..দে ফটোখানা। কেমন লাগল বল?'

ইলা বলল, 'খামোকা একটা ভদ্রলোকের ছবি ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্ন কেন?'

'ন্যাকামি রাখ! বিয়ে করতে হবে না? তবু তো তোদের আমলে সব কত হয়েছে। আমরা তো সেই শুভদৃষ্টির আগে চক্ষেও দেখিনি লোকটা কানা না হাবা।'

'এখন তো চক্ষে হারা হচ্ছ রাতদিন।'

'থাম, খুব ফাজলামি হয়েছে। চললাম, লাগিয়ে দিতে বলি গে। মা তো একেবারে মূর্ছিত।...আর সত্যি কথা বলি, তোর একখানা ছবি ছিল আমার কাছে, সেটা দিয়েছিলাম ওদের কাছে, ওরাও বিগলিত। ঠিক এই রকমটিই নাকি চেয়েছিল তারা।'

ইলার মাথার মধ্যে যেন কারখানার রোল ওঠে। ইলার চোখের সামনের আলোটা ঝাপসা লাগে।...

ইলা কি বলে ফেলবে এই সুযোগে?

বলতে যায়। বলতে পারে না। বোকার মতো যা বলে, তা হচ্ছে এই—'এত তাড়াতাড়ি কি আছে?'

বলে ফেলে নিজেরই লজ্জা করে।

বুদ্ধি-সংবলিত একটা কথা বলতে পারল না ইলা। এই সুযোগে বলে ফেলতে পারল না।

দিদি বলল, 'কেন, বাইশ বছর বয়েসটা বুঝি বিয়ের বয়েস নয়? পেটে খিদে মুখে লজ্জার দরকার কিছু নেই। যাচ্ছি আমি। বলব গিয়ে তোর জামাইবাবুকে সারারাত ধরে তোমার শালী তোমার বন্ধুর ভাইপোকে দেখেছে। ছবিতে, স্বপ্নে।'

'আঃ দিদি! ভালো হবে না বলছি।'

দিদি ওর রাগ দেখে আরও ক্ষ্যাপায়, আরও ঠাট্টা করে, অবশেষে বিদায় নেয়।

অথচ আশ্চর্য, যেটা করতে এসেছিল সেটাই ভুলে চলে যায়। ছবিটা পড়েই থাকে।

তা পড়েই যদি থাকে, আর একবার উলটে নিয়ে দেখতে দোষ কি।

দিনের আলোয় তো দেখাই হয়নি।

কিন্তু কী হবে দিনের আলোয় দেখে? এ-প্রশ্ন করে না ইলা নিজেকে। ছবিটাই মুখস্থ করে।

আর সেটাকে ঘিরেই প্রশ্ন করে।

শুনলাম হিন্দুস্থান রোডে বাড়ি।

সে তো এই কাছেই। ওদের দোকান-বাজার মানেই গড়িয়াহাটের বাজার। যে-কোনো সময় আসতে পারে। আর ইলাও তো রাতদিন যায় ওখানে। দেখতে পেলে ঠিক চিনতে পারবে। আর ও? ওর আর পারতে হয় না।

সবাই কি ইলার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন?

ইলা একবার দেখলে ভোলে না।

হঠাৎ এক সময় মনে পড়ল ইলার, কাল থেকে ইলা সম্বুদ্ধকে একবারও ভাবেনি।

চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ইলার বিবেক এখন ইলাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়াবে।

সন্ধ্যার সময় কুমকুম এল। বলল, কী ব্যাপার? কাল থেকে একেবারে ডুব মারলি যে? আমি সম্বুদ্ধবাবু আর অসীম, তোর অপেক্ষায় বসে থেকে—হল কি? শুয়ে আছিস যে?

'শরীরটা ভালো নেই।'

'হুঁ, বিরহ জ্বর। তার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তোর মাকে বলে এলাম, কাল তোর আমাদের কাছে নেমন্তন্ন।...এমনিতে ভদ্রমহিলা এত সরল, কিন্তু তোর এই বাইরে যাবার ব্যাপারে যেন উকিল। কী জেরা বাবা! কেন, কী বৃত্তান্ত, উঃ বাবা!' চাপা হাসি হেসে গড়ায় কুমকুম।

'যাক ম্যানেজ করা গেছে এক রকম। বলেছি খাইয়ে-দাইয়ে নাইট শো'য়ে সিনেমা দেখিয়ে ফেরত দিয়ে যাব। তাও প্রশ্নবাণ কে-কে যাবে সিনেমায়, অত রাত্রে কে পৌঁছতে আসবে—'

অন্যদিন হলে কি ইলা ওই 'বাবাঃ' শব্দটার সঙ্গে নিজের অসহিষ্ণুতাও যোগ দিত না? বলত না কি, 'আর বলিস না ভাই, প্রায় নজরবন্দী আসামী। জীবন মহানিশা হয়ে গেল?' বলত। অন্যদিন হলে বলত।

আজ বলল না। আজ বরং ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মা জানেন, মা-র কুমারী মেয়ে।'

কুমকুম অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'তা বটে।' তারপর বলে, 'বলে রাগ করিস না, দৃষ্টিভঙ্গিটা বড়ো সেকেলে। আচ্ছা, তাহলে ওই কথাই রইল?'

কুমকুম চলে যায়।

আর এতক্ষণ পরে প্রথম সম্বুদ্ধর কথা মনে পড়ে।

সম্বুদ্ধ রাগ করেছে। ক্ষুব্ধ হয়েছে। কাল সব রাগ জল করে দিতে হবে। পুরুষমানুষের রাগ ক্ষণস্থায়ী।

ক্ষণস্থায়ী।

তবু রাগ দেখাতে ছাড়ল না সম্বুদ্ধ।

বলল, 'অবাক হয়ে গেলাম কাল! ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে না। না আসা সম্ভব।'

ইলা গম্ভীরের ভান করে, 'আমিও অবাক হয়ে ভেবেছি, লোকটা এমনি আক্কেলহীন, একবার ভাবল না, খোঁজ নিই মানুষটা বাঁচল কি মরল।'

'না বাঁচার কি হল?'

'আহ্লাদেও হার্টফেল করতে পারি।'

'ঠাট্টা রাখ। এলে না কেন তাই বল?'

'মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল।'

'হেতু? হঠাৎ কী ঘটল মাথায়?'

'ঘটল? কী ঘটল?' ইলা দুষ্টুমীর হাসি হেসে বলে, 'কাল তো প্রায় আমার পাকা দেখা ঠিক।'

'কী ঠিক?'

'পাকাদেখা, পাকাদেখা।'

'পাকাদেখা কি?'

'জান না? বিয়ের আগের নোটিস। ফিরে দেখি দিদি একেবারে পাত্রের ফটো নিয়ে এসে হাজির।'

মধুরাত্রির মিলন-মুহূর্তে এ-পরিহাস বিশেষ কৌতুক-মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে না। সম্বুদ্ধর যেন রাগ ধরে যায়। চড়া গলায় বলে, 'খুব আপশোস হচ্ছে নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়।'

'অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'অবাকের কি আছে?'

'মেয়ের বিয়ে খুঁজছেন এখন।'

ইলা ওর রাগে মজা পায়। বলে, 'তা, তাঁরা তো আর জানেন না ইতিমধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেছে।'

'এবার জানানো উচিত।'

'তাই ভাবছি। ও-সব লুকোচুরি অসহ্য লাগছে। চল না, বীরের বেশে গিয়ে দাবি জানিয়ে, রাজ-সমারোহে নিয়ে এস আমায়।'

নিয়ে এস, নিয়ে এস!

এই এক কথা ইলার।

বিয়ের আগে থেকে এই কথাই বলছে। কই, একবারও তো বলছে না, 'এস।'

বলছে না, 'এস, আমি তোমার জন্যে আদরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছি, আমার আপনার লোকদের বুঝিয়ে!'

সম্বুদ্ধ তাহলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাঁচত। তা নয়, তুমি সাহস করো, তুমি নিয়ে চল। তা না হলে আমায় থাকতে দাও আমার পুরনো কৌমার জীবনের মধ্যে।

এটা স্বার্থপরতা।

সম্বুদ্ধ ভুলে যায় বিয়ের আগে সম্বুদ্ধই বারণ করেছে। বলেছে 'বাধা আসবে। আমাদের কূলে-আসা তরী বিশবাঁও জলে গিয়ে পড়বে।'

ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার তবে অবকাশ পেল কই ইলা?

অথচ এখন সম্বুদ্ধ অধীর হয়ে উঠছে। কাল বিয়ে হয়েছে, আজই ভাবতে শুরু করেছে ইলার চেষ্টা নেই। ইলা যেন শুধু বিয়ের দলিলে সই করেই ধন্য করেছে সম্বুদ্ধকে। সম্বুদ্ধও তবে সেই দলিলের জোর ফলাবে।

'আজ তোমার যাওয়া হবে না।'

'যাওয়া হবে না?'

'না, আজ এই 'নিরালা হোটেলে'র নিরালা ঘরেই স্থিতি।'

'বেশ। কাল তাহলে নিজে গিয়ে পরিচয়-পত্র দেখিয়ে পৌঁছে দিও।'

'ঠিক আছে, তাই দেব।'

'বাবা যদি বলেন, আমরা বাড়িতে তোমার স্ত্রীর জায়গা হবে না—আবার এইখানেই ফিরিয়ে আনবে?'

'উঃ!'

সম্বুদ্ধ হতাশ গলায় বলে, 'উঃ! আজকের দিনেও সেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা? সেই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব? কই, এতদিন তো মনে হয়নি তুমি রক্তমাংসের মানুষ নও, পাথরের?'

'এতদিন রক্ত-মাংসের খোঁজ করনি বলেই হয়তো টের পাওনি।'

'ঠিক আছে। তোমার বাবা যদি মেয়েকে তাড়িয়ে দেন—'

ইলা বলে, 'ভুল বলছ, বাবার মেয়েকে নয়, তোমার স্ত্রীকে।'

তর্কটা বাধা পেল।

কুমকুম আর অসীম এসে পড়ল হইচই করে। এল আর ক'জন বিবাহিত, অবিবাহিত বন্ধু। ফুল নিয়ে, উপহার নিয়ে। বিছানার ছড়িয়ে দিল গোলাপের পাঁপড়ি, ইলার খোঁপায় পরাল গোড়ে মালা। আরও দু'গাছা মালা রইল মজুত বদলের জন্যে।

সম্বুদ্ধর খরচে খেল সবাই।

তারপর বলল, 'গুড্‌বাই।'

কুমকুম চুপিচুপি বলে গেল, 'চলে যাব চলে যাব বলে পাগলামী করিস না। থেকে যা। সকালে আমার ওখানে যাবি, পৌঁছে দেব তোকে। আর রাত্রে যাহোক কিছু একটা খবর দিয়ে দেব তোদের বাড়িতে।'

ইলাও বলল, 'পাগলামী করিস না। নাইট শোয়ে সিনেমা দেখার টাইমটা হাতে আছে, ওই বেশ।'

'ওই বেশ?' সম্বুদ্ধ রেগে বলে, 'তুমি এমন ভাব করছ যেন সবটাই অবৈধ।'

'কি করব? মনের মধ্যে বৈধের সুর বাজছে না যে! বাড়ি ঢুকব কি করে সেইটাই মনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠছে।'

'বললাম তো কাল সকালে গিয়ে সব প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেব।'

'বেশ!'

'বেশ।' সম্বুদ্ধ ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'এত হিসেব কসার পর আবেগ-ইচ্ছে, বাসনা-কামনা সব ডানা মেলে উড়ে যায়।'

বলে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয় দেয় না। প্রবল বাসনার প্রচণ্ড আবেগে ইলাকে গুঁড়ো করে ফেলবার জেদ ধরেছে যেন।

ইলা মরে যাচ্ছে।

ইলা হারিয়ে যাচ্ছে।

ইলা তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব একাকার করে ফেলছে।

এখন যা করবে সম্বুদ্ধ। সব ভার তার, সব চিন্তা তার। ইলার নিজস্ব কোনো সত্ত্বাও বুঝি রইল না আর। নিজস্ব চিন্তাশক্তি।

কিন্তু সম্বুদ্ধই নতুন চিন্তায় এল।

'দেখ, এখন মনে হচ্ছে তোমার বুদ্ধিটাই ঠিক হয়েছিল।'

ইলা আস্তে বলল, 'কি?'

'মানে আর কি ফিরেই যাওয়া। এখনও সময় রয়েছে। পৌনে বারোটা বেজেছে। নাইট শো ভাঙছে।'

'আমি পারব না।'

'আহা, বুঝছ না—'

'আগে তো বুঝছিলাম, এখন বুঝতে চাই না।'

সম্বুদ্ধই তখন বোঝাতে চেষ্টা করে। কে বলতে পারে রাত কাবার করে সকালে ফিরতে দেখে ইলার বাবা পাড়া জানাজানি করে যাচ্ছেতাই করবেন কি না।...অপমানের শেষ থাকবে না তখন। বোঝাতে তো সময় লাগবে।

এখন এতরাত্রে নিশ্চয় তা করবেন না। আর তাড়িয়ে দিতেও পারবেন না।

এখনই ঠিক, এখনই সুবিধে।

'তার মানে তুমিই তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বলে ইলা।

সম্বুদ্ধ অবশ্য এ-প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দেয়। তারপর বলে, 'যক্ষের অভিশাপে'র দিন ক'টা শেষ হতে দাও একবার।'

ইলা শিথিল গলায় বলে, 'মা ঠিক ধরে ফেলবেন।'

'কেন? না না, অকারণ ভয় পাচ্ছ। গাড়ির মধ্যে কে আছে না আছে এত রাত্রে কে দেখেছে? তুমি একটু গলা তুলে বলবে, 'কুমকুম, তোর আর এত রাতে নামবার দরকার নেই, বাড়ি চলে যা।'

ইলা ঝেঁজে ওঠে।

'মানে, তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার খেসারত দিতে অবিরত অভিনয় করে চলি?'

সম্বুদ্ধ বলে, 'লাঠি না ভেঙে যদি সাপটা মারা যায়—'

'অথচ খানিক আগে লাঠিটাই ভাঙছিলে—'

সম্বুদ্ধ একটু করুণ করুণ গলায় বলে, 'আমি তোমার মতো পাথরের দেবতা নই ইলা।'

এইভাবেই ইলার ফুলশয্যার শয্যা থেকে বিদায়-গ্রহণ।

বাড়ি ফেরার সময় যথারীতি অভিনয়টা করতে হল। 'কুমকুম আর কুমকুমের দাদা গাড়িতে আছে, নামিয়ে দিয়ে গেল ইলাকে।' ইলার সর্বাঙ্গে ফুলের গন্ধ জড়ানো, ইলার সর্বদেহে বিবশ শিথিলতা।

ইলা কি ওই অভিনয়টুকু করেই পার পেয়ে যাবে? দরজা খোলার মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে থাকে ইলা

ঝড়ের মুখে পড়বার জন্যে নিশ্চয় এবার দরজা খুলবেন, আর তীব্র ভর্ৎসনা করবেন প্রশ্ন করবেন কোন্ হলে ছবি দেখতে গিয়েছিল তারা। ইলা এই সৌরভে-আকুল দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে কি উত্তর দেবে বাবাকে?

যদি তেমন অপমানের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় ফিরে আসবে ইলা, এই ঠিক করা ছিল?

গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সম্বুদ্ধ রাস্তার এ-ধারে।

নিয়ে চলে যাবে ইলাকে।

পরদিন সম্বুদ্ধ দেখিয়ে যাবে দলিল। শুনিয়ে যাবে দু'কথা।

মানে সেটা সম্বুদ্ধর মত।

এ-সবই 'যদি'র উপর ছিল।

কিন্তু দরজা খুলে দিলেন মা।

আর ইলা ঢুকতেই বলে উঠলেন, 'বন্ধুর বুঝি জন্মদিন ছিল? কই, কিছু তো নিয়ে গেলি না?'

ইলা আস্তে বলে, 'জন্মদিন নয়।'

'তবে? শুধু শুধুই? বড়োলোকদের যা সাধ হয় মেটাতে পারে। খোঁপার মালাটা কুমকুমই দিয়েছে বুঝি? কী চমৎকার গন্ধ! ঢুকলি যেন একটা বিয়ে-বাড়ি নিয়ে এলি সঙ্গে করে।'

ইলা চমকে তাকাল।

না, অমলার মুখে কোনো অভিসন্ধির ছাপ নেই। সেই তাঁর সবেতেই খুশিভাব নিয়েই কথা বলছেন, 'আস্তে আস্তে চল। এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন উনি। বারবার দেখছিলেন, আমিই বকে বকে ঘুমোতে পাঠালাম। বলি যে, তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কি সিনেমা এগারোটার আগেই ভেঙে যাবে?...ভাগ্যিস ঘুমিয়ে পড়েছেন! রাতও কিন্তু তোদের বড্ড হল। খুব বড়ো বই বুঝি?'

এরপরও কি ইলার ভিতরের আবেগ চোখের কিনারায় ফেটে পড়তে চাইবে না?

এই মা।

স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবেন না কতবড়ো ঠগ-জোচ্চোর তাঁর ছোটো মেয়ে।

কী নির্মল স্নিগ্ধ সরল বিশ্বাস!

ইলা যা বলেছে, তাছাড়া যে আর কিছু করবে, একথা অমলা ভাবতে পারছেন না।

কুমকুম বলেছিল জেরা।

জেরা নয়, ছেলেমানুষের মতো কৌতূহল আছে মা-র। জিজ্ঞেস করে করে সেই কৌতূহল মেটান। নইলে এই এত রাত্রে বলেন, 'তারপর? বল শুনি কী কী খেলি বন্ধুর বাড়িতে?'

ইলা এই সরল বিশ্বাসের কাছে হার মানে। ইলা বলে উঠতে পারে না, 'মা, তুমি যা ভাবছ তা সব ভুল। আমি যা বলেছি, তা সবই মিথ্যে। আমি প্রতারণা করে চলেছি তোমার সঙ্গে।'

ইলা ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলে, 'কাল শুনো সব, ভীষণ ঘুম পেয়েছে।'

শুয়ে পড়ে। তার এতদিনের একক শয্যায়। নির্মল, সুন্দর, পবিত্র।

কিন্তু ঘুম কি আসে অমলার 'ভীষণ-ঘুম-পাওয়া' মেয়ের?

একদিকে মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণা, আর একদিকে এক নতুন মাদকতার স্বাদ পাওয়া রোমাঞ্চিত দেহ-মনের অতৃপ্ত ক্ষুধার যন্ত্রণা, যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে থাকে ইলাকে।

তীব্র ক্ষুব্ধ অভিমানে সম্বুদ্ধর উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সেই অতৃপ্ত মন।

সাময়িক বাসনার প্রয়োজন মিটিয়ে সম্বুদ্ধ তাকে বিদায় দিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে আশঙ্কার মুখে, অপমানের মুখে।

হয়তো এমনিই করতে থাকবে সে, করতে চাইবে। সমস্ত দুঃখময় পরিণামের দিকে ইলাকে ঠেলে দিয়ে নিজের দাবি জানাবে। বৈধ স্বামীর দাবি।

হ্যাঁ, এই জন্যে সম্বুদ্ধ 'বিয়ে বিয়ে' করে অধীর হয়ে উঠেছিল, দাবিটাকে বৈধ করে নেবার জন্যে।

নির্ঘাত এরপর সম্বুদ্ধ যখন-তখন এই গোপান অভিসারের স্বাদ চাইবে।

চাইবেই। সেই লোভ আর লোলুপতার ছাপ দেখেছে ইলা তার স্বামীর চোখের দৃষ্টিতে।

স্বামী।

ইলার স্বামী।

যে-স্বামী রাত দুপুরে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে।

যন্ত্রণাপীড়িত ইলার ঘুম আসে প্রায় শেষরাত্রে। ঘুমিয়ে থাকে বেলা অবধি।

অমলা মায়া করে ঘুম ভাঙান না।

হ্যাঁ মায়াই। অমনিই মায়া অমলার। নেমন্তন্ন খেয়ে আর সিনেমা দেখে রাত করে ফিরেছে মেয়ে, তবু অমলার ঘুম ভাঙাতে মায়া হয়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙে দিদির গলার শব্দে।

দিদি সকালবেলা!

ওঃ, আজ রবিবার, সকালবেলা আসে দিদি। কিন্তু এত সকালে? ক'টা বেজেছে?

ঘরের জানলা-দরজা ভেজানো, আকাশের আলোর চেহারা ধরা যাচ্ছে না, ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়িটা দেখল। চমকে উঠল।

ন'টা বাজে।

চমকে উঠল, কিন্তু উঠে পড়ল না। অলস কান পেতে শুয়ে রইল।

আর সেই কানে এসে ঢুকতে লাগল, 'যাই বল মা, এবার কিন্তু তোমার মেয়ের ওপর একটু রাশ টানা উচিত। হোক বন্ধুর বাড়ি, তাহলেও, রাত বারোটায় বাড়ি ফিরবে—'

অমলার গলা শোনা যায়, 'আহা, খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে আমোদ করে সিনেমা যাবে বলে গিয়েছিল তো।'

দিদির প্রখর গলা মুখর হয়ে উঠছে, 'তা বেশ, যা করেছে করেছে, আর অত স্বাধীনতা দিও না বাপু যতই হোক মেয়ে। কখন কার সঙ্গে কি ঘটিয়ে বসবে কে জানে।'

অমলার হাসি শুনতে পাচ্ছে ইলা।

অমলা বলছেন, 'আমরা মেয়ে অমন নয়। তোকে কি আমি কম স্বাধীনতা দিয়েছিলাম? তুই ঘটিয়েছিলি কিছু?'

দিদির গলা একটু খাদে নেমেছে, তবে নীলার খাদের গলাও পাশের বাড়ি থেকে শোনা যায়, এই যা। নীলা বলছে, 'আহা, সে তো আরও পাঁচ-সাত বছর আগে গো। যত দিন যাচ্ছে, তত বুকের পাটা বাড়ছে ছেলেমেয়েদের। তোমার জামাই বলছিল, কে নাকি বলেছে ওকে, একটা ফরসা মতন ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে মুকুল কেবিন না কোথায় চা খেতে দেখেছে।'

আবার অমলার হাসি শোনা যায়, 'সে তো বাপু রাতদিনই দেখা যায়, সবাইয়ের ঘরে ঘরেই। মেয়ে বলে কি আর কিছু আটক বাঁধন আছে আজকাল? মেয়ে ছেলে সমান হয়ে উঠেছে।'

নীলা বলে ওঠে, 'সমান হয়ে উঠেছে বলেই তো সমান নয় মা! বিধাতাপুরুষ যে জব্দ করে রেখেছে। তার ওপর কলম চালিয়ে জিতে গিয়ে কত মেয়ে কত মরণ-বাঁচন কাণ্ড ঘটাচ্ছে, কত বিপদ ঘটাচ্ছে, খবর রাখ না তো।'

এবার আর অমলার হাসি শোনা গেল না।

অমলা গম্ভীর হয়েছেন।

বলছেন, 'তা কি করব বল? সেকালের মতো যখন ঘরে পুরে রাখা চলছে না, তখন ওদের

বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, ওদের সততার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ছেলেমেয়েকে রাতদিন সন্দেহ করতে হলে মানুষ বাঁচবে কি করে?'

ইলা কি মরে যাবে?

এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে?

ইলার ঘরে কোনো বিষ নেই? ঘুমের ওষুধ? মালিশের ওষুধ?

সেকালে নাকি রাজপুতের মেয়েরা 'বিষপাথরে'র আংটি হাতে রাখত, হঠাৎ ভয়ানক কোনো লজ্জা-অপমানের মুখোমুখি হয়ে পড়লে সেই আংটি চুষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

(এই রকম সব পড়েছে ইলা।)

তেমন আংটি কেন একটা নেই ইলার?

ইলার তাহলে আর মাকে মুখ দেখাতে হয় না।

না, ইলাকে কোনো মৃত্যুই বাঁচাতে পারল না।

ইলাকে অতএব সদ্য-ঘুম-ভাঙার ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হল।

বলতে হল, 'উঃ, কী সাংঘাতিক ঘুমিয়েছি বাবাঃ! মা, ডেকে দাওনি কেন? দিদি কতক্ষণ? জামাইবাবু আসেননি?'

অনেকগুলো কথা বলা ভালো।

অনেকগুলো কথার জালের মধ্যে মুখের চেহারাটা গোপন করা যায়।

নীলা বলে ওঠে, 'আর জামাইবাবু! জামাইবাবুর এখন শালীদায় দশা। গেছে সেই সেখানে, পাত্রের বাবার কাছে, কবে কনে দেখতে আসবে জানতে। জানে তো বাবা ভালোমানুষ, তেমন বলতে কইতে পারেন না।'

না, বাঁধ না দেওয়াটা পাগলামী।

ইলা হাই তুলে বলে ওঠে, 'তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ওসব এখন হবে-টবে না, ছাড়।'

নীলা অবশ্য এটাকে কপট বৈরাগ্যই ভাবে।

কারণ পাত্রর ফটো যে তার ছোটো বোনটিকে 'মেরে' রেখে দিয়েছে; এ তো নিশ্চিত কথা।

তাই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নীলা, 'ন্যাকামী রাখ, বিয়ের যেন বয়স হয়নি বাছার, তাই আমাদের মাথা খারাপ দেখছেন। কেন, ফটোটা অপছন্দ হয়েছে?'

ইলা ঠোঁট উলটে বলে, 'ফটো আমি দেখিইনি।'

নীলা আর একবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'ওঃ, তাই তো, ফটোটা দেখেইনি! আর দর বাড়াতে হবে না, ঢের হয়েছে। কাল ওরা আসতে পারে—'

'দিদি, ভালো হবে না বলছি। রিসার্চটা শেষ না হলে—'

নীলা গম্ভীর হয়।

বলে, 'তোদের জামাইবাবু কি একটা নিরক্ষরের ঘরে সম্বন্ধ করছে তোর? তাই বিয়ে হলেই রিসার্চ বন্ধ হয়ে যাবে তোর? শিক্ষিত পরিবার, তাদেব মেয়েরাও এম-এ বি-এ পাস! ছেলের এক বোনও তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। খুব শিক্ষিত পরিবার।'

শিক্ষিত পরিবার।

তাদের মেয়েরাও সব এম-এ বি-এ পাস।

ইলার চোখের সামনে সম্বুদ্ধর বিদ্বেষ-বিদ্দিষ্ট মুখটা ভেসে ওঠে, 'আমাদের বাড়ির কথা আর তুলো না। অর্ধশতাব্দী পূর্বের মনোভাব নিয়ে কাল কাটাচ্ছেন তাঁরা দু-চোখে ঠুলি এঁটে।'

ইলার কণ্ঠে অবশ্য নীরবতা।

নীলা আবারও বলে, 'ওরা বিয়ের জন্যে ব্যস্ত। কারণ ছেলে আবার মাস আষ্টেক পরে আমেরিকায় চলে যাবে। অবিশ্যি বউ নিয়েই যাবে। মা-বাপের ইচ্ছে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে নিয়ে, এই ক'টা মাস সাধ-আহ্লাদ করা। এমন সম্বন্ধ আর জুটবে চট করে?'

ইলাকে কষ্ট করে হাসতে হয়।

আর সেই কষ্ট হাসির সঙ্গে বলতে হয়, 'তোমার যা উৎসাহ দেখছি দিদি, মনে হচ্ছে তোমার বিয়েটা হয়ে গেছে বলে আপশোস হচ্ছে।'

'মা শুনছ! শুনছ তোমার ছোটোমেয়ের কথা?'

নীলা বকছে, হাসছে, 'একটা কড়া বর, আর জাঁদরেল শাশুড়ি হচ্ছে তোর উপযুক্ত।'

দিদি এলেই বাড়িটা সরগরম হয়। হাওয়ায় আনন্দ ভাসে।

কারণ দিদি সুখী।

কিন্তু দিদি ভীষণ জেদীও। এই বিয়ে নিয়ে যখন লেগেছে, উঠে পড়ে চেষ্টা করবে। গোড়াতেই তবে মূলোচ্ছেদ করা উচিত।

কিন্তু কখন? কোন্ অবসরে?

কিভাবে পাড়বে কথাটা? ঝপ করে? বিনা ভূমিকায়? বলবে 'বিয়ে বিয়ে করে অস্থির হয়ো না দিদি, সে-কাজটা আমি তোমাদের জন্যে রেখে দিইনি।'

নাঃ! হচ্ছে না।

তবে কি ভূমিকা করে?

'দিদি, একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। মাকে তো বলতে সাহস হচ্ছে না, তোমাকেই বলি—'

বলল।

কিন্তু তারপর? দিদির আর জামাইবাবুর ঘৃণার চোখ থেকে কোথায় সরে যাবে ইলা। মা-বাবার সামনে কি করে মুখ তুলে দাঁড়াবে? ছোটো ভাই রমুটা পর্যন্ত হয়তো ঘৃণার দৃষ্টিতে চাইবে ছোড়দির দিকে।

ইলা যদি প্রেমে পড়ে গিয়ে ব্যক্ত করত সেই 'পড়ে যাওয়ার' খবর, ইলার জন্যে বিরক্তি জমে উঠতে পারত, কিন্তু ঘৃণা নিশ্চয় নয়। ইলা তা করেনি। ইলা নিজের জন্যে সঞ্চয় করেছে ঘৃণা, করেছে তাদের কাছ থেকে, যারা ইলাকে প্রাণতুল্য ভালোবাসে।

একটু পরেই ইলার বাবা এলেন বাজার করে।

রবিবারের বিশেষ বাজার।

রবিবারে দুপুরের খাওয়াটা এখানেই খায় দিদি-জামাইবাবু। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ওর আর নড়চড় নেই।

ইলার বাবা ভোরবেলা বাজারে চলে যান, বেছে দেখে পছন্দ করে কিনে নিয়ে আসেন মাছ-তরকারি মেয়ে যা ভালোবাসে, জামাই যা ভালোবাসে।

এত স্নেহ নীলা-ইলার বাবার।

এতদিন এমন স্পষ্ট করে অনুভবে আসেনি ইলার। ওই শান্ত স্বল্পভাষী মানুষটার মধ্যে কী অগাধ স্নেহসমুদ্র! খুব একটা অবস্থাপন্ন অবস্থা নয় বাবার, তবু সন্তানদের কোনোদিন বুঝতে দেননি সে-কথা। নীলা ইলা রমু যখন যা প্রয়োজন সব পেয়েছে। বিশেষ করে ইলা।

দিদির তো আই-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তবু তত খরচের দায় ছিল না।

ইলার জন্যে বাবা কত খরচ করে চলেছেন। এম-এ পড়ল, রিসার্চ করছে, একদিনের জন্যে বাবার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে শোনেনি ইলা 'আর পারা যাচ্ছে না।'

অথচ ইলার বরাবরের সহপাঠিনী দীপা?

বাবা তার কত বড়োলোক, তার পোশাক-পরিচ্ছদ আর টিফিন দেখে তাক লেগে যেত এদের।

কিন্তু বইখাতা কিনতে হলেই নাকি তার মা-বাপ খেপে উঠতেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির নামে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করতেন, এবং অন্য মেয়েদের কাছ থেকে পুরানো বই কিনতে পাওয়া যাবে কি না তার সন্ধান নিতে বলতেন মেয়েকে।

ইলার বাবা চিরদিন মাসকাবার হলেই নিজে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইলুবাবু, তোমার কি কি চাই?'

বাবার ইলুবাবু তার প্রতিদান দিল বাবাকে।

বাবাকে দেখে মন কেমনের বাষ্পে বুকটা উথলে ওঠে ইলার।

আর হঠাৎ আজই প্রথম এমন স্পষ্ট করে মনে হল, এই সমস্ত কিছুর বদলে আমি কী পেলাম? এই অগাধ স্নেহ-সমুদ্র, এই ভালোবাসায়-ভরা মাতৃহৃদয়। এই আমার চিরদিনের পরিবেশ, আর—আমার চিরদিনের সুনাম, এতগুলোর বিনিময়ে?

প্রেম?

এই সমস্ত কিছুর পূরণ হবে সেই প্রেমে? সম্বুদ্ধর আছে তেমনি প্রেম? প্রেমের শক্তি?

আর কিছুক্ষণ পরে হেমন্ত এল।

বলল, 'ইলা, ভাগো। তোমরা উপস্থিতি এখানে নিষ্প্রয়োজন।'

ইলা বলল, 'নিষ্প্রয়োজন কাজই তো সর্বদা করে থাকি আমরা জামাইবাবু!'

'তবে শোন বিয়ের গল্প। কান পেতে শোন।...বুঝলেন মা, ইলার ছবি দেখেই ওদের মতো হয়ে গেছে, বলছিল, আর কি দরকার নিয়মমাফিক কনে দেখায়? আমিই বললাম, তা হোক, ও কোনো কাজের কথা নয়, চোখে দেখে যান একবার।...ছেলেকেও নিয়ে আসুন, দু-পক্ষেরই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হয়ে যাক।'

ছেলে।

মানে, সেই ছবির মানুষটা।

না না, এভাবে ইলা ঘটনার স্রোতে ভেসে যেতে পারবে না।

ইলা জামাইবাবুকে বলবে।

বলবে সকলের আড়ালে। এই একটা জায়গাই তবু সহজ মনে হচ্ছে। যাক, এখন সকলের সামনেও তো সম্মতি লক্ষণের লক্ষণ দেখানো যায় না। তাই বকে উঠে বলে, 'ধন্যবাদ জামাইবাবু, আপনাদের রুচিকে ধন্যবাদ। এখনও ওই পচা-পুরনো ঘৃণ্য প্রথাটাকে কি করে যে বরদাস্ত করেন আপনারা! ছিঃ!'

হেমন্ত অবশ্য এই 'ছিঃ'তে বিচলিত হয় না। হেসেই ওঠে বরং। বলে, 'এখনও যখন সেই পচা-পুরনো ঘৃণ্য প্রথায় দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই, সেই পচা-পুরনো সেকেলে প্রথায় বালিশে মাথা রেখে ঘুমোই, বরদাস্ত করতে বাধে না, তখন এ-সব ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোকে বড়ো করে দেখে লাভ কি?...বিয়ে হেন ব্যাপার, নিজের চোখে একবার দেখে নেবে, এটা কি খুব অস্বাভাবিক?'

'একবার চোখে দেখলেই সব বুঝে ফেলা যায়?'

হেমন্ত একবার নীলার দিকে কটাক্ষপাত করে, 'জীবনভোর দেখলেই কি বুঝে ফেলা যায়? বোঝাবুঝিটা তুলে রাখতে হয় বিবাহ-পরবর্তী কালের জন্য। বোঝাবুঝি সারাজীবন।...তুমি যদি কারও সঙ্গে প্রেম করে দু-চার বছর কাল পূর্বরাগ চালিয়ে যাও বুঝতে পারবে তাকে?'

ইলা কেঁপে ওঠে।

একি সাধারণ তর্ক-যুক্তির কথা? না, কোনো উদ্দেশ্যমূলক কথা? জামাইবাবু কি সব জেনে

ফেলেছেন? কিন্তু তাই কি? তাহলে জামাইবাবু তাঁর বন্ধুর ভাইপোর সঙ্গে এ-সব কথা চালাচ্ছেন কেন?

নাঃ, সাধারণ তর্কেরই কথা।

ওই যে বলেই চলেছেন জামাইবাবু ইলার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি না ফেলেই।

বলছেন, 'পারা যায় না। যতক্ষণ না তুমি তার স্বার্থের সঙ্গে মুখোমুখি হচ্ছ, তার আটপৌরে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছ, পাঁচ বছর মেলামেশা করলেও বুঝতে পারবে না তাকে। অতএব ও তোমার গিয়ে শীতকালে ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো একবার চোখ-কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়াই ভালো।'

ইলা ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলে, 'তারপর ''ভাগ্য'', কি বলুন?'

এই স্বভাব ইলার, শ্লেষাত্মক বচনে মনোভাব প্রকাশ। বিশেষ করে জামাইবাবুর সঙ্গে।

ঝগড়া। কেবল ঝগড়া চলে।

জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া না করলে দিনটাই বৃথা যায় ইলার।

কিন্তু কিছুদিন থেকে নিজেই কেমন ভিতরে ভিতরে অপ্রতিভ হয়ে গেছে ইলা। ঝগড়া জমাতে পারে না।

প্রেমে পড়ে বুঝি কথার তীক্ষ্নতাও হারিয়ে ফেলেছে সে।

প্রেমে পড়েও ততটা নয়, ওই রেজিস্ট্রির ব্যাপার ঠিক হয়ে গিয়ে পর্যন্ত। অথচ ইলার জানাশুনো বেশ দু-চার জন মেয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়ে অবলীলায় হাসছে খেলছে বেড়াচ্ছে। আসল কথা উপাদান।

সকলের উপাদানে সব কিছু খাটে না। ছেলেবেলায় ইলা একবার বাবাকে লুকিয়ে কুলপি বরফ খেয়েছিল। খাবার পর থেকেই উথলে উথলে কান্না উঠেছিল ইলার বুক থেকে, মাথার ভিতর থেকে, বাবা বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই হাউ-হাউ কেঁদে বলে ফেলেছিল ইলা বাবাকে, 'বাবা, আমি কুলপি বরফ খেয়েছি।'

সেই উপাদান।

তবু এখন জোর করে পুরনো সহজ কৌতুকের অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনে। বলে, 'তারপর ভাগ্য, কি বলুন?'

হেমন্তও জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়? তারপর ভাগ্য, আবার কি? তবে হ্যাঁ, যারা তোমার হিতৈষী, যারা তোমার প্রিয়জন, তাদের শুভেচ্ছার ওপর একটু আস্থা রেখ।'

'জামাইবাবু আজ রেখেছেন।'

'পাগল, রাগ কিসের!' হেমন্ত হাসে, 'তুমি অবশ্য ভেবেছিলে রাগিয়ে দিয়ে কাজ পণ্ড করে দেবে—সেটি হবে না।'

হল না পণ্ড।

আরও বহুবিধ কথার পরও সেই কথাই স্থির রইল। কাল কনে দেখবে ওরা।

তবে কি আর সেই ঘাড় গুঁজে বসে, ভয়ে ভয়ে বরপক্ষের বিটকেল বিটকেল সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া? না, অতটা নয়। ভদ্রলোক বেড়াতে আসার মতো আসবে, ইলা বাড়ির মেয়ে হিসেবে, স্বচ্ছন্দ গতিতে চা-খাবার এগিয়ে দেবে, এই পর্যন্ত।

ইলার আপত্তি? মানছে কে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব একটা আপত্তিই কি করল ইলা?

না ইলা ভাবল যাক গে এটুকু একবার দেখাই যাক! হাজার লোকের সামনে বেরোচ্ছি, দু-একটা লোক এলই বা বাড়িতে। বেরোলাম বা তাদের সামনে। ক্ষয়ে যাব না তো।

বরং সম্বুদ্ধকে খেপাবার একটা বিষয়-বস্তু পাওয়া যাবে।

নিজে থেকে আর যাব না ওর কাছে—এ সঙ্কল্প করেছিল ভুলে গেল। ভাবতে লাগল হোক কালকের মজাটা, তারপর আচ্ছা করে রাগানো যাবে।

এতক্ষণ পরে মন কেমন করল সম্বুদ্ধর জন্যে। বেচারা!

ওর কি কাল কম কষ্ট হয়েছে? নেহাত অসুবিধেয় আছে তাই।

দাদারা আছে সম্বুদ্ধর, এবং বড়দার প্রকাণ্ড একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে। সেইটির জন্যেই আরও জ্বালা। অতবড়ো ভাইঝি পড়ে থাকতে নিজে বিয়ে করল সম্বুদ্ধ, এত স্বার্থপরতা নাকি কেউ ক্ষমা করবে না।

অথচ নিজেরাও কিছু কম স্বার্থপরতা দেখাচ্ছেন না।

তারপর ইলা স্পন্দিত হতে লাগল, এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার আশায়। আবার হাসলও মনে মনে।

যাক, কিছুই তো হয়নি আমার। কোনো পরিচিত অনুষ্ঠান। এ-একটা হয়ে যাবে তবু। কনে দেখা।

কুমকুম বিবেকের দংশনে দগ্ধাচ্ছিল।

বেচারী ইলা!

সারারাত বাইরে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ি ফিরে না জানি কী অভ্যর্থনা জুটেছিল তার ভাগ্যে। সম্বুদ্ধ কি সঙ্গে গিয়ে লুকোচুরির পালাটা সাঙ্গ করে ফেলেছে?

নাকি ইলার মা-বাবা এই অনিয়মের মূর্তি দেখে শাসনে আগুন হয়ে উঠেছিল। গিয়ে খবর নেবার সাহস হল না অথচ। তার চেয়ে সম্বুদ্ধর বাসায় যাওয়া সোজা।

সেদিনই পারল না। পরদিন সন্ধ্যায় গেল।

আর সম্বুদ্ধর মুখে প্রকৃত ঘটনা শুনে গালে হাত দিল।

'রাতেই ফিরিয়ে দিয়ে এলে তুমি তাকে? বলিহারী! এত কাণ্ড, এত ইয়ে করবার দরকার কি ছিল তাহলে?'

সম্বুদ্ধ লজ্জা পেল।

নিজের মান বাঁচাতে অনৃতভাষণের আশ্রয় নিল। বলল, 'আর বল না। যা অস্থিরতা করছিল। আশ্চর্য ভয়।'

'তুমি একটা কাওয়ার্ড।' অসীম বলে ওঠে, 'আমি বলব, তোমার এখন বিয়ে করা উচিত হয়নি। নিজেরই যখন দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

সম্বুদ্ধ বলে, 'ভালো লাগছিল না। না করে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।'

'এখন খুব স্বস্তি পাবে? আকণ্ঠ পিপাসা, সামনে অগাধ সমুদ্র, কিন্তু লবণাক্ত।'

'করা যাচ্ছে কি! ইলা যে একবারে মা-বাপের ভয়ে—'

'তুমিও দাদা-বউদিদের ভয়ে—'

'সেটা ভয় নয়, বিতৃষ্ণা।'

'ফলাফল একই। ক্রমশ ইলারও তোমার প্রতি বিতৃষ্ণা আসবে দেখ।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, মেয়েরা কাপুরুষ পুরুষকে ভালোবাসতে পারে না। বরং বর্বরকে ভালোবাসবে, অসভ্যকে ভালোবাসবে, তবু তোমার মতো কাপুরুষকে নয়। যাক, তুমি কলকাতা থেকে বিদায় হচ্ছ কবে?'

'ওই তো, ওইখানেই তো মুশকিল। অফিস তো ছাড়তে চাইছে না।'

'তুমি ছাড়বে।'

'বলছে মোটা ইনক্রিমেন্ট দেবে।'

'কেন, লোক আর জুটছে না তাদের?'

'দেখছি তো তাই।'

অসীম বিরক্ত ভাবে বলে, 'কিন্তু এখান থেকে বিদেয় না হলে বউকে তো তুমি নিয়ে যেতে পারছ না?'

'সেই তো চিন্তা।'

কুমকুম বলতে যাচ্ছিল, 'চিন্তাটা কিছু আগে হলে হত না? এখন—'

বলা হল না।

ইলা এসে হাজির হল।

ইলার মুখে-চোখে প্রসাধনের আভাস। আর মুখের চেহারা কৌতুকের।

কুমকুম হই হই করে ওঠে, 'যাক, বেঁচে আছিস তাহলে? উঃ আমি তো ভাবলাম—'

'কি ভাবলি?'

'না, মানে ভাবিনি কিছু। কি ভাবা উচিত ছিল তাই ভাবছিলাম।'

'চমৎকার! তা, এতক্ষণ কিসের মজলিশ হচ্ছিল?'

'তোর নিন্দের। তুই যা লোমহর্ষণ কাণ্ড করেছিস পরশু—'

'পরশু?' ইলা বলে, 'পরশু আমি কিছু লোমহর্ষণ কাণ্ড করিনি। তবে হ্যাঁ, আজ একটা করে এলাম বলে বটে।' মিটিমিটি হাসতে থাকে ইলা।

জ্বালাবে। খুব জ্বালাবে ইলা সম্বুদ্ধকে। শোধ নেবে সে-রাত্রের।

অসীম বলে, 'ব্যাপারটা কি? ঘটনাটা প্রকাশ করে এলে?'

'উঁহু। সম্পূর্ণ উলটো। কনে দেখা দিয়ে এলাম।'

'কি? কি দিয়ে এলে?'

সম্বুদ্ধ বলে ওঠে।

ইলা হেসে হেসে বলে, 'কনে দেখা দিয়ে এলাম। বাবার কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ের জন্যে বাবা অবশ্যই ভাবিত হচ্ছেন, এবং বাবার জ্যেষ্ঠা কন্যা অবশ্যই তাতে সাহায্য করবেন। যোগ ফল এই। পাত্র আর পাত্রের বাবা দুজনে এসে দেখে গেলেন। আমিও গুড গার্লের মতো তাঁদের চা দিলাম, খাবার দিলাম, দু-চারটে প্রশ্নেরও যে উত্তর দিলাম না তা নয়। তাঁরা তো একেবারে বিগলিত! বাসায় ফিরে না মরে থাকে।'

কুমকুম রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ঠাট্টা করছিস না সত্যি বলছিস?'

'বাঃ, খামোকা এমন অদ্ভুত ঠাট্টা পাবই বা কোথায়?'

'এসবের বিপদটা বুঝছিস না? এরপর আর এগোতে গেলে—'

'তা, আর এগোনো চলবে না সেটাই বলতে এলাম। এখন ও বলুক কি করবে?'

সম্বুদ্ধ এতক্ষণ সিগারেট ধ্বংসাচ্ছিল, আর বোধ করি ভিতরে ভিতরে নিজেও ধ্বংস হচ্ছিল। এবার ব্যঙ্গ তিক্তকণ্ঠে বলে, 'আমাকে কি করতে বলা হচ্ছে? দাবি ছেড়ে দিতে?'

'থাম্ বুদ্ধু!' অসীম বলে, 'ওর অবস্থাটা বুঝছিস না? বাড়িতে যদিও কিছু না বলে, বা বলতে না পায়, স্বভাবতই এ পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। কেলেঙ্কারি আরও কতদূর গড়াবে তাও বোঝ! যা এইবেলা তুই ওর বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলগে!'

সম্বুদ্ধ তীক্ষ্ণ হয়।

বলে, 'ইলার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না খুব একটা চিন্তাকাতর। বরং যেন বেশ মজা পেয়েছে মনে হচ্ছে। পাত্রটি বোধ হয় খুব সুকান্তি?'

ইলা ভালোমানুষের গলায় বলে, 'তা সত্যি ফার্স্টক্লাস চেহারা। কথাবার্তা? অতি চমৎকার। বিদেশ-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, বিয়ে করে শীঘ্রই আবার বউ নিয়ে বিদেশে যাবে। অবস্থা ভালো, শিক্ষিত পরিবার, মা-বাপ আছেন, কলকাতায় বাড়ি, গাড়ি—'

ইলা যেন আর কাকে পাত্রের সন্ধান দিচ্ছে। কথা শেষ করতে পারে না।

সম্বুদ্ধ রূঢ় গলায় বলে, 'খুব আপশোস হচ্ছে এখন তাই না?'

ইলা আরও অমায়িক গলায় বলে, 'খু-ব।'

'দুঃখের বিষয়, এক্ষুনি ডাইভোর্স কেস আনতে পারবে না—'

'সেই তো দুঃখ!'

'থাম ইলা', কুমকুম ঝঙ্কার দেয়, 'এখন বসল ইয়ার্কি মারতে। ভেবে দেখছিস না আর বেশি গড়ালে তোর বাবার মুখটা কি রকম পুড়বে? পছন্দ যখন হয়েছে তখন—'

'পছন্দ?'

ইলা হেসে উঠে বলে, 'আজ তো লোকটা রাতে ঘুমোতেই পারবে না।'

'হুঁ। তা, লোকটার নামটা কি?'

'ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রনীল মুখার্জী।'

মুখার্জী।

সম্বুদ্ধ ঘোষ যেন ক্রমশই হেরে যাচ্ছে। তার মুখে সেই পরাজিতের কালো ছাপ। তার গলায় ঈর্ষার কুটিলতা।

'থাকে কোথায়?'

'সর্বনাশ? ওইটি বলছি না। কে জানে গুণ্ডা লাগিয়ে ফিনিশ করবার তাল করবে কি না।'

'ঝগড়া রাখ ইলা।'

কুমকুম সামলায়। সামলেই থাকে সখীরা। শ্রীরাধিকার আমল থেকে।

পরামর্শের কথা পাড়ে সে। এবং অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর ঠিক হয় কালই সম্বুদ্ধ ইলাদের বাড়ি যাক। পরিচয় দিক। ইলার বাবা যদি মেনে নেন ব্যাপারটা উত্তম, আর যদি অপমান করেন ইলাকে, নিয়ে চলে আসবে সম্বুদ্ধ। তারপর যা হয় হবে। অসীমের বাড়ি রয়েছে, কুমকুমের বাড়ি রয়েছে। অবশ্য এ-সব ফ্যাসাদ কারও অভিভাবক-কুলই পছন্দ করেন না, তব তাড়িয়ে দিতে তো পারবেন না।

আর সম্বুদ্ধর যদি এখানের অফিসেই উন্নতি হয়, থেকে যাক। খুঁজুক একটা ফ্ল্যাট। মা-বাপের নাকের সামনে সুন্দর করে সংসার করুক ইলা।

কাল? কাল থাক।

ইলাই বাধা দেয়।

বলে, 'কাল নয়। দেখি চেষ্টা করে যদি জমিটা কিঞ্চিৎ প্রস্তুত করে রাখতে পারি।'

'যাই করো দেরি করো না—' অসীম বলে, 'ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। এর সঙ্গে তোমার বাবার মান-সম্মান জড়িত।'

ঠিক এই কথাই ঘণ্টা দুই পরে নীলা বলে, 'সব কিছুই ছেলেখেলা নয় ইলা, মনে রাখিস এর সঙ্গে তোর জামাইবাবুর মান-সম্মান জড়িত। উনি উপযাচক হয়ে তাদের বলেছেন, এখন আবার গিয়ে বলবেন, আমার শালী এখন বিয়ে করতে রাজী নয়।' তুই পাগল হতে পারিস, উনি তো তা হতে পারেন না।'

'বাঃ, পড়া শেষ না করে বিয়ে করব না খুব একটা অযুক্তির কথা বুঝি?'

'খুব। ওটা এমন কিছু বাধা নয়। তাছাড়া এত যদি ইয়ে, আগে কেন বললি না?'

'বলেছিলাম দিদি।'

বলেছিল।

কিন্তু তেমন করে বলেনি, সে-কথা নিজেই জানে ইলা। কোথায় যেন একটা বাসনার কাঁটা ছিল বিঁধে। নইলে সকাল থেকে মনটা এমন উদ্বেলিত হচ্ছিল কেন?

কেন অমন পরিপাটি প্রসাধনে রাজী হয়েছিল? আর কেন লোকটা যখন এল স্পষ্ট সহজ চোখে তাকাতে পারেনি তার দিকে? সে কি শুধুই একটা অস্বাভাবিকতার অস্বস্তি? না, ভালো লাগার সুখ? অথবা ভালো লাগার অসুখ?

'আমি জানি না।' নীলা বলে, 'যা বলবার নিজেই জামাইবাবুকে বল গে।'

'ওরে বাবা, রক্ষে কর।'

'তবে বল গে যা মাকে, বাবাকে। তবে জেন, তোমার বিয়ের মধ্যে আর নেই আমরা।'

হঠাৎ হেসে ফেলে ইলা। বলে 'আচ্ছা।' তারপর চলে আসে।

হেমন্ত আসতেই নীলা ফেটে পড়ে।

'শুনেছ তোমার শালীর আদিখ্যেতার কথা? এখন বলছে রিসার্চ শেষ না করে বিয়ে করবে না।'

হেমন্ত অফিসের পোশাক ছাড়তে ছাড়তে অম্লান গলায় বলে, 'শালীরা অমন বলে থাকে।'

'জানি না। এখনকার মেয়েদের বোঝা ভার। কী দরকার তোমার এর মধ্যে থাকবার?'

হেমন্ত সহজ পোশাকে সুস্থ হয়ে বলে, 'কেন মাথা খারাপ করছ? মেয়েরা অমন দর বাড়িয়েই থাকে। তুমি যেমন শাড়ির দোকানে গিয়ে দামী শাড়িখানায় হাত বোলাতে বোলাতে বল, মোটে কিন্তু বেশি খরচ করবে না, সস্তা দেখে একখানা—'

'বলি আমি ওই কথা?'

'সত্যভাষণের অপরাধে ফাঁকির হুকুম না দিলে বলব, বলে থাকো। তোমার বোনও—'

'আমি তোমার মতো অত ইয়ে নই। আমি বলে দিয়েছি, যা বলবার মাকে বল গে।'

হেমন্ত আরামের হাই তুলে বলে, 'বলবার কিছু নেই। তারা পাকা দেখার দিন ঠিক করে গেছে।'

'পাকা দেখার দিন ঠিক করে গেছে।'

উৎফুল্ল অমলা মেয়েকে দেখেই বলে ওঠেন, 'ওরা যেতে না যেতেই কোথায় বেরোলি? বলে গেলি না?'

'আর বলা। তুমি কি আর তখন আমায় চিনতে পারতে মা?'

অমলা হেসে ফেলেন।

অমলা বলেন, 'তা যা বলেছিস। ওরা তো যাবার সময় পাকা দেখার দিন ঠিক করে গেল।'

অমলার মুখে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না।

অমলার কণ্ঠে সপ্তস্বরা বেণুর ঝঙ্কার।...

'এমন ভদ্র জীবনে দেখিনি বাপু। এই যে হেমন্ত, নিজে সে খুব ভালো। বিয়ের সময় কাকা-টাকা খুব ইয়ে করেছিল। কিন্তু এরা যেন আলাদা জাতের। কনের বাপ হাতজোড় করবে, তা নয় ওরাই করছে, 'তাড়াহুড়ো করে আপনাদের খুব অসুবিধেয় ফেলেছি, বুঝছি কিন্তু বড্ড ইচ্ছে'—আমি তোর বাবাকে বলেছি, ওরা ভদ্র, ওরা কিছু চাইবে না, তা বলে তুমি যেন কমে সেরো না। ধারকর্জ করেও সাধ-আহ্লাদ করবে।...তা, গোছালো মানুষ তো। হাসলেন। বললেন, 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, এ কি আর আমার মাথায় ছিল না?' তুই বাপু আর অমন রোদে রোদে হটহটিয়ে বেড়াস নে। যখন-তখন বেরনোটাও বন্ধ কর। চেহারাটা একটু ভালো কর।'

অমলার মুখে-চোখে আহ্লাদের ঝিলিক খেলে।

এই অমলার মুখের ওপর বলবে ইলা, 'থামো মা, পাগলামী রাখো। এ-বিয়ে হবে না। বিয়েই দিতে হবে না তোমার ছোটো মেয়ের। বাবার জমানো টাকা খরচ করতে হবে না।'

বলা যায় না।

ইলার মুখ দিয়ে বেরোয় ইলার অভাবিত একটা কথা। 'আর চেহারা ভালো হয়ে কী হবে? খারাপেই তো—'

চলে যায় তাড়াতাড়ি।

অমলা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে। যৌবনবতী মেয়ের মধ্যেই তো মা জন্ম নেয় নতুন করে। ইলা অমলার সার্থক স্বপ্ন।

ঘরে এসে বসে পড়ে ইলা।

তবে কি বাবাকে বলবে?

বাবা কি বলবেন? আহত পশুর দৃষ্টি নিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকবেন তাঁর সরল ছেলেমানুষ মেয়ের দিকে? না কি, গম্ভীর ক্লান্ত গলায় বলবেন, 'আর ক'দিন আগে বললে আর একটা ভদ্রলোকের কাছে অপদস্থ হতাম না।'

মুখোমুখি বলা যাবে না।

চিঠি লিখে বলতে হবে। তবু ইলার হাত দিয়েই আসুক আঘাত। সম্বুদ্ধর কথাবার্তা নরম নয়, কি বলতে কি বলে বসবে।

কাগজ টেনে নিয়ে বসল।

আর পরমুহূর্তেই একটা অদ্ভুত চিন্তা পেয়ে বসল ইলাকে।

ওরা তো খুব ভদ্র। অমলা বলেছেন জীবনে এমন ভদ্র দেখেননি। সেই ভদ্রতার কাছেই সাহায্য চাক না ইলা। চিঠি সেখানেই পাঠাক। লিখুক 'আপনি ভদ্রলোক, তাই আপনাকে জানালাম। গল্প-উপন্যাসে তো এমন হয়।'

অমলা যেন আহ্লাদের সাগরে ভাসছেন। কত ভয়, কত ভাবনা ছিল, সব কেটে গিয়ে ঝলমলে সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে আকাশে, বিচলিত না হয়ে পারছেন না অমলা।

আর কি চায় মানুষ?

আর কি চাইবার আছে?

কৃতী ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভদ্র আর মার্জিত ছেলে। তার উপর ব্যবহার-সভ্যতা-কুলশীল-মান-অবস্থা সব প্রথম শ্রেণীর। চাওয়ার অতিরিক্তই।

না, অমলা ভাবতে পারেন না এ-সব পাওয়ার অনেক আগে 'প্রেম' চেয়ে বসে আছে ইলা। তাই ভাবেন, ইলার অনেক ভাগ্য।

তা ভাগ্য পরম বইকি।

ইলার সেই চিঠি তো আর কারও হাতেও পড়তে পারত। অথবা অপমানিত বর ঘৃণায় রাগে সে-চিঠি রাষ্ট্র করতে পারত। কদর্য এক কালিতে ভরিয়ে দিতে পারত ইলার মুখ।

অন্তত একখানা কড়া চিঠির মাধ্যমে বলতে পারত ইলাকে, 'এ-আক্কেলটুকু বড়ো দেরিতে প্রকাশ করা হল না?'

নাঃ, সে সব কিছুই হল না। শুধু অমলার আদর্শ ভদ্র ভাবী জামাই ভয়ানক একটা অভদ্রতা করে বসল। বলে পাঠাল 'মেয়ে পছন্দ হয়নি তার।'

মেয়ে পছন্দ হয়নি!

দুটো সংসারের ওপর অতর্কিতে একখানা থান ইঁট ফেলল যেন ইন্দ্রনীল।

নির্বিবাদে পাকা দেখার আয়োজন হতে দিয়ে, এই দু-তিন দিন ধরে হাস্যমুখে দিদি-বউদিদের হাস্য-পরিহাস হজম করে, এখন বলছে কিনা মেয়ে পছন্দ হয়নি।

ইন্দ্রনীলের বাড়িতে বলল, 'পাগল হয়ে গেছে।' বলল, 'মাথাটা আমাদের হাতে করে কাটালি? কি করে বলব এ-কথা?'

ইন্দ্রনীল শান্ত গলায় বলল, 'কি আর বলবে। বল গে তখন বুঝতে পারেনি।'

'কিন্তু এখনই বা নতুন কি বুঝলি তুই?'

'কি জানি। কেমন যেন ভালো লাগছে না এখন।'

'কনের বাপের ওপর কি বাজটা ফেলা হবে, ভেবে দেখেছিস?'

'ভাবছি তো। কিন্তু মনকে ঠিক করতে পারছি না।'

অতএব ঠিক করা বিয়েটাই বেঠিক হল।

বাজ ফেলা হল করেন বাপের মাথায়।

ফেলতে হল হেমন্তকেই।

বজ্রাহত দম্পতির সামনে বসে থাকতে হল মাথা হেঁট করে।

জামাইবাবুর হেঁটমুণ্ড এই প্রথম দেখল ইলা। তারপর শুনতে পেল জামাইবাবুর বিষণ্ণ গলা।

'ছেলের বাড়ির সবাই তো তাজ্জব হয়ে গেছে।—বলছে, ওকে দেখে মনে হচ্ছে কে যেন ওকে মন্ত্রাহত করে ফেলেছে। নইলে ইন্দ্রর পক্ষে সম্ভব এমন অসম্ভব অভদ্রতা করা?'

না, সম্ভব নয়।

ইন্দ্র বাড়ির সেরা রত্ন। সেই রত্ন নিজের মুখে চুনকালি মেখে ইলাকে রক্ষা করছে চুনকালির হাত থেকে।

কেন? ইলার কে সে?

কেউ নয়, ইলা শুধু তার ভদ্রতার দরজায় হাত পেতেছিল। অথচ সম্বুদ্ধ নিজের গায়ে আঁচটি নিচ্ছে না।

বাড়িতে নিন্দিত হবে বলে, বিয়ের কথা ফাঁস করছে না।

ইলা দাঁতে দাঁত চেপে মঞ্চ থেকে সরে যায়। অমলা ভীত কণ্ঠে বলেন, 'দেখ বাবা হেমন্ত, মেয়ে আবার এ-অপমানে কি করে বসে।'

'না, করবে আর কি?'

হেমন্ত শুকনো মুখে বিদায় নেয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে এই প্রথম।

ইলা নিজের ঘর থেকে টের পায় সব।

ইলার বাবা দালানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন আর মাঝে মাঝে অমলাকে বলছেন, 'দেখ, তুমি মন খারাপ করো না, এ একরকম ভালোই হল, আগেই বোঝা গেল। মানুষ যে কত ছদ্মবেশী হতে পারে, তার নমুনা দেখে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল।'

অমলা কথা বলেন না, অমলা স্তব্ধ হয়ে ভাবেন, কিন্তু এ ছদ্মবেশের প্রয়োজন কি ছিল তার? কী দরকার ছিল ইলার দিকে অমন আলো-জ্বালা চোখে চাইবার? অমন প্রসন্ন স্মিত হাসি হাসবার?

অমলা ভেবেই নিয়েছিলেন, মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেছে সে। হঠাৎ এ কী অদ্ভুত কথা!

মেয়ে পছন্দ হয়নি।

পাত্র-পক্ষের আর সবাই যে-কথা শুনে মাথায় হাত দিয়েছে, সেই কথা উচ্চারণ করেছে সেই পাত্র? অমলা ভাবতে ভাবতে অবশ হয়ে গেলেন।

অমলা আজ রান্না করলেন না।

অনেকটা রাত্রে মেয়ের ঘরে ঢুকলেন অমলা, এক গ্লাস দুধ আর দুটো মিষ্টি নিয়ে।

আস্তে বললেন, 'খেয়ে নে। শরীরটা তেমন ভালো লাগছিল না, আজ আর রান্না করতে পারিনি।'

ইলা উঠে বসে।

আস্তে বলে, 'রমু কি খেল?'

'ও দুধের সঙ্গে পাঁউরুটি খেয়ে শুয়ে পড়েছে।'

'বাবা?'

আরও আস্তে, আরও সন্তর্পণে উচ্চারণ করে ইলা।

'উনিও দুধই গেলেন শুধু। খিদে-তেষ্টা আর নেইও তাঁর। মানুষের দুর্ব্যবহার দেখে পাথর হয়ে গেছেন। কতখানি বিশ্বাস করেছিলেন—'

'মা!'

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইলা।

চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, 'মানুষ যে কতখানি বিশ্বাসঘাতক হতে পারে তার নমুনা দেখতে অন্য কোথাও যেতে হবে না মা তোমাদের, নমুনা তোমাদের ঘরের মধ্যেই আছে। সেই বিশ্বাসঘাতক, জোচ্চোর দিনে দিনে মাসে মাসে ঠকিয়ে আসছে তোমাদের—'

'কে? কে? কার কথা বলছিস?'

অমলা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, 'কিসের বিশ্বাস?'

'সব, সব কিছুর মা! তোমাদের ভালোবাসার, তোমাদের সম্ভ্রমের, তোমাদের সুনামের, তোমাদের বংশের পবিত্রতার। সব কিছুর বিশ্বাস নষ্ট করেছি আমি। আর ছদ্মবেশে তোমাদের মায়া-মমতা স্নেহ-ভালোবাসা অন্ন-বস্ত্র সব নিয়ে চলেছি।'

অমলা ইলার বিছানার ওপর বসে পড়েন। রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'কি বলছিস তুই ইলা?'

'যা বলছি সব ঠিক মা। এতদিন তোমাকে জানাতে পারিনি, বার বার বলতে গেছি, পারিনি মা। তোমাদের দেওয়া বিয়ে করবার উপায় নেই আমার।'

'উপায় নেই! উপায় নেই!'

অমলা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বলেন, 'উপায়ের বাইরে চলে গিয়েছিস তুই? বল তবে, খুলে বল কতখানি কালি মাখিয়েছিস আমাদের মুখে।'

'রেজিস্ট্রি করেছে শুধু। অন্য কিছু নয়?'

হেমন্ত হাল্‌কা গলায় বলে ওঠে, 'এতে তো তোমাদের দু'হাত তুলে নাচবার কথা।'

নীলা বিরক্তির ঝঙ্কার তোলে, 'নাচবার কথা?'

'নিশ্চয়! ভেবে দেখ, এটা না হয়ে অপরটা হলে? তাতেও নিরুপায়তা ছিল। তার ওপর ছিল চুনকালি, এতে তো আর মুখে চুনকালি পড়ছে না।'

'পড়ছে না?'

'নো! নো! এ হেন ঘটনা এখন হরদম চলেছে—'

'আর এই যে ঘোষ না কি একটা হতচ্ছাড়া, এতে মা-বাপের প্রাণ ফেটে যাচ্ছে না?'

'ফাটবে না, ফাটার কারণ নেই—এটা ভাবলেই সহজ হয়ে আসে। অবশ্য আমি বলছি না খুব একটা সুন্দর কিছু হয়েছে। আগাগোড়া ব্যাপারটাই না ঘটলে ভালো হত। কিন্তু এও ঠিক, আমরাই

অবস্থাকে অসুন্দরে পরিণত করি।—অনুমোদন পাবে না, এই ভয়েই এই সব কাণ্ড করে বসে ছেলেমেয়েগুলো।'

'পাবেই বা কেন? সব প্রেমে পড়াই অনুমোদনযোগ্য?' নীলা রেগে রেগে বলে।

'আহা, দেবতাটা অন্ধ, এ তো চিরকেলে কথা।'

'অতএব উচিত হচ্ছে সেই অন্ধের হাতে ভাগ্য সমর্পণ করে না বসে, যারা চোখ-কানওলা তাদের হাতে ভাগ্যটাকে রাখা।'

'সে তোমার বলা অন্যায়। এই জগতে চরে বেড়াবে অথচ কোথাও কোনোখানে হোঁচট্ খাবে না, এতটা আশা করা যায় না।'

নীলা গম্ভীরভাবে বলে, 'হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হোঁচট্ খাব, বাড়ি, সংসার, মা-বাপের মুখ ভাবব না, এমনই যদি অবস্থা হয়, তবে আর শিক্ষার মূল্য কি? শিক্ষার সঙ্গে সংযমের কোনো সম্বন্ধ নেই?'

হেমন্ত হাসে।

বলে, 'কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে 'প্রেম' বস্তুটার যে মহা আড়ি, এমন কথাও নেই।'

'সে কথা বলছি না,' নীলা ক্রুদ্ধ গলায় বলে 'আমি বলছি লুকোচুরি করবে কেন? প্রেমে পড়েছিস পড়েছিস, সাহসের সঙ্গে এসে স্বীকার কর। মানুষ তো ইঁদুর ছুঁচো নয় যে গলি খুঁজে খুঁজে আত্মগোপন করবে?'

হেমন্ত হাসে।

বলে, 'তা অবশ্য ঠিক বলেছ। তবে কি জানো, দেশটার যে আকাশে-বাতাসে ভীরুতা। ভয়..ভয়...ভয়ই গ্রাস করে রেখেছে সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তিকে। আগে ছিল বাপের ভয়, সমাজের ভয়, লোকলজ্জার ভয়, এখন সেগুলো ঘুচেছে, জায়গায় এসে হাজির হয়েছে অভাবে পড়বার ভয়, অসুবিধেয় পড়বার ভয়, ঝঞ্ঝাট পোহাবার ভয়।...এতেই কণ্টকিত। অবিশ্যি এক্ষেত্রে আরও একটা ভয় আছে, সেটা হচ্ছে গুরুজনের স্নেহ হারাবার ভয়। সেই ভয়ের থেকেই—'

'তা আর নয়—'

নীলা প্রায় ধমকে ওঠে, 'বকো না। গুরুজন ভেবে তো অস্থির বাছারা। তাদের স্নেহের ধার ভারী ধারছে!'

হেমন্ত গম্ভীর হয়।

বলে, 'না নীলা, সত্যি! সেটাই বোধ করি প্রধান কারণ। ঊর্ধ্বতনেরা যেদিন অধস্তনদের প্রেমে পড়ায় আঘাত পাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করবে, ঘটনাটাকে সহজ আর স্বাভাবিকতম ব্যাপার বলে গ্রহণ করতে শিখবে, সেদিন থেকেই লুকোচুরি বন্ধ হবে।'

'হবে! বলেছে তোমায়।'

নীলা হেমন্তর কথা মানতে রাজী নয়।

হেমন্ত হেসে ফেলে বলে, 'একটা কাল ছিল জান অবশ্যই, যখন ছেলে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভালোবাসলেও গুরুজনেরা আহত হতেন। ছেলে যদি তাঁদের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীকে একখানা শাড়ি কি সামান্যতম কিছু উপহার দিত, তাহলে অপমানের আঘাতে জর্জরিত হতেন তাঁরা। সে-অবস্থা এখন আর নেই, এটাও থাকবে না। শালী যে রেজিস্ট্রিটা করে ফেলেছে, এর জন্যে আমি ওর বুদ্ধির তারিফ করি। যাক, এবার একটা 'ফর-শো' বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাক।'

নীলা ভুরু কোঁচকায়।

'ফর শো বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাক?'

'নিশ্চয়।'

'রুচি হবে?'

'হবে না কেন? কত অরুচিকর ব্যাপারকে মাথায় তুলে নিতে হচ্ছে রাতদিন, এ তো বরং আহ্লাদের, মজার।'

নীলা ঠিকরে ওঠে।

নীলা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বাবা আবার ঘরের কড়ি খরচ করে বিয়ে দেবেন ওর?'

হেমন্ত ওর রাগ দেখে হো হো করে হাসে।

'কেন নয়? ইতর জনের পাওনাটা মাঠে মারা যাবে নাকি?'

'কেউ আসবে না এ-বিয়েতে।'

'সবাই আসবে।'

'এত ইতরজন কেউ নেই আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে।'

'আরে, ওটা তো কথার কথা। মিত্রজনই না হয় বলা যাক। তবে নেমন্তন্নটা মাঠে মারা যেতে দেখলেই বরং অখুশি হবে তারা।'

না, মাঠে মারা যাওয়ার রেওয়াজ আর নেই। ছেলেমেয়ের নির্বুদ্ধিতা, ছেলেমেয়ের কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যতা, ছেলেমেয়ের অসাবধানতা, সব কিছুকে ঢেকে নিয়ে, ঘটনাটার একটা সভ্য চেহারা তো দিতে হবে! সভ্য আর সুন্দর। সেটাই সামাজিক মানুষের দায়।

সম্বুদ্ধ ঠিকই বলত, ওইখানেই গার্জেনরা জব্দ।

জব্দ বইকি! শুধু মমতার কাছে নয়, এই সভ্যতা শোভনতার কাছেই জব্দ। ঘরের মেয়েটা কোনো কিছু না হঠাৎ একদিন আর একটা ঘরে 'ঘর' করতে শুরু করে দিল, এই কটু দৃশ্যটার হাত এড়াবার জন্যেই বিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে বসেন তাঁরা। হাস্যকর ছেলেমানুষী, তবু তাই দিয়েই সম্ভ্রম বজায় রাখা। তা, নায়ক-নায়িকার অলাভ কিছু নেই এতে। ডবল বিয়ের সুযোগে যথারীতি পাওনাগুলো এসে যায় হাতে।

মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, এদের হৃদয়ে সাধ-আহ্লাদও তো থাকে!

চিরদিনের সংস্কারে লালিত আজন্মসঞ্চিত সেই সাধগুলি এই হাস্যকর ছেলেমানুষীর মধ্য দিয়েই বিকশিত হবার পথ পায়।

চির-আদরিণী মেয়েটা, একটু ভুল করে ফেলেছে বলে শূন্য হাতে বিদায় নেবে?

তার যে ভারি শখ ছিল অনেক শাড়ি-গহনার। কবে যেন কার বিয়েতে সোনালী ফুলদার সবুজ বেনারসী দেখে মোহিত হয়েছিল, উচ্ছ্বসিত হয়েছিল কার গলায় যেন সেকেলে গড়নের পুষ্পহার দেখে। তার কিছু হবে না? তাছাড়া ছোটোখাটো আরও কত বাসনাই তো ব্যক্ত করে থাকে মেয়েরা, তাদের বস্তুলুব্ধ বাসনাময় হৃদয়ের।

'বিয়ের সময় হবে, বিয়ের সময় দেব,'—বলে ঠেকিয়ে রাখে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণী মা।

সেই ঠেকিয়ে রাখাটা বিঁধতে থাকে কাঁটার মতো মায়ের প্রাণে।

বিয়ের সময় তাই মাকে আর ঠেকানো যায় না। তা, সে-বিয়ে যদি প্রহসনও হয়।

'প্রহসন বইকি—'

তাই বলেছিলেন ইলার বাবা। আর বলেছিলেন, 'সত্যিই কি প্রয়োজন এই প্রহসনের? অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যা-সম্প্রদানের কার্য করতে বসব আমি হেমন্ত?' চির-শান্ত, চির-সংযত মানুষটার কণ্ঠে এই জ্বালার সুর শুনে অপ্রতিভ হয়েছিল হেমন্ত। তবু ঘাড় চুলকে বলেছিল, 'ফার্স কেন বলছেন? ছেলেবুদ্ধিতে একটা বাঁদরামী করে ফেলেছে—'

'এম-এ পাস করেছে ইলা, একুশ বছর বয়েস হয়ে গিয়েছে ওর হেমন্ত। ছেলেমানুষ বলা মানে মনকে চোখ ঠারা।'

'তবু দেখুন ছেলেমানুষ ছাড়া আর কি? এমনটা করেছে কেন নইলে?'

ইলার বাবা পায়চারি করতে করতে বললেন, 'আমার এখন কি মনে হচ্ছে জান হেমন্ত, সেই তোমার বন্ধুর ভাইপো, বোধ করি কোথাও থেকে কানাঘুষো কিছু শুনে থাকবে, তাই—'

'অসম্ভব নয়।'

'সেই ছেলেটিকে যে আমি আপন করতে পেলাম না, এ-দুঃখ আমার চিরকাল থাকবে হেমন্ত।'

হেমন্ত স্বভাবগত কৌতুকে বলতে যাচ্ছিল এমন একটি সোনারচাঁদ জামাই থেকেও আপনার দুঃখমোচন হবে না? বলতে পারল না। ওই আহত বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

তবু চলতে লাগল প্রহসনের আয়োজন।

পাকা দলিলটা নিতান্তই কাঁচা চেহারা নিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে রইল প্রহসনের নায়ক-নায়িকার গোপন ভাণ্ডারে।

পাঁচজনে জানল শুধু 'প্রেম'।

চমকাবার কিছু নেই, চমকালও না কেউ। বড়োজোর নিমন্ত্রণপত্রে পাত্রের নাম শ্রীমান সম্বুদ্ধ 'ঘোষ' দেখে ইলার বাবার ব্রাহ্মণ আত্মীয়রা একটু মুখ টিপে হাসল মাত্র।

নিমন্ত্রণে আসবে না, এ-কথা ভাবতেও পারল না কেউ।

ভাববে কোন্ সাহসে? কার ঘরের দেয়ালে সিঁধ কাটা হচ্ছে, অথবা হবে, কে বলতে পারে?

সম্বুদ্ধর কাছে পরদিন গিয়েছিল ইলা, গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছি, যাও, গিয়ে বল গে। ন্যাকামী করবে না, ঔদ্ধত্য করবে না, আর একবার বিয়ে দিতে চাইলে আপত্তি করবে না—বুঝলে?'

'আর একবার বিয়ে!'

ইলা আরও গম্ভীর হয়, হ্যাঁ। চিরাচরিত প্রথায় যথারীতি বিয়ে। সেটাই করতে হবে। যেতে হবে আমার জন্যে টোপর পরে জাঁতি হাতে নিয়ে। এতেও যদি বল 'বাড়িতে জানতে পারবে, তাহলে আমার সঙ্গে এই শেষ।'

সম্বুদ্ধ বিদ্রূপ করে বলে, 'তারপর? যথারীতি বিয়েটা সেই ভাগ্যবান ইন্দ্রনীল মুখার্জীর সঙ্গে নাকি?'

'থামো! তার নাম মুখে এনো না তুমি।'

'উঃ, মেজাজ যে সপ্তমে! যথারীতি বিয়েতে আমার আর আপত্তি কি? বরং তো লাভই। শ্বশুরের মেয়েটাই পাচ্ছিলাম শুধু শ্বশুরের দেওয়া যৌতুক, শ্বশুরবাড়ির আদর, এগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম। সেগুলো উপরি পাওনা হচ্ছে। বাবাকে বল, ঘড়িটা যেন ভালো কেনেন।'

'হাসতে তোমার লজ্জা করছে না?'

'কী মুশকিল, লজ্জা করবে কেন? বরং খাট-বিছানা আলমারি-আয়না সব কিছুর আশাই তো করছি সাগ্রহে।'

ইলা তীব্রস্বরে বলে, 'পাবে। সব কিছুই পাবে সম্বুদ্ধ ঘোষের জন্যে হোক না হোক, মা-র ছোটো জামাইয়ের জন্যে সবই গেছে গড়তে।'

তা গেছে।

অনুষ্ঠানের ত্রুটি হচ্ছে না সত্যিই।

খাতার মাঝখানের বিদীর্ণ অধ্যায়ের পৃষ্ঠাটা উলটে ফেলে নতুন অধ্যায়ে চোখ ফেলা হয়েছে।

নীলা রাগ ভুলে মহোৎসাহে বিয়ের বাজার করে বেড়াচ্ছে, অমলা নতুন নতুন ফর্দ লিখছেন।

ইলার বাবা সেকরার দোকানে আর ফার্নিচারের দোকানে হাঁটাহাঁটি করছেন, হাঁটাহাঁটি করছেন বরের বাড়ি।

সম্বুদ্ধর দাদা-বউদি এখন আর নিরপেক্ষ নেই, বিয়ের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। আর সম্বুদ্ধকেও এই সেকেলে বাড়ির সেকেলেপনার মধ্যেই বেশ মিশে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

গায়ে-হলুদ দিতে বসে মামাতো বউদি যখন দু'গালে হলুদ লেপে দিল, তখন সম্বুদ্ধ ছিটকে বেরিয়ে গেল না, শুধু একটু কোপ দেখাল। দধিমঙ্গলের চিঁড়ে-দই নিয়ে ওরা যখন হাসাহাসি করল, সম্বুদ্ধ হাসতে হাসতে ওদের মাথায় মাখিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

এই সব দিদি-বউদিদের যে সম্বুদ্ধ 'মানুষ' বলে গণ্যই করত না, সেটা এখন অন্তত মনে পড়ল না।

আবার বড়োবউদি তাঁর মস্ত বড়ো আইবুড়ো মেয়েকে বরযাত্রী পাঠাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না, দাদা উপবাস করে নান্দীমুখ করতে আপত্তি করলেন না।

সকলেরই যেন মনোভাব, হাতছাড়াই তো হয়ে গিয়েছিল, সেই হাতছাড়া বস্তু আবার যদি হাতে ধরা দিয়েছে তো আমোদটা ছাড়ি কেন?

আর ইলা?

সে-ও কি সম্বুদ্ধর মতোই লজ্জার বালাই ত্যাগ করে উৎসবে মাতে? দিদির সঙ্গে মার্কেটিং করতে যায়? মায়ের সঙ্গে গহনার প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করে?

নাঃ, ইলা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে।

ইলার এই স্তিমিত মূর্তি দেখে ইলার মাকে ইচ্ছার অধিক উৎসাহ দেখাতে হয়, ইলার বাবাকে মৌনব্রত ভাঙতে হয়। আর ইলার জামাইবাবুকে নতুন নতুন ঠাট্টা আমদানী করতে হয়।

জলি মেয়েটা মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছে, এও তো দেখা যায় না।

অবশেষে আসে সেই দিন।

মহলার শেষে অভিনয়ের।

'বিয়েতে কোনো অনুষ্ঠান হল না', এ-আক্ষেপ আর থাকে না ইলার।

সেই একটা রোদ্দুরের দুপুরে যত কিছু আক্ষেপ জমে উঠেছিল তার, সব বুঝি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পণ করেছে ইলার সংসার, ইলার পরিজন।

প্রদীপ জ্বেলে নতুন বেনারসী শাড়ি পরে 'আইবুড়ো-ভাত' খায় ইলা, কোরা লালপাড় শাড়ি পরে গায়ে-হলুদ নেয়। কলাতলায় দাঁড়িয়ে সাত এয়োর মঙ্গলকামনা জড়ানো হলুদমাখা সুতো জড়ায় হাতে, অধিবাসের পিঁড়িতে গিয়ে ঘাম-ঘাম হলুদ-হলুদ মুখ নিয়ে, যে পিঁড়িতে অনেক শিল্পকলার নমুনা দেগে রেখেছে অমলার এক ভাইঝি।

ইলার বাবা মেয়েকে পাশে বসিয়ে অধিবাস দ্রব্যের কল্যাণস্পর্শে পবিত্র আর মহান করে তোলেন তাকে। পবিত্র আর পরিচিত অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হতে থাকে পরপর।

সন্ধ্যায় কনে-চন্দন পরে ইলা, পরে ফুলের মালা। পরে ওর অনেকদিনের পছন্দর রুপোলী তারাফুল দেওয়া লাল বেনারসী শাড়ি। 'মোনামুনি' ভাসিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় ইলার গলায়, ইলা স্পন্দিত রুপোলী বুক নিয়ে চণ্ডীপুঁথি কোলে নিয়ে বসে থাকে অনেকগুলো সুখী দম্পতির নাম লেখা আর একখানা ভারী পিঁড়িতে। এই পিঁড়ি নিয়েই সাতপাক ঘোরাবে সবাই ইলাকে নিয়ে বরকে ঘিরে ঘিরে।...

শাঁখ বাজে একসঙ্গে একজোড়া, নারীকণ্ঠ বাজে উলুধ্বনি হয়ে, সানাই বাজে করুণ সুরে।

আলো জ্বলে, বাড়ি সাজানো হয়, ফুলের গন্ধে আর সেন্টের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

নিমন্ত্রিত-নিমন্ত্রিতারা সন্ধ্যার আগে থেকেই দলে দলে আসতে শুরু করেন, তাঁদের উদ্দাম কলকাকলী আর শাঁখ-উলুর শব্দ একত্রিত হয়ে উৎসব সমারোহের চেহারা আনে। সামিয়ানা-খাটানো ছাদ থেকে ভেসে আসে চপ আর লুচি ভাজার গন্ধ।...

চিরদিনের দেখা 'বিয়ে বাড়ি' মূর্তি ধরে দেখা দেয় ইলার সামনে।

তারপর আসে বর।

চিরদিনের বরবেশে।

চেলির জোড় আর টোপর পরে, নতুন গরদের পাঞ্জাবীর উপর গোড়ে মালা চাপিয়ে।

'স্ত্রী-আচারে'র কলহাস্যময় মঙ্গলকর্মের মধ্যে নাপিত এসে জাঁকিয়ে দাঁড়ায়...বর-কনের মাথার উপর নতুন উড়ুনির ছাউনি বিছিয়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে 'ভালোমন্দ লোক থাকো তো সরে যাও—'

এই গালাগালির ছড়া আওড়ানোর মধ্যেই নাকি 'শুভদৃষ্টি' করার রেওয়াজ।

শুভদৃষ্টি?

তা, সে-প্রহসনও হয় বইকি। হবে না কেন, নাটক যখন মঞ্চস্থ করা হয়েছে, তখন পঞ্চাঙ্কের কোনো ভঙ্ক, নবরসের কোনো রস, বাদ দেওয়া তো চলতে পারে না।

বাদ দেওয়া চলতে পারে না, তাই ইলার বাবা উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে অগ্নি-নারায়ণ সম্মুখে নিয়ে বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে উচ্চারণ করেন কন্যা-সম্প্রদানের পূত পবিত্র বৈদিক মন্ত্র।

তারপর বাসরে এসে বসে বর-কনে।

হোটেলের ভাড়া-করা বহুজন-ব্যবহৃত অশুচি শয্যা নয়, অমলার অনেক সাধ আর পছন্দ দিয়ে তৈরি নতুন রাজশয্যা।

এই শয্যা, এই ফুল, এই মাধুর্য, এই সৌন্দর্য, এই পবিত্রতা সব কিছুই তাদের হাত থেকে এসেছে, যাদের এরা সন্দেহ করেছে, ঘৃণা করেছে, বিদ্বেষ করেছে।

দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্রসাধনের বিনিময়ে সঞ্চয় করে তোলা অর্থের রাশি জলস্রোতের মতো ব্যয় করেছেন তাঁরা এই একটি রাত্রির উৎসবকে কেন্দ্র করে। যে-উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু বাড়ির সেই আটপৌরে মেয়েটা। এত মূল্যবান ছিল সে? তা, এই অকাতর ব্যয়ের মধ্য দিয়েই তো মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার প্রকাশ, পিতৃহৃদয়ের অনুচ্চারিত স্নেহবাণীর সোচ্চার ঘোষণা।

বস্তু দিয়েই তো বস্তুকে বোঝানো। দৃশ্য দিয়ে অদৃশ্যকে অনুভবে আনা। তাই না ঈশ্বরকে উপলব্ধিতে আনতে মাটির প্রতিমা!

হয়তো এরপর থেকে অমলা বাজার-খরচ কমিয়ে দেবেন, কমিয়ে দেবেন গোয়ালার খরচ। হয়তো ঘরে সাবান কেচে ধোপার খরচ কমাবেন।

নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত শাড়ি কিনবেন না একখানাও, প্রয়োজনের উপযুক্ত ওষুধপত্র।

আরও বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধনের কাঠবিড়ালী দিয়ে আবার বেঁধে তুলতে চাইবেন এই একরাত্রির বেহিসেবী অপচয়ের সমুদ্র।

অথচ এত সব কিছু না করলেই পারতেন অমলারা। অমলা আর অরবিন্দ। অনায়াসেই গা ঝেড়ে দিয়ে বলতে পারতেন, 'এত পারব না।'

বলতে পারতেন, 'কেন করব এত?'

ভাবতে পারতেন, ওই দশ-বারো হাজার টাকা থাক তাঁদের ভবিষ্যতের সংস্থান। মিথ্যে একটা নাটকের পিছনে ঢালব কেন?

তা বলেননি, তা ভাবেননি।

বাসর-জাগানীরা বিদায় নিলে সম্বুদ্ধ চুপিচুপি বলে, 'দেখেশুনে বুঝতে পারছি, এযাবৎ বড়োদের ওপর সন্দেহ করে অন্যায়ই করেছি।'

ইলার কাছ থেকে হয়তো উত্তরের প্রত্যাশা করে। না পেয়ে একটু পরে বলে, 'কি বল ঠিক বলছি না? সন্দেহ না করলে এত দিনের এত কষ্ট পাওয়ার কিছুই পেতে হত না। ভয় করে, সন্দেহ করে, নিজেরাই ঠকেছি এতদিন বোকার মতো।'

তবু উত্তর আসে না ইলার কাছ থেকে।

এখনও বোকার মতোই কাজ করে সে।

পুরানো পরিচিত অভ্যস্ত বরের সামনে কাঠ হয়ে বসে থাকে, অপরিচিত বরের কনের মতো।

'কি হল? নতুন হয়ে গেলে নাকি?'

সম্বুদ্ধ বিরক্তির হাসি হেসে নিরঙ্কুশ দাবির হাতে ঈষৎ আকর্ষণ করে ইলার কমনীয় তনুখানিকে। কিন্তু কমনীয় তনু নমনীয়তা হারাল নাকি? কই, আবেশে বিগলিত হয়ে এলিয়ে পড়ছে না তো সেই প্রিয় পরিচিত বক্ষে? যে-বক্ষ এতদিন অধিকারে এসেও দুর্লভ ছিল।

কাঠ হয়ে বসে আছে।

সম্বুদ্ধ বিরক্তিটাকে প্রখর না করে পারে না।

বলে, 'মনে হচ্ছে যেন চিনতে পারছ না। খুব খারাপ লাগছে বুঝি?'

ইলা এই বিরক্তির কণ্ঠে সচেতন হয়।

ইলার মনে পড়ে, নাটকের প্রধান নায়িকার ভূমিকা তার। তাই এবার একটু আবেশের হাসি হেসে বলে, 'রাগ কেন? এতরকম নতুনের মধ্যে একটু বুঝি নতুন হতে ইচ্ছে করে না?' বলে।

যদিও জানে ইলা, নতুন হতে দেবে না সম্বুদ্ধ। রাখতে দেবে না সামান্যতম সহিষ্ণুতার দূরত্ব। একেবারে নিবিড় করে পেতে চাইবে এখনি, এই মুহূর্তে। ইলা সেই প্রবল দাবি ঠেকাতে পারবে না।

তবু ইলা অনুভব করছে সেই নিবিড় বন্ধনের সুর যাবে কেটে। একখানা ছবির মুখ অবিরত ছায়া ফেলবে ইলার মনে, ইলার জীবনে।

হয়তো সারা জীবনে।

ইলা কি কোনোদিন একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতে পারবে সেই আহত মুখের ছবির ভাবনা? যে-মুখ ছোট্ট একটি চিঠির কয়েকটা লাইনের নির্লজ্জ আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েও সেই নির্লজ্জতার কলঙ্ককালি নিজের ললাটে মেখেছে শুধু ইলাকে এক অপরিসীম লজ্জা থেকে বাঁচাতে।

ইলার চলার পথে পথে যত মুখ আসবে যাবে, তাদের মধ্যে কি প্রত্যাশার দৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখবে না ইলা?

আর ইলার জীবনে, কারণে অকারণে, হেলায় খেলায় যত নাম আসবে, ইলা কি তার মধ্যে খুঁজবে না সেই সুন্দর আর বিশেষ নামটা?

আর অবাক হয়ে ভাববে না, আশ্চর্য! এত লোকের ভিড় পৃথিবীতে, এত নামের ধ্বনি, তবু—!

—ঃ ঃ—

তত্তোধিক

আলোর শেষ কণিকাটুকুও গেল মিলিয়ে। ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চরাচর। থেমে গেল বিশ্বের সমস্ত গান। যে-গান সুর সংগ্রহ করেছে কোটি কোটি মানুষের কলরব আর পাখির কলস্বর থেকে, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস আর মর্মরিত অরণ্য থেকে, মহাসমুদ্রের গর্জন আর নদীর ঝিরিঝিরি থেকে; সুর সংগ্রহ করেছে গাড়ির শব্দ, যন্ত্রের শব্দ, মাটির গায়ে গাঁইতি শাবল আর লোহার গায়ে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ থেকে,—সে-গান আর কোনোদিন ওর কাছে সত্য হয়ে উঠবে না। ওর ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

নির্বাণহীন এক বয়লারের উত্তাপে তরল হয়ে যাওয়া রুপোর স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনন্তকালের পৃথিবীর ওপর দিয়ে, সে-স্রোত হার মেনে মাথা হেঁট করল শুধু ওই ঘুমন্ত চোখজোড়ার কাছে।

অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও আলোর জন্যে কী ব্যাকুল আকুতি ফুটে উঠেছিল ওর কণ্ঠস্বরে।

'জানলাটা খুলে দাও না, আলো আসুক।'

বিকৃত সেই স্বরটা একটা আর্তনাদের মতো আছড়ে পড়েছিল বাতাসের গায়ে, তার থেকে ঘরের মেঝেয়। অন্তত তাই মনে হয়েছিল কমলাক্ষর।

তারপর সেই শেষ একটা মোচড়।

'রাত্তির হয়ে গেল, আলো জ্বালছ না কেন?'

উঠতে চেষ্টা করেছিল, উঠতে পারেনি। আলোর জন্যে আকুলতাও করেনি আর। গত সন্ধ্যার মতো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খোঁজেনি—'কোথায় বসে আছ তুমি? আমি যে দেখতে পাচ্ছি না।'

কমলাক্ষ উঠে দাঁড়ালেন।

বসে থাকবার সময় নয়। এখন তো এই এতবড়ো বিপদের দায়িত্বটা সমস্ত নিতে হবে তাঁকে। উপায় কি, মানুষের চামড়া রয়েছে য়খন গায়ে। নিথর হয়ে যাওয়া মানুষটার দিকে তাকালেন একবার। অদ্ভুত রকমের অচেনা লাগছে।

কিন্তু অচেনা ছাড়াই বা কি? সাতটা দিন আগেও তো পৃথিবীর শত শত কোটি অদেখা লোকের দলেই ছিল ও। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে এসে কী আশ্চর্য রকম জড়িয়ে পড়লেন, ভেবে অবাক লাগছে কমলাক্ষর।

বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়, হোটেলওয়ালা। সম্পর্ক শুধু পয়সার লেনদেনে। তবু আর একটা হিসেবও রাখতে হয় বইকি। পৃথিবীর কাছেও একটা ঋণ থাকে যে মানুষের। মানুষ হয়ে জন্মানোর ঋণ।

কমলাক্ষ বিছানার পাশের টুলটা ছেড়ে উঠলেন। সদ্যমৃতের মাথার কাছে প্রায় মৃতের মতোই নিথর হয়ে বসেছিল যে-মানুষটা, তাকে উদ্দেশ করে আস্তে প্রায় অস্ফুটে বললেন, 'কোথায় কোথায় টেলিগ্রাম করতে হবে, তার ঠিকানাটা—'

পাথরের দেহে সাড়া জাগল না, শুধু পাথরের মুখে স্বর ফুটল, 'কোথাও না।'— একটা যান্ত্রিক স্বরে উচ্চারিত হল কথাটা।

'কোথাও না। মানে আপনাদের আত্মীয়স্বজনদের—'

যন্ত্রের মধ্য থেকে যন্ত্রের শব্দের মতোই ভাবহীন, আবেগহীন, নিতান্ত নির্লিপ্ত উত্তরটা কমলাক্ষকে বিমূঢ় করে দেয়। 'আমাদের কোনো আত্মীয় নেই।'

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কমলাক্ষ, সত্যিই বিমূঢ় হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

এরপর আর কোন্ প্রশ্ন করবেন?

তবু তো করতেই হবে। নইলে কী করবেন? একটা কোনো ব্যবস্থা তো করা চাই।

'এখানে কোনো কেউ চেনাশোনা—'

'এখানে?' পাথরের প্রতিমা মুখ তুলল এবার। বুঝি বা একটু হাসলই। তারপর বলল, 'এখানের বাসিন্দারা কেউ আমাদের মুখ দেখে না। শুধু আপনাদের মতো এই বাইরের বোর্ডারদের নিয়েই দিন চলে যায় আমাদের।' হঠাৎ আর একটু সত্যি হাসিই হাসল বোধ হয় ও। বলল, 'মানে চলে যেত।'

চলে যেত!

এরপর আর কিভাবে দিন চলবে, আদৌ চলবে কি না—সে-কথা জানা নেই ওর। কমলাক্ষ এই সাত দিনেও যার নাম জানেননি, জানবার চেষ্টাও করেননি। জানা দরকার একথা ভাবেনইনি।

এখনও ভাবলেন না। শুধু ভাবলেন, তাই তো! আমি কেবলমাত্র এদের 'প্রবাস বোর্ডিঙের' বাইরের বোর্ডার, তা ছাড়া আর কি?

কমলাক্ষ কি তবে এদের বিপদ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না? কমলাক্ষ এ-ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘর থেকে সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যাবেন? সম্ভব নয়?

একেবারে অসম্ভব? কমলাক্ষ তো জীবনে আর কখনও এই পলাশপুরে আসবেন না। ওই যে মানুষটা সম্পূর্ণ ভাবলেশশূন্য মুখ নিয়ে যান্ত্রিক স্বরে শুধু জানিয়ে দিল, ওদের কোনো আত্মীয় নেই, এখানে কেউ ওদের মুখ দেখে না, কমলাক্ষকেও তো জীবনে কখনও আর তাকে মুখ দেখাতে হবে না।

তবে কেন এই অনাসৃষ্টি অদ্ভুত অবস্থাটার মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন কমলাক্ষ?

কেন দাঁড়াচ্ছেন, কেন দাঁড়াবেন, সেকথা ভাবতে পারলেন না কমলাক্ষ। দাঁড়াতে হবেই, এই চরম সিদ্ধান্তটা জেনে নিলেন। তাই খুব ধীরে বললেন, 'আমি তো এখানের কিছুই জানি না। কোনো সমিতি-টমিতি আছে কি?'

'সৎকার সমিতি' কথাটা মুখে বাধল। শুধু বললেন 'সমিতি'।

ও এবার বিছানার ধার থেকে উঠে এল। তেমনি কেমন এক রকম হাসির মতো করেই বলল, 'আছে কি না আমিও ঠিক জানি না, দরকার হয়নি তো—তবে আমি বলি কি—নিজেরাই কোনো রকমে—'

নিজেরা! মহিলাটি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলেন নাকি?

স্পষ্ট সে-সন্দেহ প্রকাশ না করলেও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না কমলাক্ষ, বিস্ময়টা হয়তো বা একটু উত্তেজিতই হল। 'নিজেরা! নিজেরা মানে? বলছেন কি আপনি?'

মহিলাটির সর্বাঙ্গে এখনও সধবার ঐশ্বর্যরেখা, তবু ভয়ানক রকমের বিধবা বিধবা লাগছিল ওকে। ওর ঠোঁটের রেখায় যেন বালবিধবার শুষ্ক বিষণ্ণতা।

কমলাক্ষর মনে পড়ল ভদ্রমহিলা সেই পরশু সকাল থেকে এই দুদিন রোগীর বিছানা ছেড়ে ওঠেননি, জলবিন্দুটি পর্যন্ত মুখে দেননি। পুরো দু'রাত ঘুমোননি। তার ওপর এই দুর্ঘটনা। শুকনো তো লাগবেই।

কমলাক্ষ চোখ নামালেন। একটু বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা হল মনে হচ্ছে।

মহিলাটি অবশ্য কমলাক্ষর ওই দৃষ্টি আর দৃষ্টি নামানোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। নিতান্ত সহজভাবেই উত্তরটা দিলেন, 'তা ছাড়া আর কোনো উপায়ও তো দেখছি না। শ্মশান শুনেছি এখান থেকে বেশি দূর নয়। আমি আছি, করুণাপদ আছে, আর—' প্রায় স্পষ্টই হেসে উঠল ও এবার, 'আর আপনি তো আছেনই। আপনি তো আর চলে যেতে পারছেন না? তিনজন মিলে যা-হোক করে—'

'আচ্ছা আপনাদের এখানের লোকগুলো কী' কমলাক্ষ এবার বিস্ময়ের সঙ্গে একটু বিরক্তি প্রকাশ না করে পারেন না। 'মানুষ না জানোয়ার? এই রকম একটা বিপদের সময়ও—'

'এই রকম একটা বিপদই তো এই দীর্ঘকাল ধরে চাইছিল ওরা। চাইছিল অথচ পাচ্ছিল না, কত হতাশায় ছিল! এতদিনে যদি 'দিন' পেয়েছে তার সদ্ব্যবহার করবে না?'

কমলাক্ষ একটুক্ষণ থেমে থাকেন। থেমে থেমে বলেন, 'জানি না এমন একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার কারণটা কি আপনাদের! জানতে চেয়ে বিব্রত করতেও চাই না, শুধু বলছি—আপনার ওই সমস্যা-সমাধানের প্রস্তাবটা বাস্তব নয়। থাক ও নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামাবেন না, আমি বেরচ্ছি, যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই। কেবল আপনার ওই করুণাপদকে বলবেন, কোথাও থেকে কিছু ফুল যদি জোগাড় করে আনতে—'

'ফুল! ওঁর জন্যে ফুলের কথা বলছেন?'

এতক্ষণের ভাবশূন্য সাদাটে মুখটায় হঠাৎ যেন এক ঝাঁক রক্তকণিকা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, ঠেলাঠেলি করে।

কমলাক্ষ আর একবার চোখ নামান। শান্ত স্বরে বলেন, 'মৃতকে আর কি দিয়ে সম্মান জানানো যায় বলুন? পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে এইটুকুই তো তার শেষ পাওনা?'

নাঃ, বাসিন্দা এখানে খুব বেশি নেই। দু'চারজন রিটায়ার্ড ভদ্রলোক এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। হয়তো বা সস্ত্রীক, হয়তো বা একা। একারা বিপত্নীক কি সংসার-বিদ্বেষী সেকথা বলা শক্ত। অবসর গ্রহণের পর স্ত্রী-পুত্র-সংসারের সঙ্গে কিছুতেই বনে না, এমন লোকের সংখ্যা সংসারে বিরল নয়। হয়তো অমনোমত খাওয়া-দাওয়া নিয়ে হয়তো বা সংসারের খরচ-পত্রের প্রশ্ন নিয়ে। রিটায়ার করলে যে টাকা কমে যায়, সে-সত্যটা মানতে রাজী নয় অনেক মহিলাই।

তেমনি বাড়ির কর্তারা মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন করে বসবাস করে যান এখানে সুসময়ের তৈরি ইটকাঠের আশ্রয়টুকুর মধ্যে।

বাড়িগুলো সারানো আর হয়ে ওঠে না, দেওয়ালগুলো বালি ঝরা, রেলিঙগুলো মরচে ধরা, কার্নিশের কোণ ভাঙা, একদার ফুলবাগান শুকনো আগাছার জঞ্জাল, তবু তার মধ্যেই বেশ কাটান তাঁরা। কোনো একটা যাহোক মতো দেহাতি চাকর জোগাড় করে, তাকে দিয়ে দু'বেলা মুরগির ঝোল আর ভাত রাঁধিয়ে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেন, আর লাঠি একগাছা হাতে নিয়ে দুবেলা শহর প্রদক্ষিণ করে বেড়ান। আর সেই সূত্রে শহরে যে যেখানে আছে তাদের নাড়ির আর হাঁড়ির খবর নিয়ে বেড়ান।

অবশ্য এমনটা খুব বেশি সংখ্যায় নেই। সস্ত্রীকই আছেন অনেকে। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে গেছে, যে যার পথ দেখেছে, শেষ জীবন পরস্পরে পরস্পরের আশ্রয় হয়ে মফঃস্বলের বাড়িটিতে এসে বাস করেছেন। তাঁদের সংসারে অবশ্য লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, ইতু, ঘেঁটু থেকে শুরু করে মোচার ঘণ্ট, কচুর শাক, গোটাসিদ্ধ পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি নেই। তবে সময়েরও অভাব নেই। তাঁরাও অপরের জীবনের নিভৃতে উঁকি না দিয়ে পারেন না।

না করলে কি নিয়ে থাকবে? কর্মহীন জীবনকে উপভোগ করতে ক'জন জানে? ক'জন শিখেছে সে-আর্ট?

তা এ ছাড়া আর যত বাড়ি সবই প্রায় পড়ে থাকে বুকে এক-একটা ভারী তালা ঝুলিয়ে। পাছে জানলা-দরজাগুলো কেউ খুলে নিয়ে যায়, তাই নামকা ওয়াস্তে একটা করে 'মালি' নামধারী ফাঁকিবাজ ব্যক্তি থাকে। ছুটিছাটায় কখনও বাড়ির লোকেরা বাড়িতে এলে তবে তাকে বাড়ির ধারে কাছে দেখতে পাওয়া যায়। তখন সে ঘাস চাঁছে ভাঙা বেড়ার দড়ি বাঁধে, দেয়ালের উই ভাঙে।

পুজোয় সময় জায়গাটা ভরে ওঠে, রঙে লাবণ্যে কলরবে।

'প্রবাস বোর্ডিঙে'ও সে সময় চাঞ্চল্য জাগে। সেই তো মরসুম। নইলে সারা বছরে কে কত চেঞ্জে আসে! কমলাক্ষর মতো কে আসে গরমের ছুটিতে!

তা যারা থাকে, তারা 'প্রবাস বোর্ডিঙের' মালিক মালিকানির সঙ্গে মুখ দেখাদেখি রাখে না কেন, এও তো একরহস্য!

শুধু যে মুখ দেখে না তা নয়, খদ্দেরও ভাঙায়। অন্তত ভাঙাতে চেষ্টা করে। সে-কথা মনে পড়ল কমলাক্ষর পথ চলতে চলতে।

বেশিদিনের কথা তো নয় যে ভুলে যাবেন। মাত্র সাতটা দিন আগেই তো।

পলাশপুর স্টেশনে নেমেছিলেন কমলাক্ষ সুটকেসটা আর বেডিংটা নিয়ে। কলকাতা থেকে একটা বাড়ি মাসখানেকের জন্যে ভাড়ার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, মনটা তাই বড়ো নিশ্চিন্ত আর খুশি-খুশি ছিল। গরমের ছুটির একটা মাস থেকে যাবেন এখানে। সেই একটা মাসে কলেজের খাতা দেখা থাকবে না, ঝামেলা থাকবে না। শুধু খাবেন ঘুমাবেন আর বই পড়বেন।

পড়া তো হয় না। কত ভালো ভালো বই নীরব অভিযোগের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে কমলাক্ষর দিকে, যেন বলতে চায় মলাটটা পর্যন্ত ওলটাবার যদি সময় নেই তোমারি, কেন তবে কিনেছ আমাদের? কেন বন্দী করে রেখেছ তোমার শেলফের খাঁজে খাঁজে?

ওরা ঠিক টের পায় কমলাক্ষর অন্তরাত্মা কতখানি তৃষিত হয়ে থাকে, শুধু মলাট ওলটানো নয়, একেবারে ওদের ঘরের দরজা খুলে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ার জন্যে?

কিন্তু কোথায় সেই সময়?

কমলাক্ষর সমস্ত অবসরটুকু অবিরত টুকরো টুকরো করে কেড়ে নিয়ে চলেছে বন্ধুজন পরিজন, ব্যাগার খাটুনি, বাড়তি কাজ।

সুটকেসের সবটাই প্রায় বাছাই বাছাই বই ভরে নিয়ে চলে এসেছিলেন কমলাক্ষ। একজন বন্ধুর মাধ্যমে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে ফেলে। কলকাতা থেকেই বাড়ির চাবি দিয়ে দিয়েছে বাড়িওলা। তা ছাড়া আনন্দে বিগলিত আর বিনয়ে আনত হয়ে বলে দিয়েছে, 'সব আছে মশাই আমার বাড়িতে। চৌকী চেয়ার আনলা বালতি শিল-নেড়া—গেরস্তর যাবতীয় প্রয়োজন। তবু দেখুন ভাড়ায় আমি গলা কাটি না। নইলে উইথ ফার্নিচার বলে বিজ্ঞাপন লাগালে—যাক, গিয়ে দেখবেন—হ্যাঁ, অমুক বাবু ভাড়াটের সুবিধে অসুবিধে বোঝে কি না।'

তা বুঝেছিলেন কমলাক্ষ। হাড়ে হাড়েই বুঝেছিলেন।

স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশাটাকে ঠিকানা বুঝিয়ে বুঝিয়ে আর নিজে তার কাছ থেকে পথ বুঝে বুঝে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যখন ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছলেন, সূর্যদেব তখন টেবিলের ফাইল ঝেড়েঝুড়ে তোলবার তাল করছেন।

কমলাক্ষ তাড়াতাড়ি চাবি খুলে ফেলে অন্তত আলো জ্বালার ব্যবস্থাটা করে ফেলবেন ঠিক করে রিকশাটাকে দাঁড় করিয়ে তালায় চাবি লাগালেন।

কিন্তু দীর্ঘদিনের মরচে ধরার শোধ নিতেই বোধ করি তালা এবং চাবি অসহযোগিতা করে বসল। খুলতে পারলেন না কমলাক্ষ।

তবে চাবি খুলে তারপর ভিতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এমন অসুবিধে ঘটিয়ে রাখেনি বাড়িওলা। এখানে সেখানে জানলার কপাট সপাটে খুলে নামিয়ে রেখেছে বুদ্ধি করে।

হাঁ-করা সেই জানলার ফোকরে চোখ ফেলে দেখতে পেলেন কমলাক্ষ, মানে ঝুল আর মাকড়সার জালের জাল ভেদ করে যেটুকু চোখে পড়ল তা এই—তিনটে পায়ায় ইট লাগানো একপেয়ে একটা আটফাটা চৌকির ওপরে রড়্ভাঙা আলনার স্ট্যান্ড দাঁড় করানো, তার তারই পাশে মরচেয় কালো হয়ে যাওয়া একটা বালতি উপুড় করা।

ব্যস্। আর কোথাও কিছু না।

অথবা যদিও কিছু থাকে, যথা—জলের কলসী, শিল-নোড়া, মাকড়সার জালের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেগুলি আর কমলাক্ষর দৃষ্টিতে ধরা দিল না।

'উইথ ফার্নিচার' এই বাড়ির চেহারা দেখে মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কমলাক্ষ ফের রিকশায় উঠলেন। বললেন, 'চল, আবার স্টেশনে চল।'

রিকশাচালক বোধ করি অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারে, তাই প্রশ্ন করে জেনে নয়, বাবুর কী উদ্দেশ্যে আগমন, এবং জানান দেয়, এই বাড়ির বাড়িওলাটা পয়লা নম্বরের জোচ্চোর। বহুৎ লোককে এই রকম তকলিফ দেয়।...তা বাবু যখন ছুটি নিয়ে চেঞ্জে এসেছেন, ফিরে কেন যাবেন? থাকবার জায়গার সন্ধান সে দিতে পারে।

'কেন? কোনো হোটেলওয়ালার দালাল বুঝি তুই?' প্রশ্ন করেছিলেন কমলাক্ষ।

লোকটা জিব কেটেছিল। সে সেরকম লোক নয়। আর সেই হোটেলের মালিকও দালাল রাখবার মতো লোক নয়। বাবু নেহাত বিপদে পড়েছে বলেই দয়ার্দ্র হৃদয়ে খবরটা দিচ্ছে সে। তা বাবু সেখানে যেতে চায়, কোনো বাঙালিবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েও উঠিয়ে দিতে পারে! বাঙালি দেখলে বাঙালিবাবুরা যত্ন করলেও করতে পারে।

নাঃ, বিনি পয়সার যত্নে কাজ নেই। ভেবেছিলেন কমলাক্ষ। তারপর বলেছিলেন, 'সে সব থাক। দেখি তোর বোর্ডিং হাউসটি কেমন!'

প্রথম ঝোঁকে পত্রপাঠ স্টেশনে ফিরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও সত্যিই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। এত তোড়জোড় করে আর এত আশা নিয়ে আসা!

তাছাড়া সংসারের লোকেরাই বা বলবে কি? কি বলবে বন্ধুজনেরা? কমলাক্ষ যে একটি রাম ঠকা ঠকেছেন, কমলাক্ষর গালে চড়টি মেরে যে আগাম এক মাসের ভাড়া আদায় করে নিয়ে ধুরন্ধর বাড়িওলা কমলাক্ষকে মর্তমান প্রদর্শন করেছে, এই খবরটা কি ঘোষণা করে বলে বেড়াবার মতো?

ফিরে গেলে ওই বোকা বনে যাওয়ার খবর তো ত্রিজগতে ঘোষিত হতে এক ঘণ্টাও সময় লাগবে না।

শহরের প্রায় একপ্রান্তে—'প্রবাস বোর্ডিঙের' সামনে যখন এসে দাঁড়ালেন কমলাক্ষ, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বাইরের বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বেলে রাখা হয়েছে। বাইরের দিকে দেখা গেল না কাউকে।

সত্যি বলতে কি, চিরকেলে কলকাতার মানুষ কমলাক্ষর কাছে এই সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এই অন্ধকার বাড়ি, হ্যারিকেনের ছায়া-ছায়া আলো, খুব একটা প্রীতিকর হল না। বরং একটু ভয় ভয়ই করল।

কে জানে কি ধরনের জায়গা? রিকশাওলাটাই বা লোক কেমন? এরা কোনো চোর ডাকাত জাতীয় নয় তো? এইভাবে ফাঁদ পেতে—

আবার নিজের চিন্তায় নিজেই লজ্জিত হলেন। কি যা-তা ভাবছেন! কমলাক্ষর বাড়িওলা যদি এই মধুর ইয়ারকিটি না করত, কমলাক্ষ যদি বাড়ির তালা খুলে মালপত্র নিয়ে রিকশাওলাকে ছেড়ে দিতেন, কাকে ফাঁদে ফেলতে আসত সে?

মানুষের উপকারকে, মানুষের শুভেচ্ছাকে অবিশ্বাস করার মতো নীচতা আর কি আছে!

ডেকে দিয়েছিল রিকশাওলাই।

করুণাপদ বেরিয়ে এসেছিল। সাড়া পেয়ে। একাধারে যে এই বোর্ডিঙের চাকর পাচক হিসেবরক্ষক।

'কি চাই?' প্রশ্ন করেছিল করুণাপদ।

কমলাক্ষ সংক্ষেপে অবস্থা বিবৃত করে বলেছিলেন, 'এ তো আমাকে ধরে-করে নিয়ে এল এখানে। জায়গা আছে নাকি থাকার?'

সংকল্প করছিলেন অবশ্য, আজ রাতটা তো কাটাই, তারপর বোঝা যাবে সকাল হলে।

করুণাপদ বলল, 'আছে জায়গা। এই তো ব্যবসা বাবুর। তবে এই ভরা গরমে তো বড়ো একটা আসে না কেউ, তাই ঘর-দোর তেমন পরিষ্কার করা নেই। আজ্ঞে, মানে পরিষ্কারই আছে, সে তো মায়ের এক কণা ধুলো থাকবার জো নেই। তবে বিছানাপত্তরের জুতটা তেমন—'

'বিছানা আমার সঙ্গেই আছে।' বলেছিলেন কমলাক্ষ। ঈষৎ চিন্তাভাবনার মাঝখান থেকে।

কি বলল লোকটা? 'মায়ের।'

'মা' আবার কী বস্তু? হোটেলওয়ালীর হোটেল না কি? তা হলেই তো বিপদ গুরুতর। কিন্তু 'ও যে মা না কি বললে'—এটুকু জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করল। বিছানার খবরে হৃষ্ট করুণাপদ বলল, 'বিছানা আছে? তবে আর কি! চলুন। ঘর দেখিয়ে দিই, জল তুলে দিই, হাত পা মুখ ধোবেন তো? বাবু একটু বেরিয়েছেন, এখুনি এসে যাবেন।'

'বাবু!' তবু ভালো!

কমলাক্ষ ভাবলেন, 'তবু এবারের যাত্রাটাই দেখছি অযাত্রা। এর থেকে বরাবরের মতো ছুটির দু'চারটে দিন পুরী-টুরিতে কাটিয়ে এলেই হত। বেশি লোভ করতে গিয়ে দেখছি সবটাই লোকসান।'

কর্তাটি আবার অনুপস্থিত। সে লোককে একবার দেখলেও তবু হোটেলের পদমর্যাদা সম্পর্কে একটু অবহিত হওয়া যেত। অবিশ্যি চাকরটা খুব খারাপ নয়। এর অনুপাতে কর্তা হলে ভালোই হবে আশা করা যায়।

আচ্ছা তা এইটুকু তো বাড়ি। এর মধ্যে আবার হোটেলের ব্যবসা চলে কি করে? নিজেরাও তো থাকে।

ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেলেন নির্দিষ্ট ঘরে। বাড়ির ভিতরকার দালান দিয়ে গিয়ে পিছন দিকে খানতিনেক ঘর, বাড়ির সঙ্গে ঠিক লাগোয়া নয়, একটু ছাড়া। এই তিনটি নিয়েই তা হলে হোটেলের লপচপানি!

করুণাপদ বোধ করি মুখের ভাষা পাঠ করতে পারে। তাই বিনীত কণ্ঠে বলে, 'হোটেল বলতে তেমন কিছু নয় বাবু, ওই বলতে হয় তাই বলা। হোটেল না বললে এখানকার হতচ্ছাড়া লোকগুলো যে বুঝতেই পারে না। রিকশাওলা বলুন, মুটে বলুন, দাই মালি যা বলুন, ওই হোটেল বললেই বোঝে ভালো। তাই পুরনো নাম উঠিয়ে দিয়ে এই 'প্রবাস বোর্ডিং' নাম দেওয়া। নইলে সাইনবোর্ড উলটে দেখবেন, ওপিঠে লেখা আছে 'প্রবাস-আবাস'। মায়ের নিজের দেওয়া নাম। যাক সেকথা বাবু, নামে আর কি করে! থেকে দেখুন ব্যবস্থা কেমন!...দেখুন মা-বাবু কেমন লোক!...মানে ব্যবসাদার তো আর নয়, নেহাত চলে না বলেই তাই—'

কমলাক্ষর এবার আর বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কর্তা গিন্নি (খুব সম্ভবত নিঃসন্তান) দুজনে এই পরবাস আবাসে বাস করেন, এবং ওই তিনখানি ঘর থেকেই কিছু আয়-টায় করে চালান।

তা মন্দ নয়। নেহাত 'হোটেল হোটেল' হবে না। তবে বেশি গায়ে-পড়া আত্মীয়তা না করতে এলেই হল।

বাকি ঘর দু'খানা তো খালিই রয়েছে মনে হচ্ছে, তালা ঝুলছে দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই, নাকি তালা দিয়ে বেড়াতে গেছে। ওঃ না, চাকরটা যে বলল এসময় কেউ আসে না, যাক বাঁচা গেছে।

যেরকমটি ইচ্ছে করেছিলেন কমলাক্ষ, সেই রকমটিই জুটে গেল বোধ হয়। বরং বাড়তি কিছু ভালোই হল।

ভাড়াটে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা নিজে নিতে হত। যত সংক্ষেপেই করো হতই কিছু ঝঞ্ঝাট। চাকর একটা খুঁজতে হত, কে জানে সে ব্যাটা সব ছিষ্টি 'চক্ষুদান' করে পালাতো কিনা, এ তবু একটা গেরস্থ বাড়ির মধ্যে।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসে আর সেই গা ছমছমানি ভাবটা থাকে না। ভিতরে একটা জোরালো আলো জ্বলছে, আর দালানের দৃশ্য-সজ্জায় একটি গৃহস্থ ঘরের চেহারা পরিস্ফুট হচ্ছে।

এক কোণে জলচৌকীর ওপর ঝকঝকে মাজা বাসন, টুলের ওপর গেলাস ঢাকা দেওয়া জলের কুঁজো, দেয়ালে লাগানো ব্রাকেট আলনায় কিছু জামাকাপড়।

না, শাড়ি নয় অবশ্য। ধুতি শার্ট এই সব তবু সবটা মিলিয়ে একটা লক্ষ্মীশ্রী।

'এই আপনার ঘর বাবু। এইটাই হল গে সর্বাপেক্ষা উত্তম। মানে পুব দক্ষিণ দু'দিক পাচ্ছেন।'

'সর্বাপেক্ষা উত্তম' শুনে মৃদু হেসে বলেন কমলাক্ষ, 'তা সর্বাপেক্ষা উত্তমটি আমাকে দিয়ে দিচ্ছ, তোমাদের অন্য খদ্দের এলে রাগ করবে না?'

'রাগ? রাগ মানে?' করুণাপদ উদ্দীপ্ত স্বরে বলে, 'অগ্রে যে আসবে তারই অগ্রভাগ। এই হচ্ছে জগতের আইন। তা ছাড়া সে-ভয় কিছু নেই বাবু। বললাম তো এ-সময় কেউ আসে না। যা ভিড় ওই আপনার পুজো থেকে শীতকালটি অবধি। বাকি বছর প্রায় বন্ধই পড়ে থাকে।...দাঁড়ান, আপনার হোল্ডঅল খুলে বিছানা বিছিয়ে দেই।'

থাক্ থাক্ করে উঠেছিলেন কমলাক্ষ। বলেছিলেন, অত কিছুতে দরকার নেই, বিছানা তিনি হোল্ডঅল্ খুলে নিয়ে পেতে নেবেন। এখন শুধু একটু জলের দরকার।

করুণাপদ ছাড়েনি। বলেছিল, 'জল তো দেবই, চলুন না গোসলখানায়। তা বলে বিছানা আপনি নিজেই পেতে নেবেন? বলেন কি?'

হোল্ডঅল্ খুলে পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিয়ে আলনায় তোয়ালে ঝুলিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল সে জল দিতে।

সেই অবসরে ঘরটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নিয়েছিলেন কমলাক্ষ। ঘরটি ভালোই। বেশ শুকনো পরিষ্কার, ধুলোশূন্যই বটে। চৌকিটি মজবুত পালিশ করা, আলনাটি সভ্যভব্য, ঘরের এক কোণে ছোট্ট একখানি টেবিল, আর একখানি কাঠের চেয়ার।

তা হোক। কাঠের হোক। আস্ত মজবুত। সেই ভাড়াটে বাড়িটার ফার্নিচারের দৃশ্য স্মরণ করে আর একবার মনে মনে হাসলেন কমলাক্ষ।

যাক, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই। বন্ধ করা জানলাগুলো খুলে দিলেন কমলাক্ষ। পাশে একট জানলা থেকে কুয়োর পাড়টা দেখা যাচ্ছে। বাকি সারি সারি তিনটে জানলা পিছনের খোলা জমির দিকে। এই দিকটাই দেখছি দক্ষিণ। বাঃ! আজ অন্ধকার, কিন্তু যেদিন চাঁদ উঠবে, রাত্তির বেলা জানলা খুলে শুতে বড়ো চমৎকার লাগবে তো! অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন কমলাক্ষ। অন্যমনস্ক হয়ে সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটা অননুভূত অনুভূতিতে মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারও যে দেখতে এত ভালো লাগে, তা তো কোনোদিন জানতেন না কমলাক্ষ। অন্ধকার দেখলেনই বা কবে? ভদ্রলোকেদের বেড়াতে যাবার উপযুক্ত জায়গাগুলির কোনোখানে আর অন্ধকার রেখেছে আধুনিক ব্যবস্থা?

কিন্তু অন্ধকারেরও কি একেবারেই দরকার নেই? ভাবলেন কমলাক্ষ। আছে দরকার। নিশ্চয় আছে। অবিরত চড়া আলো দেখতে দেখতে চোখের স্নায়ু শিরাগুলো যে ক্লান্ত হয়ে ওঠে, পীড়িত হয়ে ওঠে। গাঢ় ঘন কোমল এই অন্ধকার যেন কমলাক্ষর সেই ক্লান্ত হয়ে ওঠা, পীড়িত হয়ে পড়া স্নায়ু শিরাতে স্নিগ্ধ একটা ওষুধের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে।

'বাবু জল দিয়েছি।'

চমকে উঠলেন কমলাক্ষ। ওঃ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে দেখছি। তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কই, তোমার বাবু এসেছেন?'

'আজ্ঞে আসেননি, এই এসে যাবেন আর কি। তা তার জন্যে আপনার কিছু আটকাবে না বাবু। যা কিছু করবার মা আর আমিই করি। চলুন রাত হয়েছে খেতে বসবেন।'

কমলাক্ষ কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'কিন্তু চার্জ-টার্জ কি রকম—'

'সে এমন কিছু নয় বাবু। খাওয়া থাকা নিয়ে দিন সাড়ে চার টাকা। তা খাওয়া আপনি চারবেলাই পাবেন। সকালে চা ডিমসিদ্ধ—'

'থাক্ থাক্—' লজ্জিত কমলাক্ষ ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'সে যা হয় হবে। চার্জ তো কমই। কিন্তু এখুনি যে খেতে বসিয়ে দিতে চাইছ, পাবে কোথায়? আমার জন্যে তো আর রান্না করে রাখনি?'

করুণাপদ একগাল হেসে বলে, 'কী যে বলেন বাবু, একটা মানুষের খাওয়ার জন্যে আবার ভাবনা—! বলি বাবুর জন্যে তো আছে কিছু, তার ওপর দু'খানা ভাজা আর লুচি করে দিলেই—সে আপনি কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবু তো আর রাত এগারোটা বারোটার ইদিকে—ইয়ে চলুন বাবু চলুন, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন, বাবুর সঙ্গে দেখা আপনার গিয়ে সেই কাল সকলেই—'

করুণাপদ হঠাৎ থামতে বাধ্য হয়। দালানের ওদিক থেকে অনুচ্চ একটি স্বর আসে, 'করুণা, বাজে কথা থামিয়ে একটু এদিকে এস তো!'

কমলাক্ষর হঠাৎ মনে হল, এরা নিশ্চয়ই বেশ ভদ্রই। গলার সুরটা মার্জিত, কথার ধরনটা সভ্য।

সে-রাত্রে নয়, সে-রাত্রে কমলাক্ষ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন 'বাবু'কে দেখলেন। ব্রজেনবাবু।

রোগা পাকসিটে চেহারা, মুখচোরা মুখচোরা স্বভাব, দেখলে মনে হয় একটু পানদোষের ব্যাপার আছে বোধ হয়। অন্তত ওই রাত করে ফেরা আর চেহারার ধরনটা একত্র করে তেমনই একটা ধারণা জন্মেছিল কমলাক্ষর। কিন্তু ধারণা-টারনা ক'দিনের জন্যেই বা? সেদিনও কি কমলাক্ষ স্বপ্নেও কল্পনা করেছিলেন সাতদিনের মাথায় ব্রজেনবাবুকে নিয়ে শ্মশানে আসতে হবে তাঁকে?

সেদিন বলেছিলেন, মানে কথা বলতে হয় তাই বলেছিলেন, 'বাড়িটা কিনেছিলেন, না করিয়েছেন?'

ব্রজেনবাবু নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইয়ে, এই সামনের পোরশানটুকু কিনেছিলাম, তারপর আপনার গিয়ে আস্তে আস্তে পিছন দিকটা—মানে এখানেই যখন সেটল্ করা হল, করতে হবে তো একটা কিছু!'

একটা কিছু করতে হবে বলে হোটেল খুলতে হবে? আর কিছু করবার ছিল না? এ-প্রশ্ন তোলেননি কমলাক্ষ। ভদ্রমহিলাটিকে দেখে যেমন মনে হয়েছিল, মানে যেরকম উচ্চশ্রেণীর মনে হয়েছিল, ব্রজেনবাবুকে দেখে ঠিক তা মনে হল না।

যাক ও নিয়ে কে মাথা ঘামায়? কেনই বা মাথা ঘামাবেন?

এটা ওটা কথার শেষে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঠিক করেছেন সকাল বিকাল বেড়াবেন, আর দুপুর সন্ধ্যা বই পড়বেন। বেশ নিরিবিলি বাড়ি, আশেপাশে অন্য বোর্ডারদের ঝামেলা জোটেনি। বেশ লাগছে, বড়ো ভালো লাগছে।

খানিক পথ এগোতেই দাঁড়াতে হল। এক ভদ্রলোক পথরোধ করেছেন।

'কী মশাই, আপনাকে যে একেবারে আনকোরা নতুন দেখাচ্ছে? কবে এসেছেন? নিশ্চয় বেশিদিন নয়। নইলে আমার চোখ এড়িয়ে—'

কমলাক্ষ সবিস্ময়ে এই আলাপী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। ভদ্রলোকের স্বভাবটি

গায়ে-পড়া, সাজটি অদ্ভুত। সিল্কের লুঙ্গির ওপর একটা সুতির গলাবন্ধ কোট একটা চাপানো, পায়ে চপ্পল, মাথায় সোলা হ্যাট। এই সক্কালবেলাই ওনার মাথায় রোদ লাগছে নাকি?

কমলাক্ষ সবিনয়ে বললেন, 'এই কাল এসেছি।'

'কাল? কটার গাড়িতে?'

'বিকেলের।'

'বিকেলের! তা উঠেছেন কোথায়? মানে কার বাড়ির অতিথি? আমি তো মশাই এখানের পিঁপড়েটিকে পর্যন্ত চিনি—'

কমলাক্ষ হেসে বললেন, 'হিসেব মতো আমি এখানের সকলেরই অতিথি। কারণ এখানে যখন বহিরাগত। তবে ঠিক অতিথি হিসেবে কারও বাড়ি উঠিনি।'

'বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন? উইথ ফ্যামিলি তাহলে? তা তাঁরা সঙ্গে নেই যে? নেবেন, সঙ্গে নেবেন, বেড়াবার জন্যেই তো আসা। তা কার বাড়ি ভাড়া নিলেন? মানে কোন্ বাড়িটা? বাড়ির নাম বললেই বুঝব। আমার তো এখানের সবই নখদর্পণে।'

কমলাক্ষ হেসে ফেলে বলেন, 'আপনার প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, 'বাড়ি ভাড়া' নিইনি, উইথ ফ্যামিলি নয়, কাজেই তাদের সঙ্গে নেবার প্রশ্ন নেই। যে-বাড়িতে উঠেছি, তার নাম হচ্ছে 'প্রবাস আবাস—'

'প্রবাস আবাস! অ!'

ভদ্রলোক নাক কোঁচকালেন। 'তা কলকাতা থেকেই ব্যবস্থা করে এসেছিলেন বুঝি?'

কলকাতা থেকে কোনো ব্যবস্থা করে এসেছিলেন সেকথা আর বিশদ বলতে বাসনা হল না কমলাক্ষর। বোকামির কথা—কেই বা ফাঁস করতে চায়? তাছাড়া কমলাক্ষ তো কথা কমই বলেন। বেশি কথা বলা তো স্বভাবই নয়। শুধু হঠাৎ এই অতিভাষী ভদ্রলোকের আকস্মিক আক্রমণে, আর বোধ করি পরিচিতি পরিবেশের অভ্যস্ত জীবনধারার বাইরে বলেই এতগুলো কথা একসঙ্গে বললেন।

এবারও বললেন, 'ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থা ঠিক করে আসিনি, তা এসে জুটেই গেল ঈশ্বর কৃপায়। রিকশাওলাই সন্ধান দিয়ে নিয়ে এল—'

'তা বেশ! ভালোই।' পেটের মধ্যে বেশ কিছু কথা চেপে রেখে, এবং সেটা যে চেপে রেখেছেন, তা না চেপে, ভদ্রলোক কথা শেষ করেন। 'দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন বেড়িয়ে যাবেন, এর আর কি। আজকাল তো হাড়ি ডোমও জল-চল হয়েছে। তা যাক, চলি। মশায়ের নামটি কি জানলাম না তো?'

কমলাক্ষ বিরক্ত হচ্ছিলেন। কমলাক্ষ লোকটাকে অশ্রদ্ধা করছিলেন, তবু ভদ্রতার দায়েই উত্তরটা দিতে হয়, 'কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়।'

'মুখুজ্জে! ওঃ! একেবারে সাপের মাথার মণি! যাক 'প্রবাস হোটেলে' উঠবেন একবার এই গগন গাঙুলীর সঙ্গে যদি পরামর্শটা করতেন! আমি মশাই কখনও কারুর হিত বই অহিত চাই না। ওই যে আপনার ব্রজেন ঘোষ। যখন প্রথম এসেছিল এখানে—অভয় দিয়ে আশ্রয় দিয়ে কে এখানে শেকড় গাড়িয়েছিল ওকে? আর কেউ নয়—এই গগন গাঙুলী!'

কমলাক্ষর মনে হল, যেন কোনো নাটকের একটি 'টাইপ' চরিত্র এসে সামনে দাঁড়িয়েছে তাঁর। বাচনভঙ্গি থেকে অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত যেন অতি পরিচিত। এক-মিনিট দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু দাঁড়াতে হয়েছিল। কারণ গগন গাঙুলী ছাড়ছিলেন না।

'আমিই পরামর্শ দিয়েছিলাম। ওই হোটেল খোলবার পরামর্শটি আমিই দিয়েছিলাম। বলি, লেখাপড়া যখন বেশিদূর নয়, আর কলকেতায় কোনো কাজকর্ম জোগাড় করতে পারওনি, তখন এখানেই সেটল্ করে ফেল। এটা ভালো ব্যবসা, স্বাধীন ব্যবসা, তা ছাড়া এই গেরস্ত পরিচালিত

হোটেলের চাহিদাও বেশি। এই অঞ্চলে নেই তো বিশেষ। অথচ স্বাস্থ্যকর জায়গা, লোকে বেড়াতে আসে। লাগিয়ে দাও, পেছনে আমি আছি।...সত্যি বলব মশাই, আমার নিজেরই ঝোঁক ছিল।...নেহাত স্ত্রীর আপত্তি। বলে—ছিঃ, শেষে লোকে আমাকে বলবে হোটেলওলি! তা স্ত্রীই যদি খাপ্পা হন মশাই, পয়সা নিয়ে কি ধুয়ে জল খাব? বলুন? তাই ওই ব্রজেন ঘোষকেই সাহায্য করে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলাম! তারপর মশাই—যাক! সে কথা যাক। কী করা হয় মশাইয়ের?'

কমলাক্ষ মনে মনে ভাবেন, ওরে বুড়ো, তুমি ভাবছ ওই আধখানা কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তুমি আমার কৌতূহল জাগ্রত করবে, আমিও তেমনি। কথাটি কইব না ও-সম্বন্ধে। তাই শুধু বলেন, 'এই ছেলেটেলে পড়াই।'

'পড়ান? ছেলেমেয়েদের—মানে টিউশানি? নাকি কোনো ইস্কুলে?'

'আজ্ঞে স্কুল ঠিক নয়। ইয়ে একটা কলেজে—'

'ওঃ তাই বলুন? প্রফেসর! তা বলতে হয় এতক্ষণ? আচ্ছা যান—বেড়াতে বেরিয়েছেন, আর জ্বালাতন করব না! দেখা হবেই অবিশ্যি আবার। এই পথেই তো পায়ের ধুলো দিতে হবে। একঘেয়ে মুখ দেখতে দেখতে অরুচি এসে গেছে মশাই! একটু নতুন মুখ দেখতে পেলে বর্তে যাই।'

ভদ্রলোকের ব্যাকুলতাটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন কমলাক্ষ। বুঝেছিলেন, এরকম একটি মফঃস্বল টাউনে দীর্ঘকাল কাটাতে হলে একঘেয়ে মুখ দেখতে দেখতে এই রকমই অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।

বুঝেছিলেন। কিন্তু গগন গাঙুলীকে 'নতুন মুখ' দেখাবার পুণ্য অর্জন করা আর হয়ে ওঠেনি কমলাক্ষর। পরদিন অন্য পথ ধরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তার পরদিনও। পর পর চারটে দিনই অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়েছিলেন ওই সব নাম-না-জানা পাহাড়ের টিবির দিকে।

হ্যাঁ চারদিন। তারপর তো দু'টো দিন বাড়িতেই বন্দী।

কিন্তু কমলাক্ষ কেন বন্দী হলেন?

জ্বলন্ত চিতার আওতা থেকে একটু সরে গিয়ে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন কমলাক্ষ। কমলাক্ষ এক নাম-না-জানা জায়গার শ্মশানে এসে, অজানা ব্রজেন ঘোষের শবদেহ দাহ করছেন। এই চাইতে আশ্চর্য ঘটনা কমলাক্ষর জীবনে আর কবে ঘটেছে? শ্মশানে যাওয়া সম্পর্কে আবাল্য একটা ভীতি আছে কমলাক্ষর। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থা না হলে, ওই মৃতের বাড়ি থেকেই বিদায় কর্তব্য সারেন। আর সঙ্গে যেতে হলেও এই বীভৎস কাণ্ডটাকে চোখের সামনে দেখার যন্ত্রণাটা এড়াতে পারলে ছাড়েন না।

মাঝে মাঝে ভেবেছেন, ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন তাই নীরজা মারা যাবার সময় কমলাক্ষ বিলেতে ছিলেন। ফিরে এসে নীরজাকে আর দেখতে পেলেন না, এ বেদনা বড়ো বেশি বেজেছিল বটে, তবু নীরজাকে যে হাতে করে পোড়াতে হল না তাঁকে, এটার জন্যে যেন ঈশ্বরের কাছে একটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। উপস্থিত থাকলে পোড়াতে তো কমলাক্ষকেই হত! তখন তো পুণ্ডরীকের মায়ের মুখে 'আগুন' দেবার বয়েস আসেনি।

আজ কমলাক্ষ ব্রজেন ঘোষের শব বয়ে নিয়ে শ্মশানে এসেছেন। যে-ব্রজেন ঘোষকে মাত্র সাতদিন আগে চোখেও দেখেননি। অথচ এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

কতরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতেই পড়তে হয় মানুষকে!

করুণাপদ কাছে এসে বলল, 'মুখজ্জে বাবু, লোকগুলো তাড়ি খাবার পয়সা চাইছে।'

তাড়ির পয়সা! এই দিন-দুপুরে তাড়ি খাবে ওরা! ভাবলেন কমলাক্ষ। কিন্তু কিছু বললেন না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা উঠল এগিয়ে ধরলেন করুণাপদর দিকে। করুণাপদ সরে গেল।

কমলাক্ষ ভাবলেন, শুধু কি ধোঁয়ার জন্যেই চোখ দিয়ে জল পড়ছে করুণাপদের? ব্রজেন ঘোষের মড়া বার করবার সময় ওর মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি কি সাজানো? করুণাপদ তো ওদের চাকর মাত্র। সামান্য একটা চাকরের মধ্যে এত ভালোবাসা থাকে?

কমলাক্ষও তো সারা জীবন চাকর রাখলেন, কত আসে কত যায়, কই তার মধ্যে এমন একটা মুখও তো মনে পড়ছে না—যে-মুখটা মনে রয়ে গেছে। চাকরবাকর সম্বন্ধে কমপ্লেন শোনা ছাড়া চাকর সম্পর্কিত আর কিছু মনে করতে পারলেন না কমলাক্ষ। এমনকি এখনই কলকাতায় তাঁর বাড়িতে যে-লোকটা রয়েছে—তার নামই অনেক ভেবে মনে আনতে হল। কী যেন? ভবেশ? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। যে-লোকটা খুব সম্ভব বছর তিনেক আছে, আর এই তিন বছরের মধ্যে তিনটে দিনও কমলাক্ষর জুতো জোড়াটা ঝেড়েছে আর মশারিটা টাঙিয়ে দিয়েছে কিনা সন্দেহ। ঘরের খাবার জলের কুঁজোটা না ভরে ভরে মাকড়শার জালে ঢাকা পড়ে গেছে। কমলাক্ষ রাতে শোবার আগে নিজেই কাঁচের গ্লাসে করে এক গ্লাস জল রাখেন। জুতোটা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নেন।

কমলাক্ষ ভাবলেন, আমি যদি হঠাৎ মারা যাই, ভবেশের চোখ দিয়ে জল পড়বে? তারপর ভাবলেন, খুব সম্ভব দোষ আমার নিজেরই। আমি কারোকে লক্ষ্য করি না, আমি কারও কাছে সেবা যত্ন প্রত্যাশা করি না, আর বোধ করি আমি কাউকে ভালোবাসতেও পারিনি। জানি না ভালোবাসতে।

গণ্ডমূর্খ ব্রজেন ঘোষ হয়তো ভালোবাসতে জানত। নইলে—

করুণাপদ কুণ্ঠিত পদে আবার এল, 'আর টাকা সঙ্গে আছে বাবু? একজনের ভাগে কিছু কম পড়ছে।'

কমলাক্ষ আর একবার পকেটে হাত ঢোকালেন। 'কত কম পড়ছে?'

'আজ্ঞে তেরো আনা।'

একটা টাকা এগিয়ে ধরলেন কমলাক্ষ। ভাবলেন, এই স্বভাব মানুষের। অপ্রতিবাদে পেলেই তার ভিতরের লোভের মন জেগে ওঠে। মোটা টাকা কব্‌লেই ধরে এনেছিলেন ওদের। স্টেশনের ওদের। স্টেশনের ধারে ওই পানের দোকানটা থেকে। এটা ফাউ।

যাক। কাজটা হয়ে যাচ্ছে এই ঢের।

হয়ে যাচ্ছে। তা সত্যি। কিন্তু এর পরটা কি হবে? ভাবলেন কমলাক্ষ।

এক মাসের ছুটি নিয়ে চেঞ্জে এসেছিলেন না তিনি? তার সাতটা দিন কেটেছে। বাকি দিনগুলো নিয়ে এবার কি করবেন? কলকাতায় ফিরে যাবেন? গগন গাঙুলীর পরামর্শ নিতে যাবেন? না কি 'এক মাসের চার্জ অগ্রিম দিয়ে দিয়েছি' এই অজুহাত দেখিয়ে প্রবাস আবাসের পিছনের দিকের ওই পুব-দক্ষিণ খোলা ঘরখানা আঁকড়ে বসে থাকবেন?

রাত্রি হলেই যে-ঘরের জানলা দিয়ে মখমলের মতো মসৃণ মোলায়েম গাঢ় অন্ধকার দেখতে পাওয়া যায়, আর শেষ রাত্রি থেকে সে-অন্ধকার কাটবার যত কিছু আয়োজন সমস্তই দেখতে পাওয়া যায়, পর পর একটির পর একটি বইয়ের পাতা খোলার মতো। সূর্য ওঠার আগে যে এতরকম রঙের খেলা চলে, এটি কমলাক্ষ কোনোদিন দেখেননি?

হয়তো দেখেছেন। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু দেখার চোখ কি সব সময় খোলা থাকে?

* * *

বেলা পড়ে গিয়েছিল।

এখন আর আকাশে সূর্য ওঠার খেলা নয়, সূর্য ডোবার। সেটা দেখা যায় না এ-ঘর থেকে। একগ্লাস চিনির শরবত খেয়ে ঘরটায় এসে বসলেন কমলাক্ষ।

গত দু'দিন থেকে এ-ঘরে আর আসেননি মনে পড়ল। সেই পরশু দুপুরের সময় ব্রজেনের বাড়াবাড়ির সূচনা দেখা দিয়েছিল যখন—তখন থেকে।

করুণাপদর ডাকে ওদের ঘরে গিয়ে অবস্থা দেখে লজ্জায় মারা গিয়েছিলেন কমলাক্ষ। আগের রাত্তির থেকে নাকি ওইরকম ছটফট করছে ব্রজেন। বলছে, পেট বুক সব জ্বলে গেল।

বিষের জ্বালা? কিন্তু ব্রজেন ঘোষ কেন বিষ খাবে?

না না, ফুড্ পয়জনই হয়েছিল ব্রজেনের। ডাক্তারও তো তাই বলল। তা ফুড্ পয়জনের ওষুধই কি পড়েছিল ব্রজেন ঘোষের পাকস্থলীতে? ডাক্তারকে অনুরোধ উপরোধ করে ডেকে আনতে, আর স্টেশনের ধার থেকে ওষুধ আনতে, নাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল।

ছেড়ে যাওয়া নাড়ি আর কোন্ ওষুধের জোর চাঙ্গা হয়ে উঠবে?

কমলাক্ষ তাকিয়ে দেখলেন চিনির শরবতের তলানিটায় একটা মাছি পড়ল। নীল রঙা বড়ো মাপের মাছি। ব্রজেন ঘোষ বলেছিল সেদিন দুপুরে নাকি সে দোকানে বসে তরমুজের শরবত খেয়েছিল। ব্রজেন ঘোষের সেই শরবতে কি ওই রকম বড়ো মাপের একটা মাছি পড়েছিল?

চমকে দাঁড়িয়ে উঠতে হল কমলাক্ষকে।

মানে উঠলেন।

আর কেউ হলে হয়তো হোটেলওয়ালার বউকে সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে উঠত না। মহিলাই ভাবত না তাকে। বলতো 'মেয়েমানুষ'। কমলাক্ষ তা বলেননি। কিন্তু কমলাক্ষই কি ভেবেচিন্তে সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়েছিলেন? তা নয়। দাঁড়িয়েছিলেন আকস্মিক চমকে উঠে। বিনা ভূমিকায় কথাটা বলে বসেছিল কিনা লীলা।

'ওখানে তো শুনলাম পয়সা পয়সা করে আপনাকে খুব জ্বালাতন করেছে—'

কমলাক্ষ বোধ করি এসময় ঠিক এ-ধরনের কথার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তাই থতমত খেয়ে বলেন, 'না না, জ্বালাতন কি? জ্বালাতন কিছু না। মানে জ্বালাতন তো ওরা করবেই—'

'তা বটে।' লীলা তার স্বভাবগত ভঙ্গিতে সেই একটু হাসির মতো সুরে বলে, জ্বালাতন করাই তো ওদের পেশা। কিন্তু আপনার কাছে আমার পেশাটাও প্রায় তাই দাঁড়াচ্ছে। ঋণশোধ কথাটা উচ্চারণ করবার ধৃষ্টতা নেই। কিন্তু একটু ধৃষ্টতা তো করতেই হচ্ছে। আগে, পরে, মাঝখানে, অনেক খরচপত্রই তো হয়ে গেল আপনার—'

টেবিলের ওপর একগোছা দশটাকার নোট নামিয়ে রাখল লীলা। আর রাখার পর ঈষৎ হেসে বলে, 'আমি কিন্তু হিসেব করে মিটিয়ে দিতে পারব না। কম হলে কমই হল।'

কমলাক্ষ একবার মুখ তুলে তাকালেন। মুখ দেখা গেল না। ভাবলেন লীলা যেন বড়ো বেশি প্র্যাকটিক্যাল। আজই তাড়াতাড়ি টাকাকড়ি—

যদিও আজ সকাল পর্যন্ত নামটা জানতেন না কমলাক্ষ, শুধু শবদাহের সার্টিফিকেটের সূত্রে জেনেছেন, তবু ইতিমধ্যে ওকে 'লীলা' ভাবতেই অভ্যাস হয়ে গেছে। তারপর ভাবলেন, এটাই স্বাভাবিক, আমি আর কে ওর? নিতান্ত পর বই নয়। পাকে চক্রে ওর বিপদের সময় একটু উপকারে লেগে গেছি বলেই কিছু আর আপনার লোক হয়ে যাইনি। ঋণ রাখতে চাইবে কেন?

তবু বললেন, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি এখুনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'ব্যস্ত কিছু না। রয়েছে হাতে—'

'তা হোক। এখন থাক।'

আশঙ্কা করছিলেন হয়তো অনেক অনুরোধ আসবে, এবং শেষ পর্যন্ত নিতেই হবে। কিন্তু তা হল না। লীলা আস্তে নোটগুলো তুলে নিয়ে বলল, 'তবে থাক।'

'রাগ করলেন নাকি?'

'রাগ? তা হবে। যদি সেটাই সম্ভব বলে মনে হয় আপনার।'

'না না, মানে—'

'থাক। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু শুনুন, আজ আর আপনি বাড়িতে খেতে পাবেন না। করুণাপদ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অথচ পরশু থেকে বাজার দোকান—'

'কী আশ্চর্য! আপনি কি আমাকে একটা জানোয়ার ঠাওরেছেন? তাই আজ আমার খাবার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন?'

'কাল রাত থেকে তো খাওয়া হয়নি—'

কমলাক্ষ খপ্ করে বলে ওঠেন, 'সে তো আপনারও হয়নি।'

'আমার? তা হয়নি বটে।' বলে টাকাটা আঁচলে বাঁধতে লাগল লীলা।

একটু বেশিক্ষণ কি সময় লাগল তার? গিঁটটা কি বার বার আলগা হয়ে যাচ্ছিল? তা বাঁধার পরও দাঁড়িয়েই থাকল কেন?

কমলাক্ষ একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আপনি তো একটু শরবতও খেতে পারতেন!'

'তা পারতাম।'

'কি আর বলব।' কমলাক্ষ একটা নিশ্বাস ফেলেন, 'এমন অবস্থা আপনার, কেউ যে একটু জল এগিয়ে দেবে—'

কথাটা শেষ করা নিরর্থক বলেই হয়তো করলেন না কমলাক্ষ। লীলাও এই অসম্পূর্ণ কথার কোনো উত্তর দিল না। আস্তে বলল, 'যাই।'

ও চলে গেলে কমলাক্ষর মনে হল কথাবার্তায় তিনি বড়ো অপটু। এরকম সদ্য শোকাহত মানুষকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে কথা বলা বোধ হয় উচিত ছিল। কিন্তু কী-ই বা বলবেন? বাজার চলতি সেই ছেঁদো কথাগুলো? 'কী আর করবে! এই তো জগৎ'—ইত্যাদি! ছিঃ!

ভাবলেন ব্রজেন ঘোষের বউ যদি ব্রজেন ঘোষের মতোই হত, হয়তো চেষ্টা করে ওরকম দু'একটা কথা বলতে পারতেন। অন্তত চেষ্টাও করতেন। আর ওই টাকাটা রাখতে এলে বলতে পারতেন, 'সে কি! বিপদের সময় মানুষ মানুষের করবে না? ও-টাকা আপনি রাখুন, শোধ দিতে হবে না।'

কিন্তু ব্রজেন ঘোষের স্ত্রী ব্রজেন ঘোষের মতো নয়। কোথায় যেন আকাশ পাতাল তফাত। আশ্চর্য রকমের অন্যরকম। তাই কমলাক্ষ নিতান্ত অপটুর মতো বসে রইলেন। এটুকুও বলতে পারলেন না, করুণাপদ না উঠুক, আমিই যাচ্ছি। বাজার থেকে একটু মিষ্টি এনে দিচ্ছি, জল খান আপনি। বাঁচতে তো হবে।

অথচ ঠিক ওই কথাগুলোই বলতে ইচ্ছে করছিল। ওই রকমই কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছিল। কোনো মেয়ের খাওয়া হয়েছে কি হয়নি এ-খোঁজ কমলাক্ষ জীবনে কখনও করেছেন?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঠের দিকের সেই জানলাগুলো খুলে দিলেন কমলাক্ষ। খুব খানিকটা বাতাস এসে পড়ল একসঙ্গে। কমলাক্ষ দাঁড়িয়ে থাকলেন জানলার কাছে।

আর একবার ভাবলেন, কি উচিত তাঁর এখন? থাকবেন, না চলে যাবেন? হোটেলের মালিক মারা যাবার পর, কেবলমাত্র অগ্রিম চার্জ দেওয়ার ছুতোয় মালিকের স্ত্রীর ওপর জুলুম চালিয়ে খাওয়াদাওয়া চালিয়ে যাওয়া সঙ্গত?

অথচ এটাও ভেবে পেলেন না, আত্মীয়স্বজন বলতে যার আর কেউ কোথাও নেই, পাড়ার লোকে যার মুখ দেখে না, তাকে একলা অসহায় এই মাঠের মাঝখানের একটা বাড়িতে ফেলে চলে যাওয়া যায় কি করে?

কমলাক্ষকে এ-দায়িত্ব কে [illegible] কে জানে! তবু কমলাক্ষ না ভেবে পারছেন না। ব্রজেন ঘোষের এই হোটেল এরপর আর কি চলবে? লীলা কি একা হোটেল চালাতে পারবে? কত রকমের লোক আসতে পারে, কত অসৎ লোক। আর চারিদিকেই তো শত্রু ওর।

নাঃ, অসম্ভব!

তা শুধু চারিদিকেই নয়, ওপর দিকেও শত্রু লীলার। নইলে করুণাপদ অমন ঘাড় ভেঙে জ্বরে পড়বে কেন?

'দেখছি আপনাকেই আজ হাটে যেতে হবে—' চায়ের পেয়ালাটি সামনে নামিয়ে রেখে কথাটি শেষ করল লীলা, 'করুণাপদ তো দিব্যি জ্বর বাধিয়ে বসল। অথচ আজ হাট—'

কমলাক্ষ চিরদিনই অন্যমনস্ক প্রকৃতির। কোনোদিনই সমাজব্যবস্থা আচার-নিয়ম সম্পর্কে মাথা ঘামাননি। তবু কমলাক্ষর চোখে পড়ল, মানে চোখে না পড়ে পারল না, নতুন বৈধব্যের বেশ ধারণ করেনি লীলা। আগেও যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে দেখে বিস্ময় বোধ করলেন কমলাক্ষ। আবার কৃতজ্ঞও হলেন। সেই একটা কি যেন ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে! ভাবলেই হৃৎকম্প হয়।

আস্তে বললেন, 'হাটের দরকার বোধ হয় শুধু আমারই জন্যে? করুণাপদর তো জ্বর হয়েছে। আর আপনারও—'

'না, আমার আর জ্বর হল কই? আমি তো দিব্যি—ভালোই আছি!' জানলার বাইরে তাকিয়ে কথা বলছে লীলা। কমলাক্ষর মনে হল, ও যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

একটু থেমে কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন, 'না তা ভাবছি না। মানে আপনি তো আর ভাত-টাত—মানে ফল-টল ছাড়া আর কিছু তো—'

লীলা হাসল। হাসির মতো নয়, সত্যিকার হাসি। হেসে বলল, 'আপনার মতো লোকের হেফাজতে যে-মেয়ে থাকতে পারে তার আর জীবনে কোনো দুঃখ থাকে না। আপনার স্ত্রীকে এত ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে যে—'

কমলাক্ষও হাসলেন। বললেন, 'যাই মনে হোক, এই মর্ত্যলোকের কোনো কিছুই আর তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে না?'

লীলার মুখের হাসিটা মিলাল। 'নেই বুঝি?'

'নাঃ, বহুকাল আগেই—'

'তাই হবে। সেটাই স্বাভাবিক—'। কমলাক্ষর মনে হয়, এখনও যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে লীলা, 'বাংলাদেশের মেয়ে তো! এত বেশি সৌভাগ্যের ভার কতদিন আর বইবে? তারপর সহসাই যেন সচকিত হয়ে বলে ওঠে, 'না, ফল-টল কিছু লাগবে না। আপনিও যা খাবেন, আমিও তাই খাব। অবাক হচ্ছেন? হওয়াই সম্ভব। কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে সত্যি কথাটা বলি—'

'সত্যি কথা!' যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেন কমলাক্ষ।

লীলা মুখ তুলে শান্ত গলায় বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি কথা। যে-কথা আজ পর্যন্ত কাউকেই বলা হয়ে ওঠেনি। বলা যায়নি। সেই কথাটাই বলছি আপনাকে। উনি আমার স্বামী ছিলেন না।'

মাথার ওপর হঠাৎ এসে লাগা একটা হাতুড়ির আঘাতের অনুভূতি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন কমলাক্ষ। সেই অসাড় অনুভূতি নিয়েই অনেকটা পথ চলেছিলেন। হঠাৎ আবার সেদিনের মতো পথরোধ হল।

আবার গগন গাঙুলী। চলেছেন হাটের পথে।

'কী মশাই, রয়েছেন এখনও? তা হলে দেখছি—পাড়ার পাঁচজনের কথাই সত্যিই। আমি তো বিশ্বাস করতেই চাইছিলাম না। বলছিলাম, না না, ভদ্রলোকে আর একটি দিনের জন্যে দেখলাম না, নিশ্চয় চলে গেছেন। তা আছেন কোথায়?'

কমলাক্ষর ইচ্ছে হল লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু এ-ধরনের সাধু ইচ্ছের পূরণ আর কবে কার হয়? তাই উত্তর দিতে হল। 'যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি।'

'অ! তা হলে ওদের সব কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য। তা এত কাণ্ডের পরও ওখানেই রয়ে গেলেন তা হলে?'

কমলাক্ষর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। রুক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি।

'কাণ্ড-টাণ্ডগুলোর খবর তা হলে পেয়েছেন আপনারা? আমি ভেবেছিলাম পাননি।'

'কেন, ছুটে গিয়ে ব্রজেন ঘোষের মড়ায় কাঁধ দিইনি বলেই? দু'দিন বেড়াতে এসেছেন, এখনও চোখে কলকাতার ঘোর লেগে রয়েছে, তাই মেজাজ এত শরীফ্। বলি মশাই—যে লক্ষ্মীছাড়া লোক চাকর হয়ে মনিবের ঘরের মেয়েকে বার করে এনে স্বামী-স্ত্রী সেজে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, হাতে ভাত খাইয়ে জাত নষ্ট করে, আর মদের পয়সা জোটেনি বলে 'ইস্পিরিট' খেয়ে মরে কেলেঙ্কার করে, তার মড়ায় কে কাঁধ দেবে? দিইনি বলে মোটেই নিজেকে মস্ত একটা অপরাধী মনে করছি না।'

কমলাক্ষ ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। তাকিয়ে রইলেন গগন গাঙুলীর মুখের দিকে। কমলাক্ষর জন্যে আর কতগুলো হাতুড়ির ঘা আছে?

ওই হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে গগন গাঙুলী বড়ো আমোদ পাচ্ছেন। মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

'রইলেন এতদিন, অথচ এলেন না তো মশাই একদিন! তা হলে ভেতরের সব ঘটনাটাই শোনাতে পারতাম।'

'শোনবার জন্যে খুব বেশি উদগ্রীব নই আমি।' বলে জোর পায়ে এগিয়ে যান কমলাক্ষ, গগন গাঙুলীকে প্রায় ঠেলেই।

অদ্ভুত লাগছে! ভারী অদ্ভুত লাগছে!

চারিদিক থেকে যেন জটিলতার জাল এসে ঘিরে ধরেছে। একটা সুটকেস ভর্তি বই এনেছিলেন না কমলাক্ষ! শুধু পৃথিবীর একটুকু নিভৃত কোণ আর খানকতক বই এই সম্বল করে ছুটির একটা মাস কাটিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন না?

সে দিন আর পাওয়া গেল না।

কিন্তু হিসেব করে দেখলে চার-পাঁচটা দিন তো একেবারে মনের মতো অবস্থাই পেয়েছিলেন কমলাক্ষ! কই, বইয়ের সুটকেস খুলেছিলেন কই! হাতও তো দেননি একখানা বইয়ে। কী করেছিলেন তবে সন্ধ্যা আর দুপুর?

কী করেছিলেন মনে করতে পারলেন না। মনে পড়ল ঘরের পিছনে মাঠের দিকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন মাঝে মাঝে। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে।

তবু কতক্ষণ? কি ভেবেছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

কলকাতার কথা? কলেজের সমস্যা? খাতা দেখা ফাঁকি দেওয়া? কই? পলাশপুর আসার আগের কমলাক্ষকে কি মনে ছিল পলাশপুরে আসা কমলাক্ষর? এ তো বড়ো সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! মাঝে মাঝে তো কত জায়গাতেই যান, কই এমন আত্মবিস্মৃত ভাব তো আসে না।

কমলাক্ষ কি পূর্বজন্ম মানবেন? মেনে ভাববেন পূর্বজন্মে তিনি এই পলাশপুরে ছিলেন? তাই জন্মান্তরের পথ বেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ভুলে যাওয়া স্মৃতির রেশ? সেই রেশ উন্মনা করছে কমলাক্ষকে, ব্যাকুল করছে?

হঠাৎ মনে হল শুধু পূর্বজন্মের স্মৃতিই নয়, পূর্বজন্মের শত্রুও কেউ ছিল। সে কমলাক্ষকে নিয়ে মজা দেখতে চায়। নইলে কত লোক এসেছে ব্রজেন ঘোষের 'প্রবাস আবাসে,' ঠিক কমলাক্ষর উপস্থিতির অবসরেই মদের অভাবে স্পিরিট খেয়ে মরে কেলেঙ্কারি করবার বাসনা হল ব্রজেন ঘোষের?

তা গগন গাঙুলীর কথাই কি নির্ভেজাল? এই বিদঘুটে কথাটা সত্যি?

'সত্যি নয়',—একথাও জোর করে ভাবতে পারলেন না কমলাক্ষ। এটা টের পেয়েছেন গগন গাঙুলী, এই পলাশপুরের গেজেটের খবর উনি যেমন সরবরাহ করেন, তেমনি খবর আসেও ওঁর কাছে। মনে পড়ল ব্রজেনের সেই ছটফটানি, 'বুক পেট জ্বলে গেল।'

ডাক্তার বলল ফুড পয়জন। বলে দিল যা হয় একটা কিছু। বুঝতে পারছি না বলতে হলে তো মান থাকে না। বিশেষ করে মফঃস্বলের হাতুড়েদের। আর সত্যি সে বেচারা ধারণাই বা করবে কি করে লোকটা স্পিরিট খেয়ে মরতে বসেছে।

আচ্ছা সত্যিই খেয়েছে? মদের পয়সার অভাব হল কেন? লীলার কাছে তো অনেকগুলো টাকা ছিল। লীলা দেয়নি? টাকা কার? লীলা মনিবের মেয়ে, ব্রজেন ঘোষ চাকর। চাকরের সঙ্গে চলে এসেছে লীলা? তাই তাদের আত্মীয় নেই বন্ধু নেই? তাই প্রতিবেশীরা তাদের দেখে না?

কিন্তু এতদিন ধরে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চালিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ কমলাক্ষকে দেখেই বা সে-ধুলো উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করল কেন লীলার? ব্রজেন ঘোষ মারা গেল বলে?

রাস্তায় কেন বেরিয়েছিলেন মনে পড়ল না কমলাক্ষর। হঠাৎ যখন খেয়াল হল রোদটা বড়ো চড়া হয়ে উঠেছে, তখন ফিরতি মুখ ধরলেন। আর বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে একটা আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করলেন।

এত কথা শোনার পর, আর সে-সব কথা প্রায় বিশ্বাস করে নেওয়ারও পরে লীলাকে লীলাই মনে হচ্ছে। ভয়ানক একটা ঘৃণ্য অপবিত্র কদর্য জীব বলে মনে হচ্ছে না।

'তাহলে ফিরে এলেন? আমি ভাবছিলাম রাগে-ঘেন্নায় বোধ হয় চলেই গেলেন। করুণাপদ পড়ে, ভেবে পাচ্ছিলাম না কাকে দিয়ে আপনার জিনিসগুলো স্টেশনে পাঠিয়ে দেব। ট্রেনের সময় অবধি থাকতেনই তো স্টেশনে।'

কমলাক্ষর এতক্ষণে মনে পড়ল তাঁর হাটে যাওয়ার কথা ছিল। মনে পড়ল করুণাপদর জন্যে একটু ওষুধ আনবেন ভেবেছিলেন। কিচ্ছু করেননি। শুধু হাতে ফিরেছেন।

লজ্জায় মাথাকাটা গেল। তবু লীলার ওই একঝাঁক কথার একটা উত্তর না দিয়ে পারলেন না। বললেন, 'এতগুলো কথা ভাবতে পারলেন, আর চলে যাওয়াটা সম্ভব কি না সেটা ভাবতে মনে পড়ল না?'

লীলার মুখটা কী ক্লান্ত বিবর্ণ শুকনো দেখাচ্ছে! প্রথম যেদিন এসে দেখেছিলেন, তার থেকে কত বদলে গেল। সাজ বদল করেনি, তবুও কী বদলানোই বদলেছে!

তা হোক, শুকনো বিবর্ণ ক্লান্ত যাই হোক, হাসিটা ঠিক আছে। আর বোধ করি হেসে ভিন্ন কথা কইতেই পারে না লীলা। কে জানে, গগন গাঙুলীদের সাথে কথা বলতে হলেও লীলা এমনি হাসি মিশিয়ে কথা কয় কি না।

লীলা হাসল। 'সেটা মনে পড়ানো উচিত ছিল বুঝি?'

'ছিল।'

'তবে আমারই অন্যায়। কিন্তু মানুষের হিসেব মতো আপনার তো চলে যাবারই কথা।'

কমলাক্ষ বললেন, 'মানুষের হিসেবে যখন মিলছে না, তখন বোধ করি অমানুষ। নইলে আর হাটে যাব বলে বেড়িয়ে এসে শুধু হতে বাড়ি ফিরি?'

'হাটে যাবেন বলেই বেরিয়েছিলেন বুঝি?'

'এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'তখন হচ্ছিল না?'

'কি জানি।'

সহসা একটু গম্ভীর হয়ে যায় লীলা। গম্ভীর হয়ে বলে, 'কিন্তু কেনই বা আমাকে ঘেন্না করবেন না আপনি?'

'তাই তো আমিও ভাবছি সেই থেকে।'

কমলাক্ষ তাকালেন বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে। যে-দৃষ্টির খবর তিনি নিজেও জানেন না।

'আমার সব কথা শুনলে, এ-ভাবনা বজায় রাখা শক্ত হবে। ঘেন্না না করে পারবেন না।'

কমলাক্ষ মৃদু হাসলেন। 'সবই শুনেছি।'

'সব? বলুন তো শুনি কতটা কি শুনেছেন।'

কমলাক্ষ আর একটু হাসলেন। বললেন, 'বেশি বলার দরকার কি? গগন গাঙুলীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এইটুকু বললেই বুঝে নিতে পারবেন না?'

লীলা কিন্তু আর হাসে না। লীলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আর সেই গম্ভীর হয়ে যাওয়া লীলাকে দেখে মনে হয় এই বুঝি আসল লীলা। ওই হাসি মেশানে কথা কওয়া লীলা, সাজানো লীলা। ওটা লীলার ছদ্মবেশ। অত গভীরতায় তলিয়ে থাকলে, কেউ ওর নাগাল পাবে না বলে দয়া করে ওই হালকা হাওয়ার চাদরটা জড়িয়ে বসে আছে।

এখন লীলা সেই ছদ্মবেশ ত্যাগ করেছে। নিজের আসল সুর আর স্বর নিয়ে বলছে, 'গগন গাঙুলীই কি সব জানে?'

কমলাক্ষ উত্তর দিলেন না। এই গভীরতাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখবার ইচ্ছে হল না তাঁর। চুপ করে থাকলেন।

লীলাই ফের কথা বলল। 'জানে না। জানে কি, বামুনের মেয়ে হয়ে শূদ্রের ছেলের সঙ্গে, মনিবের মেয়ে হয়ে চাকরের সঙ্গে, পালিয়ে আসা ছাড়াও, আরও ভয়ঙ্কর অপবিত্রতা আছে আমার মধ্যে? জানে কি, বিখ্যাত সেই আপনাদের 'দাঙ্গা'র হাজার বলির মধ্যে আমিও একটা বলির পশু?'

কমলাক্ষ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। অস্ফুটে একবার যে উচ্চারণ করেছিলেন 'চাকর?' আর তার উত্তর পাননি, সে-কথা ভুলেই গেলেন।

কিন্তু লীলা বুঝি ভোলেনি। তাই লীলা বলে ওঠে, 'লোকে বলে চাকর। পরিচয়টা তাই ছিল। বাবার প্রেস ছিল, আর ও ছিল সামান্য কম্পোজিটার। প্রুফ কারেক্টার নিমাইবাবু নাকি বলতেন, ছাপাখানার সব ভূত কি তোর মাথাতেই এসে অধিষ্ঠান করে ব্রজেন?...তা হয়তো তাই।' খুব আস্তে আস্তে ফেলা একটা নিশ্বাস যেন চুপি চুপি বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। যেন ওকে দেখতে পাওয়া গেলে লজ্জায় নীল হয়ে যাবে ও।

'ভূতই অধিষ্ঠান করেছিল ওর মাথায়। নইলে মেয়ে লুঠ হয়ে যাবার পর মা-বাপ পর্যন্ত যখন 'মনে করব মরে গেছে' বলে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, মাইনে করা চাকর ব্রজেন ঘোষের কি দরকার পড়েছিল জীবন মরণ তুচ্ছ করে তাকে খুঁজে বেড়ানোর? কী দরকার পড়েছিল বাঘের গুহা থেকে উদ্ধার করে এনে আজীবন তাকে মাথায় বয়ে বেড়ানোর?'

কমলাক্ষ এবার কথা বললেন 'বাড়িতে বুঝি আর গ্রহণ করলেন না?'

'পাগল হয়েছেন? তাই কখনও করে? তাদের আরও সব রয়েছে না? একটা মেয়ের জন্যে সব খোয়াবে নাকি? থাক, ও তো একেবারে পচা গলা কথা। হাজার হাজার জনের একজন আবার নতুন কথা কি শোনাবে? নতুন শুধু ওই রোগা হ্যাংলা মুখচোরা কম্পোজিটারটার পাগলামীর গল্প। তার আগে লোকটা মনিবের মেয়ের সঙ্গে গুনে দশটা কথাও বলেছে কি না সন্দেহ! অথচ—সাধে কি আর বলছি ভূতাশ্রিত! নইলে ওইটুকুকে সম্বল করে দুর্জয় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে? আর সারাজীবন একটা অশুচি অপবিত্র বোঝা মাথায় নিয়ে—'

কমলাক্ষ স্থির স্বরে বললেন, 'এ পর্যন্ত সবই বুঝতে পারলাম। বুঝতে অসুবিধে হল না। শুধু

একটা কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে—সংসার যখন আপনাকে ত্যাগ করেছিল, বিয়েটার বাধা ছিল কোথায়?'

লীলা মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বলে, 'সে কথা এই খানিক আগেই ভাবছিলাম। বাধা ছিল হয়তো ওর নিজের মধ্যেই। নিজেকে বোধ করি মনে মনে কিছুতেই আর মনিবের মেয়ের পর্যায়ে তুলতে পারল না। তাই সমস্ত সাজানো পরিচয়, ড্রইং রুমের সাজের মতো বাইরেই পড়ে থাকল। ও শুধু সৃষ্টিছাড়া এক অস্বস্তি নিয়ে সারা জীবন পালিয়ে বেড়াল।'

কেন কে জনে কমলাক্ষ সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। আরক্ত মুখে বলেন, 'বাধা শুধু তাঁর মধ্যেই ছিল না, ছিল আপনার মধ্যেও। নইলে সেই, 'সৃষ্টিছাড়া অস্বস্তির বাধা' ধূলিসাৎ হতে দেরি হত না। আপনিও কোনোদিন তাঁকে মানুষ ভাবেননি। তাই—'

'তা সত্যি—' কথার মাঝখানেই উত্তর দেয় লীলা। আস্তে শান্ত গলায় বলে, 'সত্যিই মানুষ ভাবিনি! রক্তমাংসের মানুষ! পাথরের দেবতাই ভেবে এসেছি বরাবর।'

জরাজীর্ণ দেহটা নিয়ে করুণাপদ যেদিন 'পোরে'র ভাত দিয়ে পথ্যি করতে বসল, সেদিন কমলাক্ষর ছুটির শেষ দিন।

ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিলেন কমলাক্ষ। আজ ফিরবার কথা ছিল। কলকাতা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে তাঁর একটা কর্মজগৎ আছে, এসব যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। আর প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সেই ছোটো দোতলা বাড়িখানা? সেটাই কি স্পষ্ট আছে?

সে-বাড়িতে কি কখনও কারও অসুখ করেনি? কই কমলাক্ষর তো মনে পড়ছে না, তিনি কোনোদিন নিজের হাতে বরফ ভেঙেছেন, ফলের রস করেছেন, পাখা হাতে রাত জেগেছেন। ব্রজেন ঘোষের চাকর করুণাপদর জন্যে এসব করেছেন কমলাক্ষ। ব্রজেন ঘোষের কাছে কত ধার ছিল কমলাক্ষর?

তবে আশ্চর্য, খুব খারাপও কিছু লাগেনি। বরং কেমন একটা দৃঢ়তা আর উৎসাহের ভাবই মনে এসেছে। যে-রাত্রে তাঁর জাগার জন্যে লীলার একটু ঘুমোতে পেয়েছে, সে রাত্রিটা তো মধুর একটা গানের মতো লেগেছে।

আর যে-রাত্রে রুগী বিকারের ঝোঁকে তেড়ে তেড়ে ওঠার জন্যে দু'জনকেই জেগে বসে থাকতে হয়েছে?

ও রকম ভীতিকর পরিস্থিতিটাও অমন ভালো লাগত কি করে ভেবে পাচ্ছেন না কমলাক্ষ। 'প্রবাস আবাসে'র এই বাড়িটার মোহময় জাদু? যে-জাদুর ছোঁয়ায় প্রথম দিনই কমলাক্ষ যেন আর এক জগতের খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন?

কিন্তু বড়ো বেশি ভালোলাগা সেই দক্ষিণের জানলাগুলো তো কতদিনই খোলা হয়নি। সে-ঘরে থাকাই হয়নি কতদিন।

করুণাপদর জ্বরটা যেদিন চড়ে উঠে বিকারে দাঁড়াল, সেদিন কমলাক্ষ হাসপাতালের কথা তুলেছিলেন। লীলা বলেছিল, 'হাসপাতালে দেওয়া যাবে না। হাসপাতালে ওর বড়ো ভয়। একবার পক্স হয়েছিল, হাসপাতালের নাম শুনে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল। ওর ধারণা যে ওখানে গেলেই মরে যাবে।'

কমলাক্ষ বলেছিলেন, 'ওদের ক্লাসের সকলেরই প্রায় ওই ধারণা। কিন্তু এখন তো ও টেরও পাবে না কোথায় আছি। দিলে ফল ভালো হত।'

লীলা হেসেছিল, 'ফল ভালো হবেই এমন গ্যারান্টি কে দিচ্ছে? খারাপও হতে পারে। তেমন হলে নিজেকে আমি কি জবাব দেব বলুন? মা বাপ ছেড়ে এসেছে, আমায় 'মা' বলে ডাকে—'

কি একটা কাজের ছুতোয় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়েছিল লীলা। আর কমলাক্ষ স্টেশনে ছুটেছিলেন

বরফ আনতে। তারপর কে জানে কোথা দিয়ে কেটে গেছে এতগুলো দিনের দিনরাত। দিনগুলি যে এতগুলো, আজ ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে অনুভব হচ্ছে।

পুণ্ডরীকের চিঠিখানা খুললেন কমলাক্ষ। সকালের ডাকে যেটা এসেছে ও জানিয়েছে, আজই যখন কমলাক্ষর ফেরার দিন, তখন আর বাড়তি ব্যস্ত করবার দরকার বিবেচনা করেনি সে, তবে জানিয়ে যাবার জন্যে জানাচ্ছে, কয়েকদিনের জন্যে দার্জিলিং যাচ্ছে সে আজ। আর যাবার আগে তার দিদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে বাড়িতে রেখে যাচ্ছে। খুব স্বাভাবিক আর সাধারণ চিঠি। শুধু শেষের একটা লাইন ঘুরে ফিরে চোখের সামনে এসে যেন তর্জনি তুলে দাঁড়াচ্ছে—।

লাইনটা 'পুনশ্চ'র—

'হ্যাঁ ভালো কথা—আপনার পলাশপুর থেকে একটা অদ্ভুত চিঠি এসেছে, অর্থ হৃদয়ঙ্গম হল না। লেখকের নামও নেই।'

কী সেই অদ্ভুত চিঠি? যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না?

কমলাক্ষ কি ছেলের এই চিঠির কথা লীলাকে বলবেন? বলবেন, 'দেখুন তো আপনাদের এখান থেকে আমরা ছেলের কাছে বেনামী চিঠি লেখবার দরকার কার পড়ল? কে আছে তেমন লোক?'

অবশ্য 'কে আছে' সেটা বোঝা শক্ত নয়। কমলাক্ষ সনাক্ত করেছেন তাকে। গগন গাঙুলী ছাড়া আর কে?

অপরের কথা ভিন্ন যারা থাকতে পারে না, অপরের একটু অনিষ্ট করতে পেলে যারা মনে করে জগতে এসে তবু একটা 'পরম' কিছু করা হল—গগন গাঙুলী সেই জাতের লোক।

কিন্তু কী লিখেছে সে? যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না?

পুণ্ডরীক লিখেছে, 'দিদিকে এনে রেখে যাচ্ছি। আর আপনি তো কালই এসে পড়ছেন।' কমলাক্ষর খেয়াল হল পলাশপুরে এসে পর্যন্ত মেয়েকে তিনি একটাও চিটি দেননি। খুব বেশি চিঠি দেওয়ার অভ্যাস তাঁর না থাকলেও, এক আধটা দেওয়া উচিত ছিল। দেননি। দেবার কথা মনেও পড়েনি। কমলাক্ষ ভাবলেন, আজ আমার যাবার কথা ছিল।

ভাবলেন, আজ আমি যাব কি করে?

'আমার কথা ভাবছেন আপনি?' লীলা সত্যি অবাক হয়ে গেছে। 'আমার কি হবে, সে-কথা আপনি ভাবতে বসবেন।'

কমলাক্ষর ইচ্ছে হল খুব ভালো একটা উত্তর দেন, কিন্তু মুখে জোগাল না কিছু। তাই বললেন, 'তা একজন কাউকে তো ভাবতে হবে?'

'কেন? হবে কেন? ভগবানও যার জন্যে ভাবছেন না, এমন লোকেরই কি অভাব আছে সংসারে?'

'বিশ্ব সংসারে সবাইয়ের ভাবনা ভাববার গরজ আমার সেই।'

'কিন্তু আমার ভাবনা ভাববার গরজই বা কেন হচ্ছে আপনার, সেও তো এক রহস্য।'

কমলাক্ষ উত্তেজিত হলেন। বললেন, 'সেটা একটা রহস্য হল আপনার কাছে? ব্রজেনবাবু মদের বদলে স্পিরিট খেয়ে মরবেন, করুণাপদ দেশে যাবে বলে গোঁ ধরবে, আর—'

হঠাৎ থেমে গেলেন। রাগের মাথায় ব্রজেনবাবুর মৃত্যু রহস্যটা এইভাবে উদ্‌ঘাটিত করে ফেলে মরমে মরে গেলেন। চাবুক মারতে ইচ্ছে হল নিজেকে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে তিনি।

গণ্ডমুখ্যু ব্রজেন ঘোষ যে লীলার কাছে কি, তা তো তাঁর অবিদিত নেই। তার মৃত্যুর এই শোচনীয় কারণটা জানিয়ে লীলাকে নতুন করে আবার শোকের মধ্যে ফেললেন তিনি। রাগলে এত গোঁয়ার হয়ে ওঠেন তিনি, তা তো জানা ছিল না!

কিন্তু কই, চমকে উঠল না তো লীলা! শুনে 'কাঠ' হয়ে গেল না তো? সেই ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলল, 'স্পিরিট খাওয়ার কথাটা জানা হয়ে গেছে আপনার?'

কমলাক্ষই চমকে গিয়ে চুপ করে থাকেন।

লীলা আবার বলে, 'এ অভ্যাস ওর নতুন নয়। আমি টাকা বন্ধ করলেই ওই কাণ্ড করত। সেদিন বেশি খেয়ে ফেলেই—দোষ আমারই। দেবতা হবারও যে একটা মাশুল লাগে, সেটা কিছুতেই খেয়ালই করতাম না আমি। পুরোপুরি পাথরের দেবতাই দেখতে চাইতাম। তাছাড়া—' হাসল লীলা, 'টাকাও তো—'

কমলাক্ষ ব্রজেন ঘোষকে ভালোবেসেছিল। তাই কমলাক্ষর কণ্ঠে ক্ষুব্ধ স্বর ফোটে, 'এ তো একরকম আত্মহত্যাই। এ খবর আপনি জানেন, অথচ একদিনের জন্যে উচ্চারণ করেননি? আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হচ্ছেন? এটাও আমার পক্ষে আশ্চর্য। আমি যে কত বড়ো নিষ্ঠুর সেটা বুঝি এতদিনও টের পাননি?'

'না পাইনি। কারণ সত্যি নিষ্ঠুর আপনি নন। করুণাপদর ব্যাপারও তো দেখলাম। শুধু ওই হতভাগা ব্রজেন ঘোষের বেলাতেই—আপনি বলেছিলেন টাকা ছিল না। কিন্তু উনি যখন মারা গেলেন, অনেক টাকা ছিল আপনার কাছে। একগোছা নোট নিয়ে দিতে এসেছিলেন আমাকে—'

হঠাৎ হেসে ওঠে লীলা। খুব একটা কৌতুকের হাসি। বলে, 'এই আপনাদের মতো লোকদের দেখলে আমার বড়ো মায়া হয়। টাকার রহস্যটা বুঝি ফাঁস করিনি এখনও? তাহলে করেই ফেলি, কি বলুন? ঘরে নেই টাকা, অথচ চোখে আছে চক্ষুলজ্জা। দেখুন কী বিপদ? ভেবে দেখলাম এর একমাত্র সমাধান চুরি করা—'

'চুরি করা।' স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন কমলাক্ষ।

লীলা তেমনি হাসতে হাসতেই বলে, 'না তো কি! বিশ্বসুদ্ধ লোকই তো কোনো না কোনো বস্তু চুরি করছে, ওতে আর দোষ কি? আর চক্ষুলজ্জার দায়ে চুরি ডাকাতি তো—যাক ওইসব ভেবে চটপট সমাধানটা করে নিলাম আর সেই চুরির টাকাটা আপনাকে দিতে এলাম।'

'কক্ষনো না'। কমলাক্ষ চটে ওঠেন, 'যা তা বোঝাতে এসেছেন আমাকে? সেই অবস্থায় আপনি গেলেন চুরি করতে? আর এ আপনার পলাশপুরের লোক এত বেহুঁশ যে দিন দুপুরে বাক্স আলমারি খুলে রেখে ঘুমোচ্ছিল আপনার সুবিধের জন্যে।'

লীলার চোখে কৌতুক। লীলার চোখে বিচিত্র এক দৃষ্টি। আর বুঝি বা লীলার চোখে জল।

'পলাশপুরের লোক বেহুঁশ একথা কে বললে আপনাকে? না পলাশপুরের লোক এত বেহুঁশ নয়। বেহুঁশ হচ্ছে কলকাতার লোক, যারা খোলা সুটকেসে, বইয়ের পেজ মার্কে নোটের গোছা রেখে দিয়ে চোরের সুবিধে করে রাখে।'

বৃষ্টি পড়ছিল।

গ্রীষ্মের আকাশে নতুন মেঘ। কমলাক্ষর জানালা দিয়ে ঝাপটা আসছিল, তবু খোলা রেখেছিলেন। আর ভাবছিলেন, এমন আশ্চর্য মেয়ে কি তিনি জীবনে কখনও দেখেছেন? যে-মেয়ে নিজের মুখে স্বীকার করতে পারে, যার সঙ্গে বসবাস করি আমি, সে আমার স্বামী নয়। স্বীকার করতে পারে একটা লুঠেরা তাকে লুটে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করেছে, স্বীকার করতে পারে চক্ষুলজ্জার দায়ে চুরি করতে তার বাধে না। যার ধার ধারে তার বাক্স খুলে চুরি করেই ধার শোধ করতে আসতে পারে সে!

আশ্চর্য! তা সত্যি। তবু মেয়ে। কমলাক্ষ কি করে পারবেন তার দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা না করতে? অথচ লীলা কিছুতেই এই সহজ কথাটা বুঝতে চাইছে না। বলছে, 'আমার জন্যে আপনি ভাবতে যাবেন কেন?'

কেন কি! মানুষ মানুষের জন্যে ভাববে না?

কমলাক্ষ ঠিক করলেন, লীলাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন, যাতে সেখানেই ওর কোনো একটা কাজকর্ম জোগাড় হয়, তার ব্যবস্থা করে দেবেন। একা থাকবে? তা একা তো ওকে থাকতেই হবে বাকি জীবনটা। তবু কমলাক্ষ তো কাছেই থাকবেন, দেখাশোনা করবেন।

পলাশপুরের এই বাড়িটা! এ-বাড়িটা তো লীলার কাছে মিথ্যা হয়ে গেল। লীলা তো আর 'প্রবাস বোর্ডিং' চালাবে না। বাড়িটা বিক্রি করে বরং লীলার কিছু টাকার সংস্থান করে দিতে পারলে—

মনটা কেমন খচ্ করে উঠল। এই বাড়িটা আর লীলার থাকবে না? কমলাক্ষ জীবনে আর কোনোদিন ওই দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিয়ে মাঠের অন্ধকারে চোখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পাবেন না?

হঠাৎ মনে হল কমলাক্ষই যদি বাড়িটা কিনে নেন? মানুষ কি এমন মফঃস্বলে বাড়ি-টাড়ি কেনেন? ছুটির সময় মাঝে মাঝে হাঁফ জিরোতে? সেই বেশ। সেই ঠিক। ছুটির সময় লীলারও তো ছুটি-টুটি হবে?

কমলাক্ষ বলবেন, 'চলুন ক'টা দিন পলাশপুরে কাটিয়ে আসা যাক।'

কল্পনার যৌক্তিক অযৌক্তিকটা মাথায় এল না, একটি জ্যোতির্ময় স্ফটিকের ভেলায় চড়ে সেই কল্পনার সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন কমলাক্ষ।

বৃষ্টির শব্দ বহির্জগৎকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে বাজতে লাগল ঝিম্ ঝিম্ ঝির্ ঝির্।

'মুখুজ্জেবাবু!'

একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে দেওয়াল ধরে ধরে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। ও যে করুণাপদ, তা বুঝতে সময় লাগল কমলাক্ষর। বুঝে চমকে উঠে বললেন, 'কিরে, তুই আবার এই ঠাণ্ডায় বাইরে এসেছিস কেন?'

'কম্বল মুড়িয়েছি।'

'তা বেশ করেছ। কিন্তু কি দরকার? কি বলতে এসেছিস্?'

'আজ্ঞে বলছিলাম কি, আমি আর দেশে যাবার জন্যে বায়না করব না।'

স্ফটিকের ভেলাটা একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে গেল, কমলাক্ষকে আছড়ে ফেলে দিল বালির চড়ায়। কমলাক্ষ সেই আছাড়ের ধাক্কায় ছিটকে উঠলেন।

'বায়না করবে না! চমৎকার! তা কেন করবে না সেটি শুনতে পাই না?'

'আজ্ঞে তখন অসুখের ঘোরে বাড়ি বাড়ি মন করেছিল। এখন চিন্তা করে দেখছি চলে গেলে মায়ের অসুবিধে।'

'মায়ের অসুবিধে! চিন্তা করে দেখছ!' কমলাক্ষ চৌকী ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছে সরে এলেন, ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ মিশ্রিত চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'খুব যে চিন্তাশীল হয়ে উঠেছ দেখছি। বলি, আবার যদি তুমি জ্বরে পড়, মায়ের সুবিধেটা কোথায় থাকবে, সেটা চিন্তা করে দেখেছ?'

'আবার জ্বরে পড়তে যাব কেন?'

'যাবে কেন? হুঁঃ! যাবে, নিশ্চয় যাবে। এই এখন থেকে হাটে-ফাটে গেলে পড়তেই হবে। না না, তুমি দেশেই চলে যাও।'

'রাগ করছেন কেন বাবু? রোগের ঝোঁকে 'গোঁ' ধরেছিলাম বই তো নয়। এখন মায়ের কথাটা তো ভাবতে হবে।'

'ভাবতে হবে?' কমলাক্ষ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'না ভাবতে হবে না। কেন, তুমি ছাড়া তোমার মায়ের জন্যে ভাববার আর লোক নেই?'

কমলাক্ষর স্বভাব তো এমন ছিল না। কমলাক্ষ আজকাল বড়ো বেশি উত্তেজিত হচ্ছেন যেন। হঠাৎ স্বভাবটা এমন বদলে গেল কেন কমলাক্ষর?

'কী হচ্ছে?' লীলার প্রশ্নটা প্রায় একটা ধমকের মতো এসে ধাক্কা দেয়। 'ও বেচারা রোগা মানুষ, ওকে বকাবকি করছেন কেন? আমিই তো ওকে বলেছি, এখন দেশে গেলে চলবে না বাপু। কে বোর্ডিং-এর দেখাশোনা করবে?'

'কে দেখাশোনা করবে!' কমলাক্ষ ফের চৌকীতে বসে পড়ে বলেন, 'তা হলে হোটেল চলবে?'

'চালাতে হবে। পেটটা তো চলা চাই?'

'পেট চালাবার জন্যে ওই করুণাপদকে ভরসা করে এই শত্রুরাজ্যে বসে হোটেল চালিয়েই চলবেন?'

'তাই তো চালিয়ে এলাম এতদিন। করুণাপদই তো সব দেখেছে। মালিক আর কতই বা দেখেছেন! ইদানীং তো—'

'তা হোক!' কমলাক্ষ ভারী গলায় বলেন, 'তবু ব্রজেনবাবু ছিলেন। সেই থাকাটাই মূল্যবান। এখন এই নিরভিভাবক অবস্থায়—না না, সে তো একেবারেই হতে পারে না।'

'ভাবছেন কেন? আমি ঠিক চালিয়ে নেব।'

'চালিয়ে নেবেন!' কমলাক্ষ বলে ওঠেন, 'নেবেন বলেই নিতে দেব? আমি বলছি এ-খেয়াল আপনাকে ছাড়তে হবে।'

লীলা একটুক্ষণ থেমে থেমে আস্তে বলে, 'আপনি বললে, ছাড়তেই হবে। কিন্তু আমার দায়িত্বটা আপনার কর্তব্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেলে আপনার জীবনেও তো অনেক জটিলতা এসে দেখা দেবে।'

কমলাক্ষ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'জীবন যখন আছে, তখন তার জটিলতাও থাকবে।'

গগন গাঙুলী পাশের প্রতিবেশীর দাওয়ায় উঠে এসে বলেন, 'বুঝলেন মশাই, এখন বুঝছি—কলকাতার ওই প্রফেসরটি? ওটি হচ্ছে একটি চরিত্রহীন লোক। কে জানে মশাই নাম পরিচয় সত্যি কি না। নইলে—মানে বিশ্বাস করবেন, লোকটা এই মাসাধিককাল ধরে পড়ে আছে আমাদের ব্রজেনবাবুর—না ব্রজেনবাবুর আর বলি কি করে—ব্রজেন গিন্নির হোটলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে এই ভদ্রলোকের আগমনে, আর ভাবগতিক দেখেই ব্রজেন ঘোষটা মনের ঘেন্নায় সুইসাইড করেছে। এদিকে তো আবার লোকটা ইয়ে, খুব সেন্টিমেন্টাল ছিল তো? আপনার কাছে গল্প করেছিলাম মনে আছে বোধ হয়, সেই যেবার আমার বড়ো শালীর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব ওই 'প্রবাস আবাসে' সিট নেওয়ায় ওনাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল?...মনে নেই? বলেন কি? আহা হা—সেই যে, আমার বাড়িতে কুটুমরা এসে পড়েছে, অথচ গিন্নির শরীর খারাপ, ঠেলে তাদের পাঠিয়ে দিলাম এই হোটেলে। আর আমার নাতজামাইয়ের দিদি এসে প্রকাশ করে দিল, মাগী বিয়ে করা বর বলে যাকে চালাচ্ছে, সে লোকটা আসলে ওর বাবার চাকর! ওকে নিয়ে ফেরার হয়েছে। সেই সেবার দেখেছি তো।

'যখন ডাকিয়ে এনে প্রশ্ন করলাম—খবর সত্যি কি না, তখন ব্রজেনের যা অবস্থা দেখেছিলাম! লজ্জায় বুঝি মারাই যায়। দেখে আশ্চর্যই লাগল যে এই লোক এই কাজ করেছে! এখন বুঝছেন তো কে করেছে? ওই মেয়েমানুষটি। এবার এটি বোধ হয় নতুন প্রেমিক জুটিয়েছেন।'

প্রতিবেশী ইতস্তত করে বলেন, 'কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখলে তো ঠিক তা মনে হয় না।'

'শুনুন বিত্তান্ত। দেখলেই যদি চেনা যাবে, তবে আর 'ছেনাল' বলছে কেন? ওই দেখতে যেন কতই আরিস্টোক্র্যাট। আরে মশাই, আমরা মানুষ চিনি। বলে কত অ্যারিস্টোক্রেসি ধুয়ে জল খেলাম। ওই আপনার প্রফেসরটিকেও তো প্রথম দেখে তাই মনে হয়েছিল। এখন দেখছেন তো প্রবিত্তি? দুদিন দেখেই হোটেলওলির সঙ্গে মজে গেলেন।...ওই যখনই দেখেছি এ পথ দিয়ে হাঁটা ছেড়েছে, তখনই

বুঝেছি 'ব্যাপার' আছে। আমার তো ধ্রুব বিশ্বাস কোনোরকম বাড়াবাড়ি দেখেই হতভাগা ঘোষটা মরে কেলেঙ্কারি করল। কে জানে চাকর ছোঁড়াটাকেও ভবধাম থেকে সরাবার তোড়জোড় চলছিল কি না।...ডাক্তারবাবুকে ধরে পড়েছিলাম। তা ডাক্তারবাবু বললেন, না, না টাইফয়েড। বিশ্বাস হল না। নির্ঘাৎ টাকা খাইয়েছেন।...যাক, ছোঁড়া নাকি এ-যাত্রা বেঁচে গেছে। তা রাখবে না, দেশে পাঠিয়ে দেবে। তারপর বোধ হয় মাগীকে নিয়ে ভাগবে। বয়সের গাছ পাথর নেই মশাই এদের সব, তবু দেখুন কী প্রবিত্তি!'

প্রতিবেশীটি গগন গাঙুলীকে ডরান। তাই প্রতিবাদের সাহস পান না। শুধু বলেন, 'আপনি এত সব জানলেন কি করে?'

'আমি? জানলাম কি করে বলছেন? হুঁ! ওইটুকুই সম্বল করেই তো বেঁচে আছি মশাই। নইলে এই পলাশপুরে কি মানুষ টিঁকতে পারে? যাই দেখি শ্রাদ্ধ আর কতদূর গড়ায়।'

ব্রজেন ঘোষেদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবার পর থেকে 'প্রবাস আবাসের' খদ্দেরের মন ভাঙানোই পেশা হয়েছে গগন গাঙুলীর। ঠিক যেমন তার আগে পেশা ছিল হোটেলের খদ্দের জোগাড় করবার। নিত্য দু'বেলা ট্রেনের সময় স্টেশনে হাজির হতেন গগন গাঙুলী, আর যাত্রী দেখলেই বলতেন, 'উঠবেন কোথায়? বাড়ি ঠিক করে এসেছেন? বিদেশে বেড়াতে এসে মিথ্যে কেন রাঁধাবাড়ার ঝঞ্ঝাটে জড়াবেন মশাই? গেরস্ত পরিচালিত ভালো বের্ডিং রয়েছে। চার্জ কম খাওয়াদাওয়া ভালো, ঘর কমফর্টেবল—।'

কিন্তু ওই তাঁর নাতনীর ননদ দ্বারা পরিবেশিত সংবাদের পর থেকেই পেশা বদলে গেল গগন গাঙুলীর। হঠাৎ তাঁর মাথায় ঢুকল ওই শুঁটকো ব্রজেন ঘোষ আর ওই দেমাকি মেয়েটা তাঁকে বেদম ঠকিয়েছে।

তিনি গগন গাঙুলী, তাঁর নাকে দড়ি পরিয়ে ঘুরিয়েছে ওরা! সেই অবধি খদ্দের ভাগানোই পেশা করেছেন।

তা এ-যুগে লোক খুব একটা বিচলিত হয় না ওতে। স্বামী-স্ত্রী নয়, তবু স্বামী-স্ত্রী সেজে ব্যবসা চালাচ্ছে—এ এমন একটা কিছু নতুন কথা নয়।

খাওয়া ভালো, যত্ন ভালো, থাকার ঘর ভালো, চার্জ কম, এ কি সোজা নাকি? খদ্দের ভাঙে না। সিজনের সময় লোক ধরে না। জায়গা পায় না।

সেই কথাই বলে করুণাপদ, 'এখন এই রকম দেখছেন বাবু, সিজিনের সময় ঠাঁই দেওয়া যায় না। একটা ঘরে দু-তিনটে সিট্ করতে হয়। এমন একটা চালু ব্যবসা তুলে দেবেন?'

'সিজনের সময় লোক ধরে না?' কমলাক্ষ অবাক হয়ে বলেন, 'তবে তোমার মার এত অর্থকষ্ট কেন?'

করুণাপদ ঘাড় নীচু করে বলে, 'সে আজ্ঞে বলতে গেলে বাবুর কারণেই।'

'ওরে করুণা গল্প রাখ। দেখ বাইরে বোধ হয় রিকশা এল'—লীলা এসে ডাক দেয়, 'ছুটে যা। জানি না কে, যদি খদ্দের হয়, বলবি সিট্ নেই।'

'বলব সিট্ নেই!'

'বলবি বইকি।'

'তা হলে তুলেই দিচ্ছেন? তবে যে আমায় বললেন, করুণা তুই—'

'আরে বাবা সওয়াল সাক্ষী রাখ এখন। ছুটে যা—'

কিন্তু যেতে আর হল না করুণাপদকে, ততক্ষণে একটি অষ্টালঙ্কারভূষিতা মহিলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসেছেন। একেবারে কমলাক্ষর সামনা-সামনিই দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

কমলাক্ষ উঠে দাঁড়ান। স্খলিত স্বরে বলেন, 'এ কী!'

মহিলাটি কঠিন মুখে বলেন, 'আমিও আপনাকে ঠিক সেই প্রশ্ন করছি বাবা!'

অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে ফুটে উঠেছে আলোকবিন্দু, নিশ্চেতন জড়তার স্তর থেকে উঠে আসছে চেতনার বুদ্বুদ, আতঙ্কের পঙ্ক থেকে জন্ম নিচ্ছে সত্যের শুভ্র কমল।

হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে এল বলে দিশেহারা হলে চলবে না, খুলে ধরতে হবে বন্ধ দরজায়। কমলাক্ষ তাঁর সন্তানকে ভয় করবেন না। তাঁর আর নীরজার।

'ভর রোদ্দুরে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে গগনবাবু? কী ব্যাপার?'

গগন গাঙুলী সোলার-হ্যাটটা মাথায় চেপে বইয়ে নিয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি একটি রগড় দেখার আশায়।'

প্রতিবেশী মৃদু হাসেন। 'এতও রগড় জোটে আপনার!'

'জুটবে না মানে? ওই তালেই থাকি যে। দুটি বেলা স্টেশন পাহারা দিতে যাই কি আর বেগার খাটতে? এই পলাশপুরে কে মাথাটি ঢোকালো, তার খবরটি নখদর্পণে রাখি। আজ তো জালে একমুনী রুই—'

প্রতিবেশীর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন। বলেন, 'মেয়ে! বুঝলেন? নিজে এসে হাজির হয়েছে। বাপের চুলের মুঠিটি চেপে ধরে নিয়ে যেতে—'

কে, কার, কি বৃত্তান্ত শ্রোতার অবিদিত। তাই তিনি বোধকরি রহস্য আরও ভেদ হবার আশায় 'হাঁ' করে তাকিয়ে থাকেন।

গগন গাঙুলী সোলা-হ্যাট সমেত মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেন, 'কী মশাই, হাঁ হয়ে যে? ধরতে পারেননি? নাঃ, রসবোধ বড়ো কম মশাই আপনাদের। প্রফেসরের মেয়ে! এই এগারোটার গাড়িতে এল!' গগন গাঙুলী অকারণেই গলাটা নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন, 'বাপের টুঁটিটি টিপে নিয়ে যেতে এসেছে।'

প্রতিবেশী অবাক হন। 'কি করে জানলেন?'

'হু হুঁ বাবা! বুঝতে হলে ব্রেন চাই। আর সেই ব্রেনের চাষ করছি কি আজ থেকে? পলাশপুর স্টেশনে পা দিয়েই খোঁজ করেছে ফেরবার গড়ি কখন আছে, টাউনের ভেতর রিকশা-টিকশা পাওয়া যায় কি না। রিকশাওয়ালারা সব রাস্তা চেনে কি না। পারলাম না স্থির থাকতে, এগিয়ে গেলাম। বললাম, কোন্ বাড়িতে যাবে মা লক্ষ্মী! তা মেয়ে তো নয়, যেন আগুনের ডেলা। বলল, জেনে আপনার কী দরকার? শুনুন! ভদ্রলোকের কথা শুনুন! তবু মান খুইয়ে বললাম, আমার আর কিসের দরকার? এই একটু পরোপকার করার ব্যাধি আছে তাই—

'শুনে একটু নরম হল। বলল, 'প্রবাস-বোর্ডিং' বলে কি হোটেল আছে—

'মনকে বলি, ওরে মন, যা ভেবেছিস তাই। আহ্লাদ চেপে বললাম, 'হ্যাঁ জানি বইকি, ওই দিকেই তো এই অধম ছেলের বাস।...তা বলব কি আপনাকে এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল, যেন বুকের ভেতর পর্যন্ত সার্চলাইট ফেলল। তারপর কাঠ কাঠ মুখে বলল, ও বুঝেছি। আচ্ছা রিকশাওলাকে জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন তো—

'বুঝিয়ে আর কাকে দেব? রিকশাটা তো আমাদের সীতারামের।...তো আমি বলে যাচ্ছি আমিও—'

প্রতিবেশী ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে বলেন, প্রফেসরের মেয়ে, একথা কে বলল? কোনো বোর্ডারও হতে পারে।'

'বোর্ডার! হাসালেন মশাই। ফিরতি ট্রেনের খোঁজ নিচ্ছিল শুনলেন না? আমি বলছি মেয়ে

ছাড়া আর কিছু নয়। মুখের সঙ্গে আদল আছে। বলি আর কে হবে? ওই বয়সের মেয়ে তো আর স্ত্রী নয়?...ওই বাপের অধঃপতনের খবর পেয়ে—মানে কানা-ঘুসো কিছু শুনে থাকবে এই আর কি। তা বলি এই তো ঘণ্টা দেড় বাদেই ট্রেন, যাবে তো এই পথেই। দেখি একা যায়, না সঙ্গে—'

'নমস্কার মশাই আপনার এনার্জিকে'—ভদ্রলোক হেসে উঠে চলে যান, 'এই ঠায় রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে—'

'কী করি বলুন। কৌতূহল বড়ো বালাই দাদা!'

শুধু কৌতূহল কেন, গরজও বড়ো বালাই। সবচেয়ে বড়ো বালাই। নইলে উদ্ধতস্বভাব উন্নাসিক মেয়ে সোমা, ব্রজেন ঘোষের হোটেলে এসে হাজির হয়?

আকৃতিতে তরুণী, প্রকৃতিতে মহিলা। পাথর কুঁদে বার করা মুখ দেখলে মনে হয় সে-মুখে যেন বাটালির দাগ রয়ে গেছে, পালিশে মসৃণ হয়ে ওঠেনি।...সেই অমসৃণ মুখের প্রলেপিত ঠোঁট দুটোর কপাট দুটো একটু ফাঁক হয়, যার মধ্যে থেকে কথাটা বেরোয়, অনুগ্রহ করে আপনি একটু বাইরে যাবেন?'

অনুরোধ নয়, আদেশ। অনুরোধের ছদ্মবেশেই এল। ভদ্রসমাজের যা দস্তুর।

কমলাক্ষর মুখ তাঁর মেয়ের মতো অমসৃণ নয়, পাথুরেও নয়, তবু এখন যেন পাথর পাথরই লাগছে। 'হঠাৎ এভাবে তোমার আসার কারণ কি সোমা?'

'কারণটা আপনি নিজেই নির্ণয় করুন বাবা!'

'নির্ণয় করা শক্ত হচ্ছে বলেই তো জিগ্যেস করছি। ষোলো তারিখে আমার যাবার কথা ছিল, আর আজ মাত্র আঠারো তারিখ, এই দু-দিনেই তুমি এত অস্থির হয়ে উঠলে যে—তা ছাড়া আমি টেলিগ্রামও করেছি।'

'করেছেন। কিন্তু যেতে না পারার কারণ কিছু দর্শাননি।'

কমলাক্ষ গম্ভীর হয়ে গেছেন। দৃঢ় হয়ে গেছেন। বললেন, 'কারণ দর্শাতে হবে, সেটা অনুমান করিনি। যেতে পারলাম না, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'না নয়! আপনার ভাবা উচিত ছিল, আমরা দুশ্চিন্তায় পড়তে পারি। ধরে নিতে পারি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—'

'ইচ্ছে করলে অবিশ্যি সবই পার। কিন্তু চিন্তাকে অতদূর না পাঠালেও পারতে সোমা! সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা দরকার।'

'দরকার! মাত্র থাকা দরকার! তাই না বাবা? কিন্তু সেটা কি শুধু ছোটোদের বেলা? বড়োরা মাত্রাছাড়া যা খুশি করলেও দোষ নেই?'

কমলাক্ষ গম্ভীর হলেন। 'সোমা তুমি তো জান ছেলেমেয়েদের তিরস্কার করা আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া তুমি বড়ো হয়েছ।'

সোমা বাপের এই সামান্যতম ইঙ্গিতে থামে না। তেমন অভিমানী প্রকৃতির মেয়ে হলে, এই দুঃসাহসিক অভিযানের পথে পা বাড়াত না সে। তাই ইঙ্গিত গায়ে না মেখে বরং নিজের ভঙ্গিতেই আরও অগ্রাহ্যের ভাব আনে।

'বড়ো হয়েছি বলেই ছোটোর মতো মুখ বুজে অন্যায় মেনে নেওয়া শক্ত হল বাবা! হাল ধরতেই হল। আমি এসেছি, ফিরতি ট্রেনেই যাব, আপনাকে নিয়ে যাব।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?' সহসা হেসে ওঠেন কমলাক্ষ, 'নিয়ে যাবে কি বল? আমি কি ছেলেমানুষ শিশু, যে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?'

সোমার সেই বাটালির দাগ-থেকে-যাওয়া মুখটা আর একটু অমসৃণ দেখায়। সোমার গলার স্বর

প্রায় ধাতব হয়ে ওঠে। 'বুড়োমানুষরা যখন ছেলেমানুষী করে, সেটা আরও বেশি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে বাবা, আর তখন তাদের ওপর জোর ফলানো ছাড়া উপায় থাকে না। আমি বলছি আমার সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে। কোথায় আপনার জিনিসপত্র? দেখিয়ে দিন গুছিয়ে নিই।'

সোমা ঘরের এদিক-ওদিক তাকায়।

কিন্তু কমলাক্ষ সে ভঙ্গিকে আমল দেন না। শান্ত আর নরম গলায় বলেন, 'তুমিও বড়ো হয়েছ সোমা, তোমাকেও আর ছেলেমানুষী মানায় না। একা এসেছ তুমি? না সঙ্গে কেউ আছে?'

'বৃন্দাবন আছে। তাকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

বিরস ভারী গলায় কথা বলছে সোমা। মনে হচ্ছে, যেন একটা গিন্নি। বুদ্ধিটাও তার গিন্নিদেরই মতো। বৃন্দাবন ওর বাড়ির চাকর। তার সামনে পাছে কোনো দৃশ্যের অবতারণা হয়, তাই তাকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছে।

অতএব দৃশ্যের অবতারণা করে চলে। বিদ্রূপে মুখ কুচকে বাপের মুখের ওপর বলে চলে, 'আপনি তাহলে কি ঠিক করেছেন? সংসার ত্যাগ করবেন?'

'সোমা, অসভ্যর মতো কথা বোলো না।'

সোমার বুক কাঁপে না। সোমা জাঁহাবাজ। সোমা তার মায়ের প্রকৃতি পেয়েছে। যে মা তাকে তিন বছরের রেখে মারা গেছে। হ্যাঁ, নীরজাও এমনি জবরদস্ত প্রকৃতির ছিল। অতটুকু বয়সেই সে-পরিচয় রেখে গিয়েছিল সে।

তাই সোমা বলে, 'সংসারের সর্বত্র যদি সভ্যতা বজায় থাকে, তা হলে কাউকেই অসভ্য হবার দুঃখ পেতে হয় না বাবা! আপনি যদি—'

কথার মাঝখানে করুণাপদ এক গ্লাস চিনির শরবৎ নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এবং সাহসে ভর করে এগিয়েও ধরে সোমার দিকে।

সোমা একবার কুলিশ কঠোর দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কঠিন স্বরে বলে, 'দরকার লাগবে না, নিয়ে যাও।'

করুণাপদের হাত কেঁপে খানিকটা শরবৎ চলকে মাটিতে পড়ে, করুণাপদ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

কমলাক্ষ ক্ষুব্ধ হেসে বলেন, 'ছেলেমানুষীতে তো কেউ কম যায় না। রোদে ট্রেনে এসেছ, ওটা খেলেই পারতে।'

'খাবার মতো মনের অবস্থা থাকলে ঠিকই খেতাম। সে যাক আপনি আমার কথার উত্তরটা কিন্তু দেননি।'

'কোন্ কথার?' কমলাক্ষ অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। কমলাক্ষ জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন প্রখর দুপুরের আকাশে উড়ন্ত এটা নিঃসঙ্গ চিলের দিকে। চিলটা অবিরত একই বৃত্তে পাক খাচ্ছে।

আশ্চর্য তো! কিন্তু কেন? মানুষের মতো ওরাও কি আপন হাতে বৃত্ত রচনা করে শুধু সেই পথেই পাক খায়? ওদের তো ডানা আছে, ওদের এ-দুর্মতি কেন? আবার ভাবলেন মানুষেরও একদিন ডানা ছিল। সে-ডানা মানুষ নিজেই ভেঙেছে। মানুষ আকাশ হারিয়েছে, কিন্তু তার বদলে কতটা মাটি পেয়েছে?

ভাবছিলেন, তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তাই বলেন, 'কোন্ কথার?'

সোমা দাঁতে ঠোঁট চেপে ঠোঁটের রঙের অনেকখানি ঘুচিয়ে ফেলে দাঁতে-চাপা স্বরে বলে, 'আপনি কলকাতায় ফিরবেন কি না, সেই প্রশ্নটার উত্তর পাইনি।'

'কলকাতায় ফিরব কি না!' কমলাক্ষ অবাক গলায় বলেন, 'এটা একটা প্রশ্ন হল?'

'ধরুন ওইটাই আমার প্রশ্ন?'

'কিন্তু ফিরব কি না এমন অদ্ভুত প্রশ্ন তুমি তুলবেই বা কেন? কলকাতায় ফিরব না? আমার কলেজ নেই?'

এবার সোমার সেই পাথুরে মুখে এতটুকু একটু অভিমানের কোমলতা এসে লাগে। 'কি জানি আপনার কি আছে, আর কি নেই। অন্তত এই ছত্রিশ দিনের মধ্যে আপনার মনে ছিল না, আপনার একটা ছেলে আছে, একটা মেয়ে আছে, তাদের মা নেই।'

কমলাক্ষ মৃদু হাসেন। বলেন, 'ছেলেমেয়েদের মা নেই'টা এত তামাদি হয়ে গেছে সোমা, যে সত্যিই মনে থাকে না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা আছে এটা ভুলে যাচ্ছি, এতদূর ভাবতে বসেছিস্ কেন বল্ তো? চিঠিপত্র বিশেষ দিইনি বলে?'

'বিশেষ' বলছেন কেন বুঝছি না।'

'ওঃ তা বটে। তোকে আদৌ দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু জানিস তো চিঠিপত্রের ব্যাপারে আমি চিরদিনের কুঁড়ে।'

কমলাক্ষ ভাবলেন, তবে কি যা ভাবছিলাম তা নয়। শুধু অভিমান? চিঠি দিইনি, ফেরার দিন ফিরিনি, তাই রাগে দুঃখে—

সোমা হাত তুলে ঘড়ি দেখে বোধ করি নতুন হাতিয়ার সংগ্রহ করবার আগে অবহিত হতে চায় হাতে কতটা সময়।

ওর ওই ঘড়ি দেখার মুহূর্তে ঘড়ির ওপর ছায়া পড়ে। আর সেই ছায়া কথা কয়ে ওঠে, 'শরবৎটা ফেরত দিলে কেন? খাও না বুঝি? তা হলে একটু চা—'

সোমা বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার আপনাকে কে দিল শুনতে পেতে পারি?'

কমলাক্ষ চমকে উঠলেন। কমলাক্ষ আপন আত্মজার অসভ্যতায় লাল হয়ে উঠলেন। কিন্তু লীলার মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল না। সে শুধু উত্তরটা দিল। সহজ ভাবেই দিল। 'অধিকার কি আর হাতে করে কেউ তুলে দেয়? তা ধর যদি কেউ দিয়েই থাকে, আমার বয়েসই দিয়েছে।'

সোমা কিন্তু ঠিক এমন উত্তরটা আশা করেনি। তাই সোমা এর আগে যার দিকে তাকিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি খুঁজে পায়নি—তার দিকে এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে? কিন্তু তাকিয়ে দেখে সোমা হতাশ হচ্ছে নাকি? বিতৃষ্ণ হচ্ছে?

ওর চোখে মুখে কি এই প্রশ্নই ফুটে উঠছে না—এই! এই একেবারে সাধারণের সাধারণ। না রং, না গড়ন, না মুখশ্রী, এর মধ্যে আকর্ষণীয় কি আছে? যে-আকর্ষণ পাহাড় টলায়?

তবে কি সোমাকে কেউ বোকা বানিয়েছে, কুৎসিত একটা কৌতুক সৃষ্টি করে? আর বোকা সোমা সেই কৌতুকের তালে নেচে—কিন্তু তাই কি? বাবার আচরণ, বাবার চেহারা, কোন্ পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে?

না, সোমা বাবার মুখের সাক্ষ্যই নেবে। তাই সামনের মানুষটার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে, 'ওঃ বয়েস! মফঃস্বলের দিকে সেই রকম একটা হিসেব ধরা হয়ে থাকে বটে। যাক কষ্ট করে আর আপনাকে শরবতের বদলে চা করতে হবে না। আমি এখানে খেতে আসিনি।'

'আশ্চর্য! আমিই কি তা বলছি? তবু ছেলেমানুষ—রোদে এসেছ—'

'থাক, এত স্নেহ প্রকাশের দরকার নেই। দয়া করে বারে বারে এসে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। আমাকে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে দিন একটু।'

লীলাও তাহলে সোমার মতোই পাথর! তাই এ-কথার পর অপমানে বিবর্ণ হয়ে সরে না গিয়ে সহজেই বলতে পারল কি করে, 'কিন্তু ওঁর যে এখন খাওয়ার সময় হয়েছে!'

'ওঃ! সময় হয়ে গেছে! বাবা, আপনি তাহলে খুব যত্নটত্ন পাচ্ছেন। তাই বুঝি আর নিজের সংসারে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না? সত্যি সেখানে আর কে কখন ঘড়ি ধরে খাওয়াচ্ছে! কিন্তু আজ না হয় সময়টা একটু উত্তীর্ণই হল।'

কমলাক্ষ বিচলিত হন, চঞ্চল হন, উত্তেজিত হন। আর সেই তিনটে অবস্থা একটা স্বরের মধ্যে ফেলে বলে ওঠেন, 'সোমা, পাগলামীরও একটা সীমা আছে।'

সোমা কিছু উত্তর দিত কিনা কে জানে। তার আগেই লীলা শান্ত গলায় বলে, 'মিস্টার মুখার্জি, আপনার মেয়েকে একটু বুঝিয়ে দিন, এটা বাড়ি নয়, হোটেল। এখানে খাওয়া-দাওয়ার একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে, আর সেটা মেনে চলতে হয়।'

লীলা চলে যাবার পর কমলাক্ষ বলেন, 'সোমা তুমি তাহলে ঝগড়া করবে বলেই কোমর বেঁধে এসেছে? জানি না কেন তোমার এ-দুর্মতি হয়েছে, কিন্তু—'

'জানেন না? কেন তা জানেন না?' সোমা বিদ্যুতের দ্রুততায় হাতের ভ্যানিটিটা খুলে একখানা চিঠি বার করে বাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই চিঠিটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?'

চিঠিটা কি বাবদ, কার লেখা এসব প্রশ্ন না করে—হাত বাড়িয়ে নিয়ে খুলে চোখের সামনে তুলেই ধরেন কমলাক্ষ। আর মিনিট খানেক চোখ বুলিয়েই সেটা ঠেলে সরিয়ে রেখে সোমার চোখে চোখ ফেলে বলেন, 'তোমার বাপের নামে কুৎসা করা একটা উড়ো চিঠি তোমাকে এতটা বিচলিত করে তুলেছে এটা আশ্চর্য।'

'শুধু চিঠি?' সোমা তীব্র স্বরে বলে, 'নিজের চক্ষে দেখলাম না আমি? প্রমাণ পেলাম। আপনি গুরুজন, তবু মুখের ওপরেই বলব, আপনার বয়সের কথা ভেবে আর রুচির চেহারা দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। তবু আপনার কাছে হাতজোড় করছি বাবা, আপনি এই আবেষ্টন থেকে চলুন।'

কমলাক্ষও বুঝি ওদের মতো হয়ে যাচ্ছেন। তাই মেয়ের কাছ থেকে অতখানি অপমান পেয়েও গায়ে মাখলেন না। উল্টে হেসে উঠে বললেন, 'আমার কাছে হাতজোড় করবে, সেটা আর বাহুল্য কি? আমি তাতে কুণ্ঠিতও হব না। কিন্তু আমি কলকাতায় যাব না, একেবারে চিরকালের মতো এইখানেই থেকে যাব, এমন অদ্ভুত ভয়ে কাতর হবার মানে কি তাই ভাবছি।'

'বেশ, যাবেন তো আজই চলুন।'

'তা কি হয়?'

'তা হয় না?'

'না। ছুটি শেষ হবার পরও যখন থাকতে হয়েছে—ধরে নাও বিশেষ কোনো কাজে আটকে পড়েছি।'

সোমা ছিটকে ওঠে। সোমা চটির মধ্যে পা গলায়। তীব্র স্বরে বলে, 'আটকে পড়েছেন যে কিসে সে তো চোখের সামনে দেখতেই পেলাম। কিন্তু জীবনে কখনও ধারণা করিনি, আপনি আমাদের মাকে এইভাবে অপমান করবেন।'

'সোমা, সংযত হয়ে কথা কও।'

'না কইব না। কইতে পারছি না। বাবা—' সোমার ফেটে পড়া রাগ সহসা ফুটন্ত জল হয়ে চোখের স্নায়ুগুলো পুড়িয়ে দেয়, 'আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে, আপনার সংসারের পবিত্রতা, সব কিছুর চেয়ে বড়ো হল ওই বিশ্রী—'

ও বেরিয়ে যাচ্ছিল। কমলাক্ষ ওর ওই ক্রুদ্ধা নাগিনীর মূর্তির দিকে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'তুমি যদি বিচারকের পোস্ট নিয়ে না আসতে সোমা, হয়তো তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতাম। হয়তো তখন আর তোমার বোঝা শক্ত হত না কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো। অভিযোগ করে বসতে না তোমাদের মাকে আমি অপমান করছি।'

চলে যেতে উদ্যত সোমা ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বলে, 'বেশ, তবে তাই বোঝান।'

কমলাক্ষ মাথা নেড়ে বলেন, 'আর হয় না। তুমি বোধ করি ফিরে গিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়িতেই উঠবে? যদি তা না ওঠো, তো বলে রাখি—আমি কাল ফিরব। আর ওই ভদ্রমহিলা যাবেন আমার সঙ্গে।'

'এ আপনি কী করলেন?' লীলা রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে।

কমলাক্ষ আস্তে বলেন, 'ঠিকই করলাম।'

'আর আপনার ঠিকের সঙ্গে যদি আমার 'ঠিক' না মেলে?'

কমলাক্ষ সেই 'সাধারণ—একেবারে সাধারণ' শীর্ণ মুখটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে তারপর বলেন, 'মেলাতেই হবে যে—'

লীলা সহসা ভিন্ন মূর্তি নেয়। রুক্ষস্বরে বলে, 'কিন্তু কেন বলুন তো? আমি আমার নিজের ব্যবসা নিয়ে নিজের জীবন নিয়ে পড়ে আছি, পড়ে থাকব। আপনার কী দরকার ভাবতে বসার—আমার অভিভাবক আছে কি না। আপনি কে? আপনার সর্দারী আমি নেবই বা কেন? যান আপনি কলকাতায় ফিরে যান আপনার মেয়ের সঙ্গে। এখনও ট্রেন ছাড়েনি, এখনও উপায় আছে।'

কমলাক্ষ মৃদু হেসে বলেন, 'না আর উপায় নেই।'

উপায় নেই। আর উপায় নেই।

কিন্তু লীলা কি পারবে না উপায় বার করতে? লীলা কি সম্মানের চাইতে সুখকে অধিক মূল্য দেবে? যে-স্বর্গে অধিকার নেই, সে-স্বর্গ শুধু দৈবাৎ হাতের মুঠোর কাছে এসে পড়েছে বলেই তাকে মুঠোয় চেপে ধরবে?

আর হতভাগা ব্রজেন ঘোষ? তাকে শুধু করুণাই করবে লীলা? সম্মান করবে না? সে তার জীবনপাত করে যে-আশ্রয় রচনা করে দিয়ে গেছে লীলার জন্যে, লীলা সে-আশ্রয়কে ভাঙা মাটির বাসনের মতো ফেলে দিয়ে চলে যাবে?

নাঃ, তা হয় না। লীলার সুখের মূল্যে অনেকগুলো সম্মান বিকিয়ে যাচ্ছিল, তা যেতে দেবে না লীলা। ব্রজেন ঘোষের সম্মান রক্ষা পাক, রক্ষা পাক কমলাক্ষর পরিচয়ের সম্মান, কমলাক্ষর সন্তানদের আর সংসারের সম্মান।

আর লীলার? নাঃ, তার আগে কিছুই রইল না। না সুখ, না সম্মান।

রইল শুধু ভাগ্যের তীক্ষ্ণ ধিক্কার! সে মুখ বাঁকিয়ে বলবে, 'ছি ছি! হীরের কৌটো এগিয়ে ধরলাম তোর দিকে, আর তুই হাত পিছিয়ে নিয়ে ভাঙা কাঁচের টুকরো খুঁইয়ে আঁচলে বাঁধলি?'

তাছাড়া? আরও এটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ অহরহ বিকৃত করবে না লীলাকে? বলবে না 'ভীরু! ভীরু!' বলবে না—'সাহস দেখে সাহস হল না তোমার?'

না, সাহস দেখে সাহস হল না লীলার। ভয় করল।

অথচ লীলা তো ভীরু ছিল না লীলার সাহস দেখে লোকে অবাক হত। লীলাকে কে ভাঙল? কে এমন দুর্বল করে দিল? তাই পালিয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান করতে বসেছে লীলা। সমাধানের আর কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

করুণাপদ ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'সে কি মা, এই মাঝরাত্তিরে আবার তুমি কোথায় পুজো দিতে যাবে?'

'যাব রে যাব—'। লীলা চুপি চুপি বলে, 'সে একটা দেবস্থান আছে, একেবারে ঊষাভোরে পুজো দিতে হয়। এখন থেকে না বেরোলে—দূর তো অনেকটাই—'

'তা সাতজন্মে তো তোমায় এমন উন্মাদ হয়ে 'দেবস্থান' দেখতে যেতে দেখিনি মা? হঠাৎ আবার কি হল তোমার?'

লীলা বলে, 'চুপ আস্তে আস্তে। মুখুজ্জেবাবুর ঘুম ভেঙে যাবে। পুজো দিচ্ছি—তোর অসুখের সময় মানসিক করেছিলাম বলে। যাক, তুই দোরটা দে।'

করুণাপদ কাতর কণ্ঠে বলে, 'আমার আবার অসুখ, তার আবার মানসিক! আমি একটা মনিষ্যি! তা কাল আমায় কিছু বললে না—এখন হঠাৎ রাত না পোয়াতে বলছ, দোর দে, আমি যাই। একা যাবে তুমি? তাই কখনও হয়?'

লীলা ব্যস্তভাবে বলে, 'হয় হয় খুব হয়। আজ 'যোগ' যে! কত লোক যাচ্ছে! তুই সুদ্ধু চলে গেলে মুখুজ্জেবাবুর খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? ভাবছিস কেন? মরে যাব? এত কাণ্ডতেও যখন তোর মা ঠিক অটুট থাকল করুণাপদ, তখন একা দেবস্থানে যেতে মরে যাবে না। দে তুই দোর দে। দিয়ে আরও খানিক শুগে যা। এখনও ফরসা হতে দেরি আছে। মানসিক শুধতে যাচ্ছি, বাধা দিসনে। পিছু ডাকলে দোষ হয়।'

'তা বেশ, ডাকছি না। ফিরবে কখন সেটা শুনি?'

'ওই যেতে আসতে যা সময় লাগবে!' সিল্কের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে অস্ফুট আলোর চাদর গায়ে দেওয়া রাস্তায় হন হন করে এগিয়ে চলে লীলা।

যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে থেকে, আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসে করুণাপদ। দেবদ্বিজে এত ভক্তি আর কবে দেখেছে লীলার?

এই লক্ষ্মীছাড়া করুণাপদর এতখানি মূল্য? তার অসুখে মানসিক করতে হয়, আবার সে-মানসিক শোধ করতে লীলাকে যেতে হয় ঊষাভোরে পায়ে হেঁটে?

চোখে জল এল করুণাপদর।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন কমলাক্ষ। চোখে ঘুম এল প্রায় শেষ রাত্রে। এল তো বড়ো গভীরই এল।

ভোর রাত্তিরের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে বয়ে চলেছিল ঘরের মশারি উড়িয়ে, আলনায় ঝোলানো জামাকাপড় দুলিয়ে।

রাত্রিজাগা ক্লান্ত দেহে এ হাওয়া যেন একটা নেশার জাদু বুলিয়ে দিল। সে-নেশার আচ্ছন্নতা কাটতে রোদ উঠে গেল সকালের।

করুণাপদর ডাকেই বোধ হয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। দেখলেন গলানো রুপোর স্রোত—ঘরের মেঝেয়, বিছানায়, মশারিতে, মাঠে আকাশে।

বললেন, 'সর্বনাশ! কত বেলা!'

করুণাপদ বলল, 'হ্যাঁ, বেলা দেখেই ডেকে দিলাম বাবু। মা বাড়ি নেই, আপনিও ঘুমোচ্ছেন, প্রাণটা কেমন করতে লাগল। তাই বলি ডেকে দিই—'

কমলাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, 'মা বাড়ি নেই!'

'আজ্ঞে না। সেই শেষ রাত্তিরে উঠে দেবস্থান গেছেন মানসিক শুধতে। কপাল করুণাপদর! তার জীবন আবার জীবন! তার সেই জীবনের জন্যে মানসিক করা, তার জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে যাওয়া—'

কমলাক্ষ হতাশ গলায় বলেন, 'আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না করুণাপদ।'

করুণাপদ বলে, 'বুঝতে কি আমিই পেরেছি বাবু? আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, করুণাপদ দোরটা দে, আমি একটু পুজো দিতে যাব। যত জেরা করি তত বলেন, চুপ চুপ! মানে আর কি

আপনার ঘুম ভাঙার ভয়ে—তা এসে যাবেন বোধ হয় বিকেলের মধ্যে। শুনছি আজ যোগ, যাবে অনেকে। মুখটা ধুয়ে নিন বাবু, চায়ের জল চাপিয়েছি।'

মুখুজ্জেবাবু না থাকলে যে করুণাপদও সেই অজানা দেবস্থানটা দেখে আসতে পারত সেই কথা ভাবতে ভাবতে যায় করুণাপদ। মানুষটা বড়ো গোলমেলে।

একমাসের কড়ারে এসেছিল, তার মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটে গেল। কাল আবার বাবুর মেয়ে এসে বকাবকি করে গেল। চলে গেলেই হত। করুণাপদ মায়ের তলায় তলায় থেকে হোটেলটা ঠিকই চালিয়ে যেত। উনি আবার এখন কত ফ্যাচাঙের কথা কইছেন। আরে বাবা, আমরা অভিভাবকশূন্য হলাম তা তোর কি? তুই যদি এ-সময় না আসতিস পলাশপুরে?

কমলাক্ষ যদি না আসতেন পলাশপুরে? এই সময় নয়, কোনো সময় নয়? জীবনে তো কখনও পলাশপুরের নামও শোনেননি কমলাক্ষ। কোন্ গ্রহের চক্রান্তে—কিন্তু গ্রহের চক্রান্ত কি কমলাক্ষর? না লীলার?

অদ্ভুত একটা ইতিহাস নিয়ে অদ্ভুত একরকম জীবনযাপন করছিল যে-লীলা এই অখ্যাত অবজ্ঞাত জায়গাটায়? কমলাক্ষই কি তার জীবনে কুগ্রহের মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন না? কমলাক্ষ না এলে হয়তো ব্রজেন ঘোষ টিঁকে থাকত। হয়তো তাহলে লীলা তাকে মদ খাবার পয়সা দিত।

হয়তো বাড়িতে একটা ভদ্রলোক রয়েছে বলেই ব্রজেন ঘোষকে শাসন করতে গিয়েছিল লীলা। কমলাক্ষ না এলে হয়তো এসব কিছুই হত না।

আর কমলাক্ষর নিজের? এখানে না এলে কমলাক্ষই কি জীবনে কখনও জানতে পারতেন জীবনের সত্য কি?

চিঠিখানা আর একবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন কমলাক্ষ। চিঠি নয়, কাগজের একটু টুকরো। যে টুকরোটুকু কমলাক্ষর মশারির তলায় গোঁজা ছিল।

'মিথ্যে একটা বন্ধনে জড়িত হয়ে জীবনকে জটিল করে তুলবেন না। চলে যান, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। ভগবানের বিধানে কত শত বন্ধন মুহূর্তে ছিঁড়ে পড়ে, তাও তো সহ্য করে নিতে হয় মানুষকে? এও না হয় সেইরকমই মনে করুন। মানুষের গড়া সমাজও তো দ্বিতীয় ভগবান।'

ভাববেন না—'প্রবাসে আবাস' আবার চলবে পুরনো নিয়মে। খদ্দেররা যথারীতিই যত্ন পাবে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না। আর আমাকে দেখা-শোনা? তাতেও নিশ্চিন্ত করেই রাখি। শুনুন, যদি শরণ নিই তা হলে ওই গগন গাঙুলীরাই দেখবেন। তাই নেওয়াই ভালো নয় কি?

তাইতো আমাদের দ্বিতীয় ভগবানের নিয়ম। বেরোবার সময়টা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছি, তাতে ভীরু বলুন আর যাই বলুন। আজই কিন্তু চলে যাওয়া চাই। আর শুনুন—মনে করবেন না কিছু, ছুটিছাটা হলে আর যেন ভুলে কখনও পলাশপুরের টিকিট কেটে বসবেন না।'

—ঃ ঃ—

দুই নায়িকা

খবরটা এনেছিল মাধব ঘোষের বিধবা শালীর সেই আধাহাবা ছেলেটা। যে ছেলেটাকে আর যে শালীকে নিয়েই মাধব ঘোষের সংসার।

বাড়িওলার আদরের পুষ্যি, তবু ছেলেটাকে কেউ মানুষের দরে গণ্য করে না। আর বাইরে থেকে এক একটা খবরের ঢেউ বয়ে এনে হাঁফানো-লাফানোই তো কাজ তার! কে শুনবে সে খবর? মাধব ঘোষের বাসার ভাড়াটের মধ্যে কারই বা এত সময় আছে যে গালগল্প করবে বসে?

তাই সে যখন হাঁফিয়ে তোৎলামি করে আর হাত মুখ নেড়ে বলছিল, 'ও বাবা, সে কি রক্ত! যেন এক কুড়ি পাঁঠা কেটেছে'—তখন নিতান্ত কৌতূহলী দু'একজন রান্নার চালা থেকেই মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'কোনখানে রে?'

কেউ কিছু জিগ্যেস করলেই ছেলেটা আরও তোৎলা হয়ে যায়। উত্তর পেতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তাই ওরা বাড়ানো মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপন মনে বলেছিল, 'ভগবান পৃথিবীর ভার কমাচ্ছে। এই সেদিন ওখানে একটা গরু কাটা পড়ল।'

তা একটা অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গে একটা গরু-মোষের পার্থক্য কি? গরু বরং ভগবতী। কাটা পড়েছে শুনে মেয়ে মানুষের মন একবার শিউরে উঠতে পারে। মানুষ একটা রেলে কাটা পড়েছে, এ খবরের নতুনত্ব কোথায়?

পৃথিবীতে দৈনিক হাজার হাজার মানুষ এক্সিডেন্টে মরছে না?

তখন ভর দুপুর।

বাড়ির জোয়ান পুরুষরা সকলেই কাজের ধান্দায় বাইরে। মেয়েরা কেউ কেউ সকালের পাট সেরে রাতের রান্না সারতে বসেছে। কেউ কেউ ইস্কুল ফেরত ছেলেমেয়েদের জন্যে রুটি গড়ে রাখছে, আর ছোটো সংসারের কেউ কেউ ভাতের কাঁসি নিয়ে বসেছে। খেয়ে উঠে ছাই মাটি শালপাতা আর পোড়া কড়া নিয়েও বসেছে এক আধ জন।

মাধব ঘোষের বাসায় তেরো ঘর ভাড়াটের ঘরে তেরো রকম কাজ চলছিল তখন। আধাহাবা মদনার সঙ্গে 'রেলেকাটা' দেখতে ছুটবে, এত উৎসাহ কারুর আসেনি।

হোক না বাড়ির কাছাকাছি, খেটে পিটে ক্লান্ত সবাই। হ্যাঁ, নিজেদের বাড়ির পুরুষরা বাড়ি থাকত, তা হলেওবা তাদের ছায়ায় ছায়ায় গিয়ে না হয় উঁকি দেওয়া যেত।

তাও এসব হ্যাঙ্গাম হুজুতে উঁকি দেবার সখ পুরুষদেরও বড়ো থাকে না। কে জানে বাবা, আবার পুলিশের নজরে পড়ে যেতে হবে কি না, সাক্ষী দিতে যেতে হবে কি না।

কাজেই মদনা, যতই 'হেই হেই' করে বলুক 'দেখবে তো চল। এখনও পড়ে আছে—' কেউ গ্রাহ্য করেনি। বরং অজিতের বউ মলিনা কয়লা ভাঙতে ভাঙতে একবার হাতের শব্দ থামিয়ে কথাটা শুনে নিয়ে বিরক্তিতে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল,—'এ ছোঁড়ার কাজের মধ্যে কাজ যত হাড়হাবাতে উনচুটে খবর বাড়িতে নিয়ে আসা।'

মদনার মা সুখদা শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছিল ছেলেকে। 'হ্যাঁরে মেয়ে না বেটাছেলে? ...বেটাছেলে? জোয়ান? মুণ্ডুটা একেবারে থেঁতলে গেছে? তা কি বলছিল লোকে? নেহাত অপঘাত না আত্মহত্যে?'

সুখদার চাঁছাছোলা গলার প্রশ্ন কিছু কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু তোৎলা মদনার উত্তর আর কারুর বোধগম্য হচ্ছিল না।

তারপর মদনার মা ছেলেকে রোদে ঘোরার জন্যে বকে, হাতে মুখে জল দিয়েই তার মেসোর কাছে শুইয়ে রেখে গেল।

মাধব ঘোষের ঘরে একটা ঘাড়-নড়া টেবিল ফ্যান আছে, সেই সুখের আস্বাদের ভাগ সুখদা নিজের ছেলেকে না দিয়ে ছাড়ে না। আর কাজকর্ম সারা হলে, নিজেও এসে মেঝেটায় গড়াগড়ি দেয়।

তা কাজকর্ম তাকেও নিজের হাতেই করতে হয়, বাড়িওলার শালী বলে যে বাসন মাজতে ঝি রেখেছে তা নয়। রাখতেই বা দেবে কেন মাধব ঘোষ? একাধারে ঝি, রাঁধুনী, ঘরগুছুনি পাওয়া যাবে বলেই না দু' দুটো মানুষকে ভাত কাপড় দিয়ে পোষা।

মাধব ঘোষের বাসার এই ভাড়াটেরাও সে হিসাব জানে। তাই সুখদা নিজে যতই আস্ফালন করুক, বাড়িওলির মর্যাদা তাকে কেউ দেয় না।

এই যে ও তখন উঠোনের দড়িতে ভিজে কাপড় মেলে দিতে দিতে গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল—'কি গো মলিনা, একদিনে কত কয়লা ভাঙছ?' তখন কি মলিনা ভালো করে উত্তর দিল?

দিল না।

বেজার মুখে বলল, 'দাসদাসীতো নেই যে তাদের পিত্যেসে ফেলে রাখব? মাসের কয়লা একবারেই ভেঙে তুলছি।'

সুখদাও বেজার মুখে বলল, 'তা তো বেশ করছ, কাজের সুসার করছ। বলি একটা বুড়োমানুষ যে একটু চোখ বুজেছে সেটাও তো ভাবতে হয়।'

মাধব ঘোষের প্রসঙ্গে সুখদা সব সময় 'বুড়োমানুষ' শব্দটা ব্যবহার করে। অথচ মাধবের বয়েস মাত্র একান্ন বাহান্ন হতে পারে। তাই ওই 'বুড়োমানুষে' কেউ সহানুভূতিতে উছলে পড়ে না। মলিনাও পড়ল না। আরও জোরে জোরে হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে ভারী গলায় বলল,—'তা আর কী করা যাবে? মাস মাস ভাড়াটি ঘরে তুলতে হলে এসব উৎপাত তো একটু সইতেই হবে।'

মলিনার এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবের জন্যে সুখদা বেশি কথা এগোতে পারে না। আর মলিনারা জাতে বামুন বলে মাধব ঘোষও একটু সমীহ করে। কাজেই সুখদা রণে ভঙ্গ দিল।

মলিনা সব কয়লাগুলো ভেঙে তুলল, গুঁড়োগুলো চেলে গুল পাকাবার জন্যে আলাদা করে রাখল, একেবারে বিকেলের রান্নার উনুনটা সাজিয়ে ফেলল, তারপর সাবান নিয়ে কলতলায় ঢুকে গেল।

অজিত অন্য আর সকলের থেকে ভাড়া বেশি দেয়, তাই মাধব ওদের জন্যে আলাদা একটা কলতলা করে দিয়েছে। ছ্যাঁচা বেড়ার দেওয়াল, টিনের চাল, আর কর্পোরেশনকে লুকিয়ে একটা বাড়তি 'ট্যাপ'—এই ঐশ্বর্য।

সেই ঐশ্বর্যের গর্বেই মলিনা নিজেকে ওই 'বারো ভূতেদের' থেকে বিশিষ্ট ভাবে। রাত্তিরে পুরো রান্নাও এ বাড়িতে একা মলিনাই করে। আর সকলে কেউ কেউ ডাল তরকারি রেঁধে রাখে, রাত্রে শুধু ভাতটা রাঁধে কি রুটি দু'খানা গড়ে নেয়। কেউ বা উনুন জ্বালার পাটই করে না, সব কিছুই সেরে রাখে।

মলিনাই মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'সকালের তরকারি? মুখে তুলবে ও? হুঁঃ! তা হলে তো বেঁচে যাই। তোমাদের মতন একটা বেলা তবু জিরিয়ে বাঁচি। তা হবার জো নেই।'

জো আছে কি নেই—কে জানে, তবে হওয়ায় না মলিনা। বিকেলে পরিপাটিটি হয়ে দাওয়ায় বসে তোলা উনুনে রাঁধে। ডিমের ডালনা, আলু পেঁয়াজের চচ্চড়ি, রুটি কি দালদার পরোটা।

উঠোন ঘিরে দাওয়া আর দাওয়া ঘিরে যত ঘর, মলিনার এই রন্ধনলীলা সবাই দেখতে পায়।

এবাড়ি ওবাড়ির ছেলেপুলেরা বলে 'বেশ বাস বের করেছে বামুন কাকি! তোমরা কেবল ছাইয়ের রান্না রাঁধো।'

তাদের মায়েরা বিরক্তিতে নাক কুঁচকে বলে, 'আমাদেরও যদি তোদের বামুন কাকির মতন আপনি আর কোপনির সংসার হত, বাস বেরোনো রান্না রাঁধতাম। তোমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভরাতেই যে—'

আজও মলিনা সেই সুবাস বেরোনো রান্না রাঁধতে বসেছিল।

আজকের সেই দুপুরে সাবান দিয়ে গা ধুয়ে এসে চুল বেঁধে পরিপাটি হয়ে একটা সেলাই নিয়ে বসেছিল।

কল চালাতে জানে, কিন্তু কল নেই। তাই হাতেই একটা সায়া সেলাই করে ফেলে, সাজানো উনুনটায় আগুন ধরিয়ে যখন রাঁধতে বসল, তখন সন্ধে হয় হয়।

সেলাইয়ের ঝোঁকে বেলা গড়িয়ে ফেলে মনটা ধড়ফড় করছিল। অজিত এসে পড়লেই মুশকিল। এলেই রান্না কামাই দিয়ে চা বানাতে হবে, পাঁপড় কি দু'খানা বেগুনী ভেজে দিতে হবে। সব গড়িয়ে যাবে।

মাসের প্রথম দিক বলে রান্নার উপকরণেও বাহুল্য ছিল। একটা ডালনা, একটা চচ্চড়ি, আবার দু'রকম ভাজাও। ব্যস্ত হাতে সারতে সারতে হঠাৎ খেয়াল হল মলিনার, অজিতের ফেরার সময়টা যেন পার হয়ে গেছে।

ভাবল, দেখ—আমি কোথায় দেরী হয়ে গেছে বলে ধড়ফড়িয়ে মরছিলাম, আর আজই ও দেরী করছে।

মাখা ময়দা ঢেকে রেখে উনুনে কুচো কয়লা দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ, অজিত এলে গরম পরোটা ভেজে দেবে বলে, কিন্তু ক্রমশ উনুন ঝিমিয়ে এল। মনটাও তখন অস্থির হয়ে উঠেছে। কোনোরকমে পরোটা ক'খানা বেলে ফেলে ভেজে রাখল, আর তারপর ঘরবার করতে লাগল।

এত দেরী কিসের?

কই এত দেরী তো করে না কোনোদিন।

কাজ করে অজিত একটা কবরেজী ওষুধের দোকানে। তবে কবরেজী ওষুধের চেয়ে গন্ধতেলের ব্যবসাটাই তাদের চলে ভালো। 'আমলার তেল' আর 'কুন্তল বিলাস' এই দুটোর ভীষণ কাটতি।

মলিনার চুলে 'কুন্তল বিলাসের' গন্ধও মলিনাকে এ বাড়িতে আর একটু বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। অজিতের কাজ হচ্ছে প্যাক্ করা। গুনে গেঁথে হিসেব মিলিয়ে দিতে হয়। তবু মলিনার জন্যে এসে যায় কোনো ফাঁকে কুন্তল বিলাস, আমলার তেল।

অজিত বলে, 'হুঁ হুঁ বাবা, অমনি না। হোমিওপ্যাথির শিশি রাখি কাছার খুঁটে, আর কোম্পানির শিশিতে তেল ভরবার সময় একটু একটু করে কম ভরে খানিকটা সরাই।'

দাঁতের মাজন, হজমের ওষুধ সবই সরায় অজিত।

মলিনা ভাবল, সেই রকম সরানো টরানো কিছু ধরা পড়ে গিয়ে গোলমাল বাধেনি তো? মালিক আটকে রাখেনি তো? কিন্তু কতক্ষণ আটকে রাখবে? লঘুপাপে কি গুরুদণ্ড দেবে? রাত যে দশটা বাজল!

যে মানুষ পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় আসে!

সামনের ঘরের স্বপনের মা মলিনার কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। মলিনার উনুনে কয়লা দেওয়া, আবার নিভন্ত আগুনে যেমন তেমন করে খাবারটা করে নেওয়া সবই দেখেছে।

এখন ওর অস্থিরতাও দেখল।

ডাক দিয়ে বলল, 'অ মলিনা দি, অজিতবাবু ফেরেননি?'

মলিনার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল, এই প্রশ্নে উছলে কান্না এল তার। সেই কাঁদো কাঁদো গলাতেই বলল, 'না ভাই, ভেবে মরছি। কী হল কিছু বুঝি না। এমন তো কোনোদিন করে না।'

কথাটা সত্যি।

বাড়ি ফিরে চা টা খেয়ে আবার বরং বেরিয়ে রাতটাত করে কোনো কোনোদিন অজিত, কিন্তু কাজ ফেরত সোজাই বাড়ি আসে।

স্বপনের মা চিন্তিত গলায় বলল, 'বলে যাননি কিছু?'

'না, কিছু না।'

'তাইতো!'

রাত দশটার নিশুতি হয়ে আসা উঠোনে এই প্রশ্নোত্তর যেন একটা গা ছমছম বিপদের ইসারা নিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব ঘরের দোর থেকেই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন এসে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। মেয়ে পুরুষের গলা।

'অজিতবাবু আসেননি? ...অজিতবাবু আসেননি?...সে কি? কোথাও যাবার কথাটথা ছিল না?'

ছোটো ছেলে মেয়েরা সকলেই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, বড়োরা কেউ খাবে, কেউ খেতে বসেছে। সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল।

একটা মানুষ, নিয়মী মানুষ, সে হঠাৎ কাজ থেকে বাড়ি ফিরল না, এ যে বড়ো সর্বনেশে কথা!

অহঙ্কারী মলিনা, যে নাকি কখনও নিজের দাওয়া থেকে ভিন্ন অন্যের দাওয়ায় এসে কথা বলে না, সে একবার স্বপনদের দাওয়ায়, একবার ভোম্বলদের দাওয়ায়, একবার নগেনবাবুর দাওয়ায় এসে কাতর হয়ে বলতে লাগল, 'কি হবে ভাই! খবর পাবার কী হবে? মন যে ধৈর্য মানছে না। রাত তো ক্রমশঃই গভীর হয়ে এল। বুকের মধ্যে হিম হয়ে আসছে আমার।'

সকলেই উদ্বিগ্ন গলায় সহানুভূতি জানাতে লাগল। কিন্তু এত রাত্তিরে খবর পাবার প্রশ্নটায় গা করল না কেউ। কেন কোথায় খবর?...ওর সেই দোকান কি আর খোলা আছে এখন?

সাড়া শব্দে—'বুড়ো মানুষ' মাধব ঘোষও সুখশয্যা ছেড়ে উঠে এসে জিগ্যেসাবাদ করতে লাগলেন।

সুখদা টিপে টিপে বলতে লাগল, 'ওমা, এতক্ষণ কি তুমি ঘুমোচ্ছিলে মলিনা? মানুষটা আসে সন্ধেবেলা, আর এখন এই রাত্তির এগারোটা! এখন তুমি লোক জানাজানি করছ বাড়ি আসেনি বলে। সময়ে টের পেলে তো—পাঁচজনে একটা বিহিত করতে পারতো!'

মলিনার এখন দুঃসময়।

তাই মলিনা চট করে মুখে মুখে উত্তর দিল না। নইলে কি, না বলে ছাড়তো, 'একদণ্ড দেরী দেখেই যদি ডাক ছেড়ে লোককে উত্যক্ত করি, তাহলেও তো দুষতে গো!'

এখন বলল না।

এখন মাধব ঘোষের কথার উত্তর দিল। 'যেমন যায় তেমনিই গিয়েছিল। শরীর তো ভালোই ছিল। এখন খবর নেবার কি হবে বলুন?'

মাধব ঘোষ নীরস গলায় উত্তর দেয়, 'এখন আর এই রাতদুপুরে কি বলব বাছা?'

মলিনা নয় বিপদেই পড়েছে। তবে স্বভাবটা কি একেবারে যাবে? যে স্বভাব না কি মরলেও যায় না।

তাই সে-ও বিরস গলায় বলে ওঠে, 'তা আপনার বাড়ির ভাড়াটে, দায়িত্ব তো আপনারই, একটা যদি বিপদ আপদ ঘটে থাকে, থানা পুলিশ হয়, আপনাকেই আগে ধরবে।'

থানা পুলিশের কথাটাই মনে আসে মলিনার। কারণ, ওর মনে সেই চুরির কথাই পাক খাচ্ছে। কি জানি, অজিত শুধুই বাড়িতে এক আধ ছিটে আনে, না সরিয়ে ফেলে বাইরে মোট মোট বেচে। এমন তো কত শোনা যায়, তলে তলে মনিবকে ফাঁক করে কর্মচারীতে।

মানুষকে বিশ্বাস নেই।

স্বামী বলেই যে অজিতকে মলিনা সত্যসন্ধ পুরুষ ভাববে তার মানে নেই।

কিন্তু থানা পুলিশের কথায় মাধব ঘোষ শিউরে উঠল, 'থানা পুলিশ কেন? থানা পুলিশ কেন? তেমন সন্দ আছে তাহলে?'

মলিনার সেই কান্না ভাবটা কমে এখন ঝগড়াটে মূর্তি ফুটে ওঠে। সে-ও সমানে সমানে বলে, 'কেন, শুধু চুরি ডাকাতি করলেই থানা পুলিশ হয়? পথে বিপদ হলে হয় না? এমন কিছু খোকা নন আপনি যে জানেন না। এতগুলো পুরুষ বাড়িতে থাকতে, বাড়ির একটা মানুষ বেঘোরে হারিয়ে যাবে? খোঁজ হবে না?'

এতক্ষণ যারা সহানুভূতিতে বিগলিত হচ্ছিল, তারা সহসা মলিনার এই রূপান্তরে অন্যমূর্তি নেয়। বিরূপ মন্তব্যের ফিসফিসিনি ওঠে। মাধব ঘোষের সঙ্গে লাগছিল, বেশ হচ্ছিল। বাড়িওলাকে কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এই ছুতোয় ও একটু অপদস্থ অপমানিত হয় হোক।

কিন্তু হঠাৎ এ আবার কি!

কেউটে যে ল্যাজে ছোবল মারতে এল আর তবে কে সহানুভূতিতে গলবে?

নগেনবাবুর স্ত্রী গলা তুলে বললেন, 'বুঝলাম তো সবই। কিন্তু চারদিকের বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে এল, লোকে কে কি করবে? যা করবার সকাল হলে করা হবে।'

একথায় হঠাৎ আবার মলিনার ভেতরের কান্নার সমুদ্র উথলে উঠল। কেঁদে উঠেই বলল, 'মেয়েমানুষ হয়ে একথা কোন প্রাণে বললেন মাসিমা? এই সারারাত আমি কি ভাবে কাটাব, তা ভাবছেন না?'

নগেনবাবুর স্ত্রী কি উত্তর দিতেন কে জানে, ঠিক এই সময় সুধানাথ ফিরল কাজ থেকে। সুধানাথের চাকরি হচ্ছে, সিনেমার টিকিট চেকারি। তাই লাস্ট শো সেরে ফিরতে ওর প্রায় বারোটা বাজে। বাইরে থেকে খেয়েই ফেরে।

ও যখন ফেরে তখন বাড়ি নিশুতি হয়ে যায়, উঠোনের ছোটো দরজাটা ভেজানো থাকে। নিঃশব্দে ঢুকে আস্তে দরজাটায় খিল লাগিয়ে নিজের কোণের দিকের ঘরটার সামনে দাঁড়ায়, চারিদিকের ভিতর থেকে বন্ধ ঘরগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে, হয় তো বা একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর নিজের বাইরে থেকে তালা লাগানো ঘরটা আস্ত একটি চাবির মোচড় দিয়ে খুলে ঢুকে পড়ে।

আলো-টালো জ্বালে না, টর্চটা টিপে একবার দেখে যেন, তারপর বাইরের উঠোনের মস্ত চৌবাচ্চাটার তলায় ঠেকা এক ছিটে জল মগ ঠুকে ঠুকে তুলে হাত মুখ ধুয়ে, ঘরে এসে বাইরের জামা-পোশাক বদলে শুয়ে পড়ে।

ঘরের মধ্যেই টাঙানো দড়িতে লুঙ্গিটা শুকোতে দিয়ে যায় সকালে, সেটাই ওর রাত কাপড়।

বিছানা কোনোদিন তোলা হয় না, অতএব পাতার কথাও ওঠে না। তিন-চার মাস অন্তর এক আধদিন সকালে বিছানার চাদরটাকে নিয়ে কাচতে দেখা যায় সুধানাথকে।

সকালের দিকে আর একটা কি যেন কাজ করে। খাওয়াটা সেখানে জোটে। বোধহয় কোনো মাড়োয়ারি গদিতে খাতা-পত্তর দেখে। সেখানে কর্মচারীদের জন্যে রান্না হয়। মাছ মাংস নয়, সাত্ত্বিক।

সকালে ওই সাত্ত্বিক খানা, রাত্তিরে রেস্টুরেন্টে রুটি মাংস। এই চালিয়ে চলেছে সুধানাথ যতকাল মা মরেছে তার।

বউ?

না, বউ বস্তুটা আর কপালে জোটেনি তার। কে দেখেশুনে দেয়, এইজন্যেই হয়ে ওঠেনি। তারপর তো মেঘে মেঘে বেলা যাচ্ছে। বন্ধুবান্ধবরা কিছু বললে বলে, 'বেশ আছি বাবা! সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো।'

কিন্তু রাত্রে বাসায় ফিরে ঘরে ঘরে বন্ধ দরজা দেখে নিশ্বাস পড়াটাকে আটকাতে পারে না। নিজের ঘরটাকে একটা ঘৃণ্য জায়গা বলে মনে হয় তার।

আজও যথারীতি টর্চ টিপে টিপে গলিটা পার হয়ে এসেছিল সুধানাথ, দরজা ঠেলতেই চমকে উঠল।

সব ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বালা, আর ঘরের মালিকরা সকলেই প্রায় ঘরের বাইরে।

মাঝখানে নাক উঁচু মলিনা বসে কাঁদছে। বাসার কারও সঙ্গেই খুব একটা ঘনিষ্ঠতা নেই সুধানাথের। সম্পর্ক তো মাত্র সেই সকাল বেলা ছ'টা থেকে সাতটা অবধি। যেটুকু সময় জল আর কল নিয়ে বচসা।

তবে মলিনার আলাদা কলঘর আছে বলে, আর মলিনা সেই কলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচজনের সামনে দাঁতে বুরুশ করে বলে, সুধানাথ ওকে দেখতে পারে না। মনে মনে নাম দিয়েছে —'উঁচুনাকী'।

কিন্তু হঠাৎ কী হল?

উঁচুনাকী কান্না জুড়েছে কেন? নিশ্চয় বিপদ আপদ ঘটে গেছে কিছু।

টর্চটা নিভিয়ে ফেলে বলল, 'কী ব্যাপার ঘোষ মশাই?'

ঘোষ মশাই তাঁর বাসার এই ভাড়াটেটিকে একটু প্রীতির চক্ষে দেখেন। কারণ বউ ছেলের ঝামেলা নেই, অভিযোগ অনুযোগের বালাই নেই। সারাদিন তালা ঝোলানো ঘরটার জন্যে মাসে মাসে পুরোদস্তুর ভাড়াটি দেয়। এবং সকলের আগেই দেয়। দোসরা ভিন্ন তেসরা হয় না। যেটা তাঁর এই বাকি তেরো ঘরের কাছে আশাই করা যায় না।

সুধাকে নিয়ে মাধব ঘোষের চৌদ্দ ঘর ভাড়াটে। সুধাই সেরা।

তাই সুধার প্রশ্নে মাধব ঘোষ যেন জজকে সামনে পেল। নালিশের সুরে বলে উঠল, 'এই দেখুন মশাই, অজিতবাবু সময়ে বাসায় ফেরেননি বলে অজিতবাবুর পরিবার আমাকে থানা পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন।'

'থানা পুলিশ!'

মাধবকে ভীতি প্রদর্শন?

ব্যাপারটা বুঝতে কিছু সময় লাগল সুধানাথের। তারপর—অনেকের অনেকরকম কথা, সুখদার চিপটেন এবং মলিনার কান্না থেকে সবটা বুঝে নিল পরিষ্কার করে।

অজিত যে নিত্য সন্ধ্যা ছ'টায় ফেরে, এবং আজ এখনও ফেরেনি এটা শুনে সত্যিই চিন্তা হল তার। উড়িয়ে দেবার মতো কথা নয়।

রাত্তিরভোর ঘুমিয়ে সকালে 'যা হয়, করা যাবে' এটাও যেন অসংগত ঠেকল তার কাছে। তাই প্রশ্ন করল, 'তা উনি কাজটা করেন কোথায়?'

মলিনা ভাঙা গলায় বলল, 'কুন্তল বিলাসের অফিসে।'

'কুন্তল বিলাস? বড়ো অফিস? টেলিফোন আছে?'

'তা, জানি না—' মলিনা কাতর কণ্ঠে বলে, 'তবে আপিস মস্ত বড়ো। অনেক রাত অবধি এই সব ওষুধ পত্তর তেল টেল তৈরি হয়—'

'অনেক রাত অবধি হয়—'

সুধানাথ বলে, 'আচ্ছা দেখি, যদি অবনী ডাক্তারের ডাক্তারখানাটা এখনও খোলা থাকে, টেলিফোন করার সুবিধে হয়।'

নগেনবাবু আগ বাড়িয়ে বলেন, 'সে কথা কি আর আমরা ভাবিনি হে? ভেবেছি। কিন্তু ডাক্তারখানা কখন বন্ধ হয়ে গেছে।'

সুধানাথের অবশ্য বুঝতে দেরী হয় না, ভাবনাটা নগেনবাবু এখনই ভাবলেন। তাই মনে মনে হেসে বলে, 'আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে। যদি খোলাতে পারি। কম্পাউন্ডারটা তো শুয়ে থাকে ভেতরে।'

কম্পাউন্ডার দীনবন্ধুর সঙ্গে ভাব আছে সুধানাথের। দীনবন্ধু একই রেস্টুরেন্টে খেতে যায় মাঝে মাঝে। সুধানাথ বিনা টিকিটে সিনেমা হলেও ঢুকিয়ে দেয় কখনও সখনও বন্ধু দীনবন্ধুকে। ছবি যখন 'মরে' আসে, ভীড় হয় না, তখন দামী-সিটেই বসিয়ে দেয়।

সেই যোগসূত্রের ভরসায় বেরিয়ে পড়ল সুধানাথ।

যারা 'সকাল' দেখাচ্ছিল, তারা সুধানাথের এই অর্বাচীনতাকে ব্যঙ্গ করে খেতে শুতে গেল, মাধব ঘোষ আবার সুখ-শয্যায় অঙ্গ ঢাললো গিয়ে।

শুধু সুখদা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে রইল, শেষ মজা দেখবার জন্যে। বসে রইল মদনাকে কাছে বসিয়ে। গোলমালে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে সে। মায়ের গায়ে ঠেকা দিয়ে বসে বসে হাই তুলছে।

আর মলিনা নিজের দাওয়ায় উঠে গিয়ে এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

প্রতীক্ষার প্রহর অনন্ত!

মলিনার মনে হয়, সে বুঝি সারারাত ধরে কাঁদছে। মনে হয়, ওই ইয়ার ছোকরাটা নির্ঘাত মজা দেখতে থাকে বৃথা আশ্বাস দিয়ে আর কোথাও শুতে চলে গেল।

নইলে অবনী ডাক্তারের বাড়ি আবার কতদূর!

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুধানাথ যতটা সম্ভব দ্রুত গেছে। জানলায় টোকা দিয়ে দীনবন্ধুকে তুলিয়ে ডিরেক্টরি দেখে কুন্তল বিলাসের অফিসে এবং সেখানে সাড়া শব্দ না পেয়ে মালিকের বাড়িতে ফোন করে তথ্য সংগ্রহ করে, ছুটে ছুটে এসেছে।

ওকে ঢুকতে দেখেই, মলিনা চোখের কাপড় নামিয়ে ডুকরে ওঠে, 'খবর কিছু পেলে ঠাকুরপো?'

জীবনে কোনোদিন সুধানাথকে ঠাকুরপো বলেনি মলিনা। কথাই কয়েছে কি না সন্দেহ। পরস্পরের সঙ্গে কথা চালনার যে প্রধান কারণ—জল কল, সে কারণ মলিনার নেই। তাই কথাও নেই বড়ো একটা কারও সঙ্গে।

কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজ মলিনা 'কারে' পড়েছে। তাই ঠাকুরপো সম্বোধনে অন্তরঙ্গ হতে চাইছে তার সঙ্গে, যে তার বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

'ছেলেটার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে'—ভেবেছে মলিনা।

কই, একটা মানুষও তো এক পা বেরিয়ে এক তিল চেষ্টা করতে এগোয়নি? তখন তবু সময় ছিল। এখন তো সত্যিই অসময়। এই মনুষ্যত্বযুক্ত মানুষটাকে তাই অসহায়তার দুঃখময় মুহূর্তে নিকট সম্পর্কের সম্বোধনে আঁকড়াতে ইচ্ছে করল মলিনার।

নতুন এই সম্বোধনটা সুধানাথের কানেও মিষ্টি ঠেকল। কিন্তু এখন তো ভালো লাগালাগির সময় নয়। এখন যে বড়ো দুঃসময়। 'কুন্তল বিলাসে'র মালিক যা বললেন, সে তো আরও চিন্তার কথা।

মাত্র ছ'ঘণ্টাই তাহলে সমাজে অনুপস্থিত নয় অজিত ভট্চায, তেরো চৌদ্দ ঘণ্টার হিসেব মিলছে না।

রাত দুপুরে ফোন আসাতে ক্রুদ্ধ বড়োলোক বিরক্ত ভাবে জানিয়েছেন, অজিতের অসততায় বিরক্ত হয়ে তিনি আজ তাকে কাজে জবাব দিয়েছেন। বেলা এগারোটার সময় তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে অজিত ভট্চায। তারপর তার আর কোনো খবর তিনি জানেন না। বাড়ি ফেরেনি? স্ত্রী কান্নাকাটি করছে? কি করবেন। দুঃখিত।

কটাস করে কেটে দিয়েছিলেন কানেকশান।

অসততার কথাটা উল্লেখ করল না সুধানাথ, শুধু বলল, 'কী যেন বচসা হওয়ায় মালিক নাকি

কাজে জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন সকাল বেলাই। বেলা এগারোটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

'ও ঠাকুরপো, কোথায় সে গেছে তবে? সারাদিন কোথায় আছে? চাকরি যাওয়ার ঘেন্নায় কিছু ঘটিয়ে বসেনি তো?'

বলে, মলিনা চেঁচিয়ে ওঠে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে যমরাজের চরম পত্রের মতো ভয়ঙ্কর বাণীটি ঘোষণা করে বসে, সুখদার হাবা ছেলে মদনা।

'ত্যাখন অ্যা—অ্যা অ্যা—তো করে ব—বললাম, দে—দেখবে তো চল। অহঙ্কার করে ব-বসে থাকা হল। এ্যা-এ্যাখন বো-বোঝ। আ-আমি তো-তোকে নিখ্‌খাত বলছি মা, ওই রে রে রেলেকাটাটা বামুন কাকা।...তে-তেমনিতর নীঃ নীঃ নীল শার্ট ছিল পরনে!...উঃ সে কী রক্ত! মু-মুখটা এ্যা... এ্যাকেবারে ছেঁচে—'

আর শোনবার ধৈর্য থাকে না মলিনার, হঠাৎ দাওয়া থেকে গড়িয়ে উঠোনে পড়ে। ঠাঁই ঠাঁই করে কপাল ঠুকতে থাকে আর পরিত্রাহি চিৎকার করতে থাকে,—'ওগো, আমি কী কাজ করেছি গো! ওগো, কেন দেখতে যাইনি গো! সেই তো ভরদুপুর সময়, চাকরি খুইয়ে বাড়ি ফিরছিল সে। নিশ্চয় মনের ঘেন্নায় লাইনে ঝাঁপ দিয়েছে—'

নিজের কপাল ছেঁচে রক্তগঙ্গা করে মলিনা।

এরপরে আর মহিলাকুল রাগ করে ঘরে বসে থাকতে পারেন না। মলিনাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করেন সমবেত চেষ্টায়। এবং কারুরই আর সন্দেহমাত্র থাকে না, সেই রেলেকাটা হতভাগ্যই—অজিত ভট্‌চার্য্য।

মিলে তো যাচ্ছে ঠিক ঠিক।

নীল শার্ট।

বেলা এগারোটা।

চাকরি খোয়ানো মন।

আর প্রমাণের দরকারটা কি?

সকলেই 'হায় হায়' করতে থাকে, তখন একবার দেখতে না যাওয়ার জন্যে, এবং পুরুষরা—যাঁরা নাকি স্ত্রীদের হুজুগে নাচা একেবারে দেখতে পারেন না, তাঁরা অভিযোগ করতে থাকেন—'এই তিন লাফের রাস্তা, একবার গেলে না কি বলে? ধন্যি, নিশ্চিন্দি মন! বলি, এ যদি আমরা হতাম!'

কিন্তু এখন কোথায় সেই দ্বিখণ্ডিত দেহ, যেখানে ছুটে গিয়ে শনাক্ত করতে যাওয়া হবে?

উন্মাদ চিৎকার আর উন্মত্ত আচরণ এক সময় স্থির হয়। মলিনাকে টেনে দাওয়ায় তুলে চোখে মুখে জল দিয়ে একজন পাখা নেড়ে বাতাস করতে থাকে।

এবং সমস্ত মহিলাকুল আপন আপন ঘর ত্যাগ করে সেই দাওয়ায় জটলা করে বসে আলোচনা করতে থাকেন, ইতিপূর্বে তাঁদের জ্ঞান-গোচরে আর কোথায় কোথায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

এমন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সচরাচর তো দেখতে পাওয়া যায় না।

এঁদের দাপটে সুধানাথ সরে গিয়েছিল।

কিন্তু চোখে তার ঘুম আসছিল না। কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নিজের কোটরে, চৌকিটার ওপর।

আর কেমন যেন মনে হচ্ছিল সুধানাথের, আগামী সকালের সমস্ত দায়িত্বই বুঝি তার। সেই রেলেকাটার খোঁজ করতে হবে, মলিনাকে নিয়ে গিয়ে শনাক্ত করতে হবে এবং তারপর মলিনার এই অসহায় অবস্থার উপায় চিন্তা করতে হবে।

কিন্তু সে লাশ কি ওরা রেখেছে?

হয়তো ফটো তুলে রেখে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফটো দেখে কি বোঝা যাবে?

আচ্ছা! এই বা কী আক্কেল অজিত ভট্চাযের? বাড়ির দোরে লাইনে কাটা পড়তে এল!

কিম্বা হয়তো আত্মহত্যা নয়।

মন প্রাণ খারাপ ছিল, অসতর্কতায় হয়ে গেছে। গেট নামিয়ে দেওয়ার পরও মাথা গলিয়ে গলিয়ে লাইন পারাপার হওয়ার অভ্যাস তো সকলেরই।

শহরতলীতে যাদের বাস করতে হয় তারাই জানে, ও অভ্যাস না করতে পারলে কী অবস্থা!

যমে কামড়ানো রাতও একসময় ভোর হয়।

এ বাড়িতেও হল।

মলিনা উঠে কাঠের মতো দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে, গিন্নিরাও ঠিক করতে পারছেন না, মলিনার এখন কিংকর্তব্য!

লাশ তো চোখে দেখেনি এখনও, দেখতে পাবে তারও ঠিক নেই। সৎকার করার প্রশ্নও তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে? তার স্ত্রীর বিধবা হওয়া চলে কি? অথচ বামুনের মেয়ে। যা তা করলেও চলবে না।

নগেন গিন্নি বললেন, 'সিঁদুরটা নয় এক্ষুনি মুছে কাজ নেই, নোয়াগাছটা ফেলে দিক। একবার মাথাটা ডুবিয়ে, কাপড় ছেড়ে একঘটি জল মুখে দিক। কাল থেকে একা কেঁদে কেঁদে আহা মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না।'

তা সত্যি, সেই প্রবল কান্নার দাপটে এবং মাথা খোঁড়ায় মলিনার মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছিল। কপালে কালসিটে, শুকনো রক্তের দাগ, এবং দু' তিনটে উঁচু উঁচু ঢিবি। মুখটা ফুলো ফুলো, মুখের চামড়াটা শুকনো। মাথায় কাপড়ও ছিল না মলিনার।

ঘরের জানালা থেকেই দেখতে পাচ্ছিল সুধানাথ। কিন্তু খুব ভোরে করণীয় কি আছে? একটু বেলা না হলে তো কোথাও কাউকে পাওয়া যাবে না?

সকালের চাকরিটায় আজ আর গেল না সুধানাথ, অপেক্ষায় রইল একটু পরে ওই ওখানকার গুমটি ঘরে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার।

কিন্তু মলিনার কী হবে?

ওই মেয়েমানুষগুলো কি ওকে জ্যান্ত রাখবে?

যা সন্দেহ তাই।

ঘটনার খানিক পরেই নাকি অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি লাশ তুলে নিয়ে গেছে। এবং খুব সম্ভব এতক্ষণে সে লাশ জ্বালিয়েও ফেলেছে।

নাও ফেলতে পারে। ফটো তুলে রাখতে পারে। সব দায়িত্বই হাসপাতালের।

রেল পুলিশেরও থাকতে পারে কিছু দায়িত্ব। মোট কথা, এদের কিছু নেই! স্টেশন মাস্টার বরং মেজাজ দেখিয়ে বলেন, 'যত হতভাগার রেলে কাটা পড়ে মরতে ইচ্ছে করে! আর আমাদের হচ্ছে মৃত্যু। কেন রে বাবা, চিরদিনের দুঃখনিবারিণী মা গঙ্গা আছেন, মরতে ইচ্ছে হয় তো সেখানে ঝাঁপ দিয়ে মরগে যা না! তা নয়, নিজে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।'

'আত্মহত্যা, না অসাবধান?'

'তা কী করে জানব মশাই। ইঞ্জিন তেড়ে আসছে, অথচ বাবুরা দিব্যি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে লাইন পার হচ্ছেন, এতো হরদম দেখি। বেড়াতে যাচ্ছে, না সুইসাইড্ করতে এসেছে, কে বুঝবে?'

ওঁর বক্তৃতা থামিয়ে সুধানাথ অনেক কষ্টে হাসপাতালের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে। কিন্তু জেরার মুখে পড়তে হয় তাকে কম নয়।

মৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, কি নাম মৃতের, গতকাল থেকে এতক্ষণে খোঁজ নেবার সময় হল? বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়েছিল কি না, আত্মহত্যার কোনো কারণ ছিল কি না, ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং বহু ঘাটের জল খেয়ে সুধানাথ যখন মড়ার গাদার কাছে পৌঁছল তখন ফটো তোলা পর্ব সেরে, বেওয়ারিশ বলে জ্বালাতে নিয়ে যাচ্ছে।

সুধানাথ চিনতে পারল না।

সুধানাথ পচাগন্ধে ঠিকরে বেরিয়ে এল লাশঘর থেকে। শুধু অনেক অনুনয় বিনয়, এবং কিছু সলিড জিনিস সাপ্লাই করে কাজটা একটু স্থগিত রাখবার ব্যবস্থা করে, ট্যাক্সি ভাড়া করে মাধব ঘোষের বাসায় ফিরে এল।

মলিনাকে নিয়ে যেতে হবে!

কাজটা যত নৃশংসই হোক, না করে উপায় নেই।

কিন্তু একা যাওয়া ঠিক নয়।

সময় যেমনই হোক, সমাজ তার পাওনা ছাড়ে না। এই মাধবের বাসার তেরো ঘরের ঘরণী—নিশ্চয়ই এখুনি নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে, যদি সুধানাথ আর মলিনা এক ট্যাক্সিতে চড়ে ওদের নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অতএব খোসামোদ করতে হবে ওদের!

বলল সুধানাথ, 'আপনারা কেউ চলুন।'

দাস গিন্নি ফিসফিসিয়ে হেসে নগেনবাবুর স্ত্রীকে বললেন, 'ঠাকুরপোর যে দরদ উথলে উঠেছে! নিজের কাজ ছেড়ে মাথায় সাপ বেঁধে ঘরে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে। এখন আমায় বলছে লাশ শনাক্ত করতে সঙ্গে যেতে। আমি কখন যাব দিদি?'

দিদি বললেন, 'আমারও বাবা মরবার সময় নেই। তা ছাড়া, ওসব শুনলেই ভয় করে।'

কমবয়সীদের তো কথাই ওঠে না, গিন্নিরাই জবাব দিলেন।

অবশেষে সুখদা।

যে সুখদাকে কাল দুপুরে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাড়িয়েছিল মলিনা।

কিন্তু এখন আর মান অপমান জ্ঞান নেই মলিনার। ক্রমশই যেন কেমন জবুথবু হয়ে যাচ্ছে সে।

গত রাত্রের সেই উন্মত্ত শোকের মধ্যেও তবু 'মলিনা' নামক মানুষটাকে চিনতে পারা যাচ্ছিল, আজ যেন সে মলিনা হারিয়ে গেছে।

তাই সুখদা যখন বিজয় গৌরবে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে সশব্দ স্বগতোক্তি করল, 'আমারই হয়েছে মরণ! এই তো, সবাই গা ঝাড়া দিয়ে নিজের সংসার নিয়ে বসে রইল, আমি পারলাম? আপুক্ষতি করেও চললাম। কই বললাম কি, 'তুমি আমায় পোঁছ না, তুমি আমায় দূরছাই কর, তোমার অসময়ে আমি দেখব কেন?' তখনও চুপ করেই থাকল মলিনা।

সুধানাথ বলল, 'আর থাক, এসময় ওসব কথা থাক।'

সত্যিই, সুখদার অনেক কাজের ক্ষতি হল।

অনেক বেলায় ফিরল ওরা।

মাধব ঘোষ নিজেই মদনার সাহায্যে একটা চালে ডালে পাক করে নিয়ে খেতে বসেছে। মদনাকেও খাইয়েছে তার আগে।

সুখদা এসে আপসে পড়ল, 'ঠিক বলেছিল মদনা! একেই বলে কাঙালের কথা বাসি না হলে মিষ্টি হয় না।...দেখলাম, বামুন ছেলেই! মুখ চেনবার উপায় না থাকলেও অঙ্গ আকৃতি দেখলে তো বোঝা যায়?'

'উনি কি বলেন?'

মাধব ঘোষ খিচুড়ির গরম সাপটে প্রশ্ন করল!

এবং একা মাধব ঘোষই নয়, মলিনাকে বাদ দিলে, বারো ঘরের যতজন ছিল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওই একই প্রশ্ন করল, 'মলিনা কি বলল?'

সুখদার আজ পদমর্যাদা রাষ্ট্রপতি সদৃশ। সুখদা তাই মুখ চোখের যত রকম ভঙ্গি করতে সে জানে, সব করে নেয় এবং ফিসফিসে গলায় বলে, উনি? 'উনি হচ্ছেন ধূর্ত মেয়ে মানুষ। উনি স্বীকার পেলেন না। বললেন, 'বুঝতে পারছি না।' বললেন, 'এ রকম জামাকাপড় নয়।' নাকে কাপড়ে দিয়ে সরে এলেন। আরে বাবা! রক্তে ভিজে জামা কাপড়ের আর চেহারা আছে কিছু?—তা কেন, বুঝছ না? স্বীকার পেলেই তো এক্ষুণি সব গেল। শাড়ি, চুড়ি, নোয়া, সিঁদুর। তার থেকে 'বুঝতে পারলাম না' বলে নিলেন। চুকে গেল ল্যাঠা। এখন চিরজন্ম আর কেউ এয়োতি কেড়ে নিতে পারবে না!'

মলিনার এই ধূর্তামিতে সকলেই বিরক্ত হল। এবং কোনো মজা দেখা গেল না বলে হতাশ হল। মলিনা শুয়ে পড়ে রইল ঘরের মেঝেয়। কেউ আর সান্ত্বনা দিতে এল না।

যে মেয়েমানুষ বিধবা হয়েও চালাকীর জোরে বৈধব্য এড়িয়ে বসে থাকে, তাকে আবার সান্ত্বনা কি?

বিকেলের কাজটায় যেতেই হয়।

অস্নাত, অভুক্ত সুধানাথ দাস গিন্নির কাছে এসে বলে, 'আমাকে তো বেরোতে হচ্ছে। ওঁকে আপনারা বলে কয়ে একটু জল অন্তত খাওয়ান।'

দাস গিন্নি ক্ষুব্ধ হাস্যে বলেন, 'তুমিই কেন একটু খাইয়ে গেলে না ভাই। তোমার কথা বরং শুনতো। আমাদের কথা কি নেবে?'

সুধানাথ এই সাদাসিধে কথাটার মধ্যে যেন আঁসটে আঁসটে গন্ধ পেল।

তাই সুধানাথ গম্ভীর হয়ে গেল।

গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনাদের কথা নেবেন না, আমার কথা শুনবেন, এটা কি বলছেন আপনি? আমার সঙ্গে পরিচয় বা কতটুকু? বলতে গেলে কালই প্রথম কথা বলেছি ওঁর সঙ্গে।'

দাস গিন্নি অমায়িক গলায় বলেন, 'দিন, ঘণ্টা, মাস দিয়ে কি আর পরিচয়ের ওজন মাপা যায় ভাই? একদিনের পরিচয়েও চিরদিনের আপন হতে পারে। তুমি ওর অনেক করলে, কৃতজ্ঞ হয়েও তো ও—'

'আমি এমন কিছুই করিনি। মানুষ মাত্রেই এটুকু করে—' বলে বেরিয়ে যায় সুধানাথ।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে তার। কিন্তু শুধুই কি সেইদিন? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত?

কিন্তু কার কি এসে যায় যদি সব সময় সুধানাথের সর্বাঙ্গ জ্বলে? সেই রাগটা বরং এদের হাসির খোরাক।

'ঠাকুরপোর দরদ' আখ্যা দিয়ে সুধানাথের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

দিন গড়িয়ে যায়।

বেশ কয়েকটা দিন।

যাবেই।

দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন আসবেই। আর যে কোনো ধরনেরই অবস্থা হোক, মানুষ এক সময় উঠবে, হাঁটবে, নাইবে, খাবে।

মলিনাও উঠেছে।

নাইছে, খাচ্ছে।

ক'দিন বেশি ভাড়ার ভাড়াটের গৌরব নিয়ে আলাদা কলতলায় নাইবে? মাসটা শেষ হলেই তো বিরাট একটা দৈত্য হাঁ করে দাঁড়াবে।

মলিনা মাছ, মাংস খায় না, কিন্তু মলিনা লোহা, সিঁদুরও ফেলেনি। মলিনা যেন ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলছে। এর চাইতে অজিত যদি স্পষ্টাস্পষ্টি মারা যেত, মলিনা বুঝি স্বস্তি পেত!

কিন্তু অজিত তো স্পষ্ট মারা গেল না! অজিত যেন একটা ধূসর শূন্যতায় হারিয়ে রইল। সুখদা জোর গলায় বলেছে, 'ও-ই অজিতের লাশ,' কিন্তু মলিনার মন নেয়নি।

যতই বিকৃত হোক, ওই হাত পা কি অজিতের?

সুখদা বলেছিল, 'ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে, এখন তুমি হাত পায়ের গড়ন খুঁজছ?'

কিন্তু না খুঁজলে কোন্ খুঁটিটাকে চেপে ধরবে মলিনা?

মলিনা ভগবানের কাছে শতবার নালিশ জানায়, স্পষ্ট কেন বুঝিয়ে দিলে না ঠাকুর! সে যে আমার শতগুণ ভালো ছিল। রাজ্যসুদ্ধ মেয়েমানুষ বিধবা হচ্ছে, আমিও হতাম। এ তুমি আমাকে কী করে রাখলে?

অথচ ওই গিন্নিগুলোর কথা শুনে, বিধবা মূর্তি করে, অজিতের নামে পিণ্ডি দেবে, সেও যে কিছুতেই মন সায় দেয় না।

তাই ঘর থেকে আর সহজে বেরোচ্ছে না মলিনা, কোনোমতে আড়ালে আড়ালে কাটাচ্ছে।

মাসের প্রথম দিকে হারিয়ে গেছে অজিত, আর ঠিক তার আগের দিনই মাসকাবারী বাজারটা করেছিল। সুধানাথ এক ফাঁকে, কোনো সময়, দাওয়ায় দুটো আলু পটল রেখে যায়, দিনান্তে একবার উঠে মলিনা দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে নেয়। বাকি সময় শুয়ে থাকে।

এই বারো ঘরের ঘরণীদের কাছে সে যেন একঘরে হয়ে গেছে।

ওর ওই বিধবা না হবার জেদ, আর সুধানাথের ওকে দেখাশোনা, ওদের চক্ষুশূল। আর এঁদের রূঢ় মন্তব্য ও হৃদয়হীন ঔদাসীন্য, মলিনার যেন মর্মান্তিক লাগে।

প্রতি মুহূর্তে উঠে পালাতে ইচ্ছে হয় মলিনার।

তার সেই গর্ব, সেই অহঙ্কার, সব বিসর্জন দিয়ে এভাবে পড়ে থাকা কি সহজ?

তাছাড়া—

পড়ে থাকতেই বা ক'দিন দেবে মাধব ঘোষ? ও মাসের দোসরা হলেই তো এসে হয় ভাড়া চাইবে, নয় নোটিশ দেবে!

কিন্তু আশ্চর্য! দশ, বারো, পনেরো তারিখ হয়ে গেল, মাধব ঘোষ না দিল নোটিশ, না চাইল ভাড়া। একবার করে যখন এদিকে এসে মলিনার তত্ত্ব নিচ্ছিল, তখন মলিনা অস্ফুটে বলেছিল, 'আপনার— ভাড়াটা—'

মাধব ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'থাক, থাক, ও নিয়ে এখন আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। আমি তো আর পিশাচ নই!'

মলিনা ভেবেছিল, পিসাচের আবরণেও তা হলে 'মানুষ' থাকে। এই সব ভালো লোকেরা এই ব্যবহার করছেন, অথচ চিরদিনের অর্থপিশাচ মাধব ঘোষ—

কিন্তু এ কী জীবন হল মলিনার!

মাধব ঘোষ দাক্ষিণ্য করে বাসার ভাড়া নেবে না, কে কোথাকার সুধানাথ দয়া করে দুটো বাজার করে দিয়ে যাবে, আর মলিনা একবেলা তাই ফুটিয়ে খাবে, আর বাকি সময় মেঝেয় পড়ে পড়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করবে?

আর কিছু নেই?

ভবিষ্যৎ বলে একটা বস্তু অজিতের মতোই ধূসর হয়ে থাকবে?

তা ছাড়া, একঘরে হয়ে থাকার মতো কষ্ট আর কি আছে?

স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মলিনা যে একসময় নিজেই ওদের হেয় জ্ঞান করে ওদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো, সে আর এখন মনে পড়ে না মলিনার।

ওরা যে রাঁধছে, বাড়ছে, খাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, ছেলে ঠেঙাচ্ছে— এক কথায় জোর কদমে সংসার করছে, অথচ কদাচিৎ মলিনার ঘরে উঁকি মারছে না, এতো শুধু কষ্টেরই নয়, অপমানেরও।

আসে, এক আধবার স্বপনের মা আসে।

বলে, 'মলিনাদি, চৌকিটায় শুলে তো পারো। রাতদিন মাটিতে শুয়ে শুয়ে রোগে ধরলে দেখবে কে?'

বলে, 'বুঝলে মলিনাদি, গিন্নিরা সব তোমার ওপর খাপ্পা। এই যে আমি একটু এসেছি, তা সব ভালো চক্ষে দেখে না।'...

আবার এ কথাও বলে, 'সুধানাথবাবুর সঙ্গে বুঝি তোমার আগেকার চেনাজানা ছিল ভাই?'

মলিনা কোনো কথারই উত্তরই দেয় না।

মুখরা মলিনা যেন মূক হয়ে গেছে।

কিন্তু মলিনাকে আরও মূক করে দেবার মতো আরও এক ঘটনা ঘটল।

একটা মুটে এসে মাসকাবারি বাজার এনে মলিনার দাওয়ায় নামাল। চাল, ডাল ফুরিয়ে এসেছিল। দু'জনের ভাগ একজনে খেলেও, এসেছিল। একমাস যে দু'মাসে ঠেকতে বসেছে। ফুরিয়ে এসেছিল, মলিনা ভাবছিল, না খেয়ে মরা যায় না? মন্দ কি, যদি মলিনা সেই পদ্ধতি ধরে?

হঠাৎ—এই সময় এই।

মলিনা বলল, 'তুমি ভুল করছ। এ ঘর নয়।' মুটেটা বলল, 'এই তো সাত নম্বর ঘর! চিঠি আছে।'

বাড়িয়ে ধরল একটা কাগজ।

চিঠি আছে।

এ কি অদ্ভুত কথা!

মলিনার চিঠি আছে। যে মলিনার তিনকুলে একটা 'মাসি' বলতে নেই, এতবড়ো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, মলিনার কোনো কুল থেকে কেউ খবর নিতে এল না, তাকে আবার চিঠি কে দেবে?

দেখেশুনে আর ঘরেরা তো এমন সন্দেহও প্রকাশ করছে, বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রী তো? না কি ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসা? তিনকুলে কেউ নেই, এমন হয়?

কিন্তু হয়েছে।

সত্যিই কেউ নেই। আর যদিও সুদূরে কেউ থেকে থাকে, মলিনা তো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। আজ মলিনা তাই চিঠি আছে শুনে নিথর হয়ে গেল।

হে ঈশ্বর, এমন হয় না যে, এ চিঠি অজিতের!

দুষ্টুমী করে কোথাও লুকিয়ে বসেছিল। এখন খেয়াল হয়েছে মলিনার চাল, ডাল ফুরিয়েছে, তাই সব কিনে কেটে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।—'মলিনা, আমি অজ্ঞাতবাসে আছি, কিন্তু তোমার বাজারটার চিন্তায় শান্তি নেই। তাই—'

কল্পনাটুকু মুহূর্তের।

কাগজের টুকরোটুকু খুলে ধরল মলিনা। লেখা রয়েছে, 'আপত্তি করবেন না। বাঁচতে তো হবে।'

সুধানাথ মিত্র

বাঁচতে তো হবে!

আশ্চর্য, আজও পৃথিবীতে এমন কেউ রয়েছে, যে মলিনার বাঁচার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। সেই বাঁচার জন্যে রসদ জোগান দিতে আসছে।

নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নামিয়ে দাও।'

এরপর আর নগেন গিন্নি, দাস গিন্নি, মণ্ডল গিন্নির নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব হল না। ওঁরা এলেন দাঁত খুঁটতে খুঁটতে, ভিজে কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে।

'বাজার কে করে দিল? সুধাবাবু বুঝি? তাই ভাবছি উনিই তো দেখাশোনা করছেন। আমরাও তাই নিশ্চিন্দি আছি। একজন যখন সমগ্র ভার নিয়েছে—'

মণ্ডল গিন্নি বলেন, 'সুখদাদি চেপে গেল, ভাব দেখাচ্ছে যেন ঘোষ মশাই অমনি থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। সুধাবাবুই নাকি এ ঘরের ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছেন। তাই ইনি বলছিল, 'তোমরা আর অজিতবাবুর বউয়ের কথা নিয়ে মন খারাপ করছে কেন? অজিতবাবু নেই, সুধাবাবু তো তার বাড়া করছেন।' আচ্ছা, তা মলিনা, মাছটা কেন খাওনা? সবই যখন রেখেছ—'

মলিনার প্রতিজ্ঞা মলিনা মুখ খুলবে না। তাই মলিনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। শুধু মনে মনে বলে, 'এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, তবুও জোর করে ওই অর্থ পিশাচটাকে দেবতা ভাবছিলাম। কিন্তু এ আমি কোথায় চলেছি?...কেন নিচ্ছি এত? এ ঋণ আমি শোধ করব কি দিয়ে!'

রাত্রে শুয়ে আকুল হয়ে বলে, 'তুমি কি সত্যিই আর আসবে না?...তুমি কি সত্যিই জন্মের শোধ চলে গেছ? সুখদার চোখই নির্ভুল?...আমি আসার ছলনায় ভুলে ভুল দেখেছি! তাই ওরা আমায় একঘরে করে রেখেছে, আমায় ঘেন্না করছে।...কিন্তু আমি ওদের চোখের সামনে এই ভাবে কি করে কাটাব?'

অনেকক্ষণ ভেবে মলিনা ঠিক করল বামুনের মেয়ে, রাঁধুনী বৃত্তি ধরবে। এভাবে দয়ার অন্ন খাওয়ার চেয়ে চাকরি করে খাওয়া ভালো।

তাতে পেটের ভাত জুটবে, ঘরের ভাড়াও হবে।

লজ্জা করবে?

মাথাকাটা যাবে?

তা প্রথম প্রথম হয় তো যাবে। তারপর সয়ে যাবে।

কিন্তু 'স্বামী নিরুদ্দেশ' এই পরিচয় কি সমাজে মান্য? কথাটা যেন হাস্যকর। তার থেকে ওদের মনস্কামনাই পূর্ণ হোক। মলিনা বিধবার সাজ সেজেই—

শেষটা আর ভাবতে পারল না মলিনা। চোখের জলে একাকার হয়ে গেল।

এঁরাও তেমন সুখ পেলেন না।

মলিনা যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকে একেবারে কথা কইবে না, কত আর এগোনো যাবে?

এক উপায় আছে, মাধব ঘোষকে দিয়ে বলানো, 'ভদ্র বাড়িতে এসব অনাচার চলবে না।'

অনাচার ছাড়া আর কি? একটা লোক অপঘাতে মরল, আর মরতে না মরতে বাসার আর একটা লোক তার পরিবারকে নিয়ে নিল, এর মতো অনাচার আর কি আছে?

তা নিয়ে নেওয়া ছাড়াই বা আর কি?

খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, ঘরভাড়া দিচ্ছে, বাকিটা কী? শেষ যা হবে তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। নেহাত পাঁচজনের চোখের সামনে তাই, নইলে এতদিনে সবই হত।

এই কথাই বোঝাতে হবে মাধবকে।

ভাড়াটে গেলে ভাড়াটে হবে না, সে ভয় তো আর নেই এ যুগে? বরং বেশি ভাড়ায় ভাড়াটে আসবে। এই স্বভাবচরিত্রহীন ছেলেটাকে আর মলিনাকে নোটিশ দিক মাধব ঘোষ।

আক্রোশ মেটাবার এই চরম উপায় আবিষ্কার করে এরা।

আক্রোশ?

তা আক্রোশ নয় কেন? দুঃখে পড়ল, অথচ দুঃখী হল না, এ মেয়েমানুষকে কখনও চোখের ওপর সহ্য করা যায়?

দাস গিন্নি ভেতরে ভেতরে দুটো ভাড়াটেও ঠিক করে ফেললেন মাধব ঘোষের। তারপর পাড়লেন কথাটা।

রাত ছাড়া দেখা হয় না।

মলিনা তখন সুধানাথের কাছে এসে চাকরি জুটিয়ে দেবার দরবার করছিল। টর্চ নিভিয়ে চাবির মোচড় দিয়ে দরজাটা সবে খুলেছে সুধানাথ, পিছন থেকে মলিনা বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ঠাকুরপো।'

সুধানাথ থমকে তাকাল।

তারপর বলল, 'বলুন।'

সুধানাথের ঘরে লাইট নেই। মলিনার ঘরে আছে। সেই লাইটের কিয়দংশ এসে এ দাওয়ায় পড়েছিল। আর মলিনার ঘরটা যে খালি, তা খোলা দরজা দিয়ে দেখা দিচ্ছিল।

সুধানাথের অস্বস্তি হচ্ছিল।

তবু বলল, 'বলুন।'

মলিনা বলল।

সুধানাথ চমকে বলল, 'চাকরি? কি চাকরি?'

'তা আমি কি আর আপিসের চাকরি চাইছি? বামুনের মেয়ের যাতে লজ্জা নেই, সেই কাজই করব। একটা রাঁধুনীর কাজ তুমি আমায়—'

কথা শেষ হবার আগেই মাধব ঘোষের শ্লেষ্মাজড়িত ভারী গলার আওয়াজ বেজে উঠল। 'সুধানাথবাবু, ভেবেছিলাম কিছু বলব না। কিন্তু না বলেও তো পারছি না। মাধব ঘোষের বাসাটা বিন্দাবন নয়, বুঝলেন? এই আপনাকে আমি নোটিশ দিচ্ছি—তিনদিনের মধ্যে আপনার ওই বান্ধবীকে নিয়ে এই বাসা ছেড়ে সরে পড়বেন।'

সুধানাথ গম্ভীরভাবে বলে, 'তিনদিনের নোটিশ দিচ্ছেন? বাড়িভাড়া আইনটা বুঝি আপনার জানা নেই?'

মাধব ঘোষ অবশ্যই এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং উত্তরও জুগিয়ে রেখেছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'জানব না কেন? খুব জানা আছে। আবার হাটে হাঁড়ি ভাঙবার কায়দাও জানা আছে। কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত করে যদি থাকতে চান তো থাকুন, তবে অজিতবাবুর পরিবারের মতন খারাপ স্ত্রীলোক আমার বাসায় রাখলে, এরপর আমার ভদ্দর ভাড়াটেরা চলে যাবে। সেই কথাটাই ওঁকে জানিয়ে দেবেন।'

মাধব ঘোষ চলে যায়।

বেশ গট গট করেই যায়।

সমস্ত ঘরের দরজা-জানালা যে ঈষৎ উন্মুক্ত তা দেখতে তার বাকি থাকে না। বোঝে কাজটা সুচারু হয়েছে।

মলিনা?

সে বোধ করি, আজকাল নিতান্ত শক্ত হয়ে গেছে বলেই সহজভাবে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

তিনদিন পরে নয়।

পরদিনই, সুধানাথের যখন কাজের সময়, তেমন অনর্থকালে একটা ঠেলাগাড়ি এসে মাধব ঘোষের বাসার দরজায় দাঁড়াল।

সুধানাথও এল। খুব সম্ভব ছুটি নিয়েছে। নিজের যৎকিঞ্চিৎ জিনিস ঠেলায় তুলে, এঘরে এসে নেহাত সহজভাবে বলল, উঠুন, একটু ঠিক হয়ে নিন, জিনিসপত্রগুলো তুলিয়ে ফেলি—'

মলিনা মিনিটখানেক চুপ করে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার সঙ্গে যাব?'

'যাবেন না তো কি ওই চামারটার মধুর বাক্য শোনবার জন্যে পড়ে থাকবেন?'

'কিন্তু এতে তো ইচ্ছে করে আরও বদনাম মাতায় তুলে নওয়া।'

সুধানাথ গম্ভীরভাবে বলে, 'উপায় কি? বদনামও রইল—অপমানও রইল, সে অবস্থার চেয়ে তো ভালো। যেখানেই নিয়ে যাই আপনাকে, অন্তত প্রতিক্ষণ অসম্মানের মধ্যে তো থাকতে হবে না?'

মলিনা আর একবার স্থির চোখে চেয়ে নির্লিপ্ত কঠিন গলায় বলে, 'কিন্তু তোমার মতলবই যে খারাপ নয়, তা বুঝব কি করে?'

সুধানাথ একটু থমকাল।

তারপর সামান্য হেসে বলল, 'সেটা তো একদিনে বোঝা যায় না? বুঝতে সময় লাগে। ধীরে ধীরেই বুঝবেন। এখন চলুন তো।'

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মলিনা চৌকির ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে ওঠে, 'এ বাসা ছেড়ে আমি যেতে পারব না ঠাকুরপো, ও তাহলে জন্মের শোধ মুছে যাবে, সত্যি করে হারিয়ে যাবে।...এই ঘরের সর্বত্র ও রয়েছে। এইখানে শুয়েছে। এইখানে বসেছে—'

কান্নার শব্দে এদিক-ওদিক থেকে উঁকি পড়ে। সুধানাথ টের পায়। সুধানাথ শান্তস্বরে বলে, 'মানুষকে এর চাইতে আরও অনেক কঠিন কাজ করতে হয়। সেই ভেবে স্থির হোন। আপনি 'যাব না' বললেও তো হবে না। মাধব ঘোষ তো ওর পুণ্যের বাসা থেকে পাপপক্ষীদের উড়িয়ে ছাড়বে।'

মলিনা উঠে দাঁড়ায়।

মলিনা ভাবে, যাব না বলে জেদ করছি? কোথায় থাকতাম আমি, যদি ও ঘরের ভাড়া দিয়ে দিয়ে আমার বাসা বজায় না রাখত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুকের পাঁজর গুঁড়োনো দেখে মলিনা। মুটেগুলো রূঢ় কঠিন হাতে হিড় হিড় করে টানতে থাকে চৌকি, বাক্স, বাসন, বিছানা, শিশি-বোতল, ভাঁড়ারপত্র।...যে সব বস্তু দিয়ে প্রাণতুল্য করে গুছিয়ে ছিল মলিনা এই তার বাসাকে।

অজিত আর তার।

কত টুকিটাকি সৌখিন জিনিস, কত স্মৃতিবিজড়িত জিনিস!

একখানা ঘরে এত জিনিসও ছিল!

আবার কোন্ ঘরে এত সব ভরবে? অজিত কেন এমন করল?

মলিনার সঙ্গে কোন্ জন্মের শত্রুতা ছিল তার?

কিন্তু অজিত ভট্চায্ নামের সেই মানুষটা, যার জন্যে মলিনা নামের মেয়েটার জীবন মিথ্যে হয়ে গেল, সে কেন সেদিন বাড়ির দরজায় এসে রেল লাইনে মাথা দিয়েছিল?

কেন?

মলিনার সঙ্গে সত্যিই কোনো শত্রুতা ছিল নাকি তার?

না কি সত্যিই পূর্ব জন্মের? সেই পুরনো আক্রোশ মেটাবার এই পথটাই দেখতে পেয়েছিল সে।

অথচ মনে তো হত মলিনা তার পরম নিধি। মলিনার কষ্ট বাঁচাতে, মলিনাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে, সধ্যের অতিরিক্ত করেছে ওই অজিত ভট্চায্।

এই বারো ঘরের ভাড়াটেদের মধ্যে মলিনা যে সকলের থেকে 'বাবু বাবু' আর উঁচু পর্যায়ের ছিল, সেতো শুধু অজিত ভঠ্চাযের ওই আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই? নইলে দাসকর্তা ওর চেয়ে অনেক অনেক বেশি রোজগারী। মণ্ডলকর্তাও কিছু কম নয়।

তবে হ্যাঁ, এরা যে নিঃসন্তান সেটাও এদের শৌখিন আর বাবু বাবু হয়ে থাকার সহায়ক।

আর নিঃসন্তান বলেই হয়তো বিয়ের এতদিন পরেও ওদের দু'জনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আর আবেগ ছিল জোরালো।

নববিবাহিতসুলভ রঙ্গরস, খুনসুটি ঝগড়া, মান অভিমানও ছিল ওদের হয়তো এই জন্যেই।

তুচ্ছ কোনো কারণে কথা কাটাকাটি হয়ে হয়তো রাত থেকে কথা বন্ধ, অজিত কর্মস্থলে যাত্রাকালে বলে যেত, 'এই চললাম আর ফিরব না। নিশ্চিন্তে থাকবে।'

মলিনা মনে মনে 'দুর্গা দুর্গা' বললেও মুখে গাম্ভীর্য অটল রাখতো।

কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার দিনের সন্ধ্যাবেলাটাই হয়তো দেখা যেত, মলিনা বিকেল থাকতেই রান্না সেরে অজিতের প্রিয় কিছু জলখাবার বানিয়ে, পরিপাটি সাজসজ্জা করে বসে আছে। আর অজিত বাড়ি ঢুকছে হয় এক ঠোঙা ডালমুট আর এক ভাঁড় রাবড়ি হাতে করে। নয় রেস্টুরেন্টের চপ কাটলেটের গোছা নিয়ে।

কখনও কখনও বা দু'খানা নাইট শোর সিনেমার টিকিট।

সিনেমা গেলে অজিত আর মলিনা নাইট শোতেই যেত। মলিনা বলত, 'এই বেশ বাপু, এসেই টুপ করে শুয়ে পড়লাম, আর কোনো ঝামেলা রইল না।'

মলিনা কোনো ঝামেলা পছন্দ করতো না বলেই কি ভগবান তাকে এই ভয়ঙ্কর একটা নিশ্চল শূন্যতার মধ্যে ফেলে দিলে?

তা ঝামেলা তো সত্যিই কিছু নেই আর। একটা লোক যদি স্বেচ্ছায় এবং বিনা শর্তে মলিনার দায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়, মলিনার কী ঝামেলা রইল?

কিন্তু অজিত ভট্চায কি একথা জানতো? জানতো, ওই তালা লাগানো পড়ে থাকা ঘরটার মালিক, নরলোক যাকে দেখতে পায় না বললেই হয়, সে এসে অজিত ভট্চাযের স্ত্রী মলিনা ভট্চাযের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে?

তাই অজিত ভট্চায হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল?

কিন্তু কি দরকার ছিল তোর এসবে?

কি দরকার ছিল ওই মাধব ঘোষের ভাড়াটে হয়েও তোর বউকে কুন্তলবিলাস মাখাবার? কি দরকার ছিল তাকে রুটি কুমড়োর ঘণ্টর বদলে পরোটা ডিমের ডালনা খাওয়াবার? তুই একটা কবরেজের দোকানের 'প্যাকার' মাত্র। তোর বউকে তুই তাঁতের ডুরে পরাবি কিসের জন্যে?

এটাকেই তুই ভালোবাসা ভেবেছিলি?

অথচ তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারতিস এটা ভালোবাসা নয়। মোক্ষম অনিষ্ট করা।

তা তেমন করে তলিয়ে দেখতে ক'জন পারে?

অজিত ভঠ্চায তো কোন্ ছার।

বোধ বুদ্ধি হবে কিসে? ম্যাট্রিকটাও তো পাস করেনি, বার দুই ফেল করে ওই চাকরিটা জুটিয়ে ফেলেছিল।

আর বিয়েটাও করে ফেলেছিল সেইটুকুর ওপরই নির্ভর করে।

মা-বাপ মরা মলিনা দূর সম্পর্কের কাকার বাড়িতে জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ করে মুক্তির জন্যে ছটফটাচ্ছিল, কবরেজের দোকানের প্যাকারও তার কাছে মুক্তিদাতার মূর্তিতেই দেখা দিল। ওকে পেয়েই সুখী হল মলিনা।

আর তাইতেই সে যেন 'সুখী সুখী' হবার অধিকারও পেল।

তা ওকে ওই সুখীর ভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে অজিত ভট্‌চায মনিবের জিনিস না বলে চেয়ে নেবার সহজ পথটা বেছে নিয়েছিল। শেষরক্ষা হল না। মলিনা নামটাকে আছড়ে ভেঙে দিয়ে চলে গেল এক অজানালোকে।

বাসাটা জোটা আশ্চর্যি!

একালে কেউ ভাবতেই পারে না, একদিনে বাসা জোগাড় হয়। কিন্তু রাগের চোটে বোধ করি অনেক অসাধ্যসাধনই হয়।

একে ওকে বলতে বলতে হঠাৎ একজন বলল, 'বাসা আছে একটু দূরে, রোজ এতটা আসা যাওয়া করতে পারবে?'

সুধানাথ বলল, 'না পারলে চলবে কেন? লোকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে।'

'তা পুরনো বাসার কি হল?'

'ঝগড়া হয়ে গেছে।'

শহরতলীর আর এক কোণ!

তা হোক, যতটা দূর বলেছিল তত কিছু নয়। ছোট্ট বাড়ি, সস্তায় তৈরি। বাড়ির গায়ে পলস্তারা পড়েনি জীবনে।

তবু দোতলা!

নীচের তলায় একখানা, দোতলায় একখানা ঘর।

দোতলায় বাড়িওলা আর বাড়িওলা-গিন্নি থাকেন। একতলার ওই ঘরখানি থেকে কিছুটা আয় করেন।

ভাড়া যখন নিতে গিয়েছিল, গিন্নি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বলছ তো বোন আছে সংসারে, তা একখানা ঘরে থাকবে কি করে?'

সুধানাথ বলল, 'বোনই থাকবে, আমি অন্যত্র থাকব, দেখাশোনা করে যাব। এই জন্যেই তো আপনাদের মতো একটি আশ্রয় চাইছি।'

গিন্নি মনে মন বললেন, 'কি জানি, কেমন ধারা বোন!' মুখে বললেন, 'বড়ো বোন?'

'না, ছোটো। পিঠোপিঠি'।

'বিধবা?'

'একরকম বিধবাই। স্বামী নিরুদ্দেশ।'

গিন্নি মনে মনে বলেন, 'স্বামী নিরুদ্দেশ কি তোমরাই নিরুদ্দেশ, তোমরাই জানো। কলিতে কাউকে বিশ্বাস নেই। বোন বললেই বোন।'

মুখে বললেন,—'শ্বশুরবাড়িতে কেউ নেই?'

'থাকলে আর আমার এত জ্বালা!'

'মা বাপ?'

'অনেককাল পাট চুকেছে।'

'বোনের ছেলেমেয়ে আছে?'

'নাঃ! ভাগ্যিস নেই, তাহলে আমি তো মরেই যেতাম।'

'হুঁ! তা তুমি বে-থা করনি?'

'কই আর করতে পেলাম? সামান্য চাকরি, বোনকে পুষতে হয়।'

কর্তাকে জানালেন গিন্নি।

কর্তা বললেন—'মরুক গে। ছেলেটা তো থাকবে না বলছে—'

গাড়িতে আসতে আসতে মলিনা একবার জিগ্যেস করেছিল, 'কী পরিচয় দিলে?'

'বলে দিলাম বোন! ওটাই ভালো। বউদি-টৌদি অনেক ঝামেলা। তবে মুশকিল এই—ছোটো বোন বলে বসে আছি। এখন আপনার তো আমাকে 'দাদা' বলতে হয়।'

'সেটা খুব শক্ত নয়। তুমিই আমাকে 'আপনি' বলে বসবে, এই যা।'

'সেরেছে! ওটা তো মাথায় আসেনি। বুড়ির যা জেরা, বাবাঃ! জেরার মুখে যা মুখে এসেছে বলে দিয়েছি—'

মলিনা শঙ্কিত হয়।

মলিনা মলিন হয়ে যায়।

মলিনা আস্তে বলে, 'খুব জেরা করল?'

'খুব মানে কি? এমনি, মানে মেয়েলি কৌতূহল আর কি! বড়ো বোন না ছোটো বোন, বিধবা না সধবা, কোলে ছেলেমেয়ে আছে কি নেই, শ্বশুরবাড়ির সবাই সরে গেছে কেন? মা বাপই বা হাওয়া হল কবে? আমি কেন বিয়ে করিনি?—এইসব বহুবিধ মূল্যবান প্রশ্ন।'

মলিনা মাথা নীচু করে বলে, 'আমার ভয় করছে।'

'ভয়ের কি আছে?'

'যদি সন্দেহ করে?'

'সন্দেহ অমনি করলেই হল? তবে হ্যাঁ, ওই 'দাদা' আর 'আপনি'র সমস্যাটা! তালগোল না পাকিয়ে যায়।'

'আমার যাবে না তোমার যেতে পারে। এখন থেকে শুরু কর।'

বাসায় যখন ঢুকল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারিদিকে কেমন গ্রাম গ্রাম ভাব, বুনো বুনো গন্ধ বেরোচ্ছে। আর পলস্তারা ছাড়া বাড়িটা ঝোপের আড়ালে যেন ছায়ামূর্তির মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

মাধব ঘোষের বাসায় আর যাই হোক, প্রাণ ছিল। এ যেন মরে পড়ে আছে।

এ কোথায় এনে তুলল সুধানাথ মলিনাকে?

ইচ্ছে হল বলে, 'মনে হচ্ছে কবরে প্রবেশ করছি।'

বলল না।

সাড়া পেয়ে বাড়িওলা গিন্নি নামলেন। বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলেন মলিনাকে। আর দেখে যেন একটু সন্তুষ্টই হলেন। পালিয়ে আসা খারাপ মেয়ের মতো দেখাচ্ছে না। নেহাৎ যেন দুঃখী দুঃখী, বিষণ্ণ বিষণ্ণ। যা বলেছে তাই হবে।

স্নেহপরবশ হয়ে বললেন, 'রাতে কি আর রাঁধতে পারবে? আমি বরং দুটো দানা ফুটিয়ে দিই—'

সুধানাথ বলল, 'পাগল হয়েছেন! আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি খাটতে যাবেন কেন? আমি তো বাইরেই খাই, বোনের একটু মিষ্টি-টিষ্টি খেলেই হয়ে যাবে। এই ইয়ে—'

হঠাৎ থেমে গেল সুধানাথ।

অজিত ভট্‌চাযের স্ত্রীর নাম তো জানে না সে।

গিন্নি অতটা লক্ষ করলেন না।

বললেন, 'তা মেয়ে আমার কাছে খেতে পারত। আমরাও ছোটো জাত নই, তোমাদের মতনই মিত্তির-কায়স্থ।'

দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে উনি চলে যেতেই মলিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়ল। 'মাধব ঘোষের বাসায় তো তবু সব সত্যি ছিল, এ যে আগাগোড়া ছলনা হয়ে গেল। এ কি চালিয়ে যাওয়া সোজা? আমি মলিনা ভট্‌চায—'

সুধানাথ মাথা চুলকে বলে, 'মানে ব্যাপারটা হল কি—আমি তো মিত্তির।'

'বুঝেছি! কিন্তু বরদাস্ত করতে পারছি না, প্রতিপদে মিথ্যে পরিচয়, ধরা পড়ে যাবার ভয়—'

সুধানাথ সহসা ঘোষণা করে, 'ঠিক আছে, দু'চারটে দিন যা হোক করে চালান, অন্য বাড়ি দেখে চলে যাব। সেখানে সব সত্যি কথা বলে ঢুকব।'

মলিনা মুখ তুলল।

মলিনা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলল, 'তাহলে ঢুকতেই দেবে না।'

সুধানাথ চলে গেল।

পথে বেরিয়েই যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল। আর মলিনার মনে হল—ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করল ও।

এইখানে মলিনাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল। একবার ওর অসহায়তার কথা চিন্তাও করল না!

অজিত যেদিন হঠাৎ আর এল না, সেদিনও বুঝি এমন অসহায়তা অনুভব করেনি মলিনা। বারো সংসারের উত্তাপ যেন মলিনাকে ঘিরে রেখেছিল। একঘরে হয়ে পড়ে থেকেও এমন ভয় করেনি।

কিন্তু আর কি-ই বা করার ছিল সুধানাথের? চলে যাওয়া ছাড়া?

এই একটা ঘরের বাসায় সে কোথায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মলিনার ভরসা জোগাত?

দরজায় খিল লাগিয়েছে।

জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখল মলিনা। বোধ করি অমাবস্যার কাছাকাছি কোনো তিথি। তাই আকাশ, মাটি সব অমন নীরন্ধ্র অন্ধকার। ঠিক যেন মলিনার ভবিষ্যৎ।

পৃথিবীর এই অন্ধকারের মুক্তি হবে। আকাশে নতুন সূর্য উঠবে। কিন্তু মলিনার?

তারপর ভাবতে লাগল, মাধব ঘোষের বাসাটা চট করে ছেড়ে আসা কি ঠিক হল?—যদি—সুখদার চোখ নির্ভুল না হয়, যদি অজিত কোনোদিন ফিরে আসে?

যদি আজকালই আসে?

দু'মাস আসেনি বলে যে, দু'মাস পাঁচদিনের দিন আসতে পারে না, তা তো নয়!

এসে দাঁড়িয়ে যদি ওই বারো ঘরের সামনে প্রশ্ন করে, 'মলিনা কোথায়?'

ওরা কে কি উত্তর দেবে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মলিনা। দেখতে পায় দাস গিন্নির, মণ্ডল গিন্নির, নগেন গিন্নির আর সুখদার ঘৃণায় বিকৃত মুখ...

তারপর অজিতের মুখ দেখতে পায়।

কিন্তু এ কি!

অজিতের মুখের একটা কুঞ্চিত পেশীর ভঙ্গি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেন মলিনা? আর সব কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

অজিতের মুখটা কি মলিনা এই দু'মাসেই ভুলে গেল?

এ কি হচ্ছে ভগবান!

সেই ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া বিচ্ছিন্ন মুখ শবদেহটাই অজিত হল না কেন? অজিত কেন ঝাপসা হয়ে গিয়ে মলিনাকে আঙুল তুলে শাসাবে? কেন তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলবে, 'কি গো, তিনটে মাসও পারলে না এই হতভাগার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে?'

সুধানাথের ওপর তীব্র একটা রাগ পাক দিতে লাগল মনের মধ্যে। ও যদি ওপরপড়া হয়ে এত না করতে আসতো, নিশ্চয়ই আর পাঁচজনে দেখত।...হয়তো—বারো ঘরে চাঁদা করে মলিনার মাসকাবারি বাজার তুলে দিত। হয়তো পালা করে এক একজন এক একদিন নিজেদের বাজার থেকে আলুটা বেগুনটা দিত, হয়তো মলিনার সেই দুর্দশা দেখলে মাধব ঘোষ, সত্যিই ভাড়া চাইত না। আর হয়তো ক্রমশ মলিনা রাঁধুনীগিরিতে পাকা হয়ে উঠত।

সমস্ত সম্ভাবনাকে ঘুচিয়ে দিয়েছে ওই সুধানাথ!

ঈশ্বর জানেন ওর কি মতলব! এখন তো ভাইবোন, দাদাদিদি, অনেক ভালো ভালো সম্পর্ক পাতাচ্ছে, পরে কি মূর্তি ধরবে কে জানে! শুনেছি সিনেমায় কাজ করে। আমাকে কারুর কাছে বেচে দেবে না তো? গোড়া থেকেই তাই আমাকে গ্রাস করছে?

মলিনা নিজেই যে গোড়ার দিন এতগুলো চেনা লোককে বাদ দিয়ে ওই সামান্য চেনা ছেলেটাকেই 'আশ্রয়' বলে গণ্য করেছিল, 'ঠাকুরপো' ডেকে অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করেছিল, আর অতগুলো লোকের একজনও অজিতের জন্যে একটা আঙুল নাড়েনি, সুধানাথই সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, এসব ভুলে যায় মলিনা।

মলিনা শুধু সুধানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমিয়ে তুলতে থাকে।...

বলতে থাকে, ওই আমার শনি!

ওই আমার রাহু!

আমার পাঁজরের হাড় খুলে খুলে ছড়িয়ে দিল ও! সেই আমার সাজানো ঘর, সে চলে গিয়েও যেখানে যা অবিকল ছিল, সেই ঘর তছ্‌নছ্‌ করে যেন দস্যুর মতো লুটে নিয়ে এল আমাকে!

নিশ্চয় ধুলো পড়া দিয়েছে ও আমাকে। জানে বোধহয় কিছু। নইলে আমার এমন বুদ্ধি হয়ে গেল কেন!

প্রতিনিয়ত যে সেই সহানুভূতিহীন, নিষ্ঠুর ঠাঁই থেকে পালাবার জন্যে ছটফট করছিল মলিনা, সেকথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ওখানের সকলের জন্যে মন কেমন করছে তার। এমনকি আধা-হাবা, তোৎলা মদনাটার জন্যে পর্যন্ত।

এবারে পুজোয় স্বপনকে সে একটা জামা দেবে ভেবেছিল। পুজোয় বোনাস পায় অজিত। ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারতো মলিনা। স্বপনের মা তাকে ভালোবাসে, স্বপনকে মলিনা ভালোবাসে।

ওদের কাছ থেকে মলিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল সুধানাথ।

নিয়ে না এলেও যে ওসব কিছু হতো না, সেকথা ভাবছে না মলিনা।

অনেক ভেবে, অনেক কেঁদে, শেষ অবধি সংকল্প করল মলিনা, কাল সুধানাথ এলেই বলবে, আমায় সেই পুরনো বাসাতেই রেখে এসো। নিজেই একটা রাঁধুনীগিরি জুটিয়ে নিয়ে চালাব আমি। একটা পেট, এত কি ভাবনা! পরের দয়াই বা নেব কেন বারোমাস? তুমি আমার কে?'

এই সিদ্ধান্তটা করে যেন অনেকটা শান্তি বোধ করল মলিনা। শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙল, হঠাৎ যেন সব ওলট-পালট হয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল।

মরি মরি, এত সুন্দর জায়গা!

আর রাত্রে অত বিভীষিকা দেখছিল মলিনা।

গাছপালা বাগান পুকুরে ঘেরা বাড়িখানা যেন মলিনার দূর শৈশবের পিতৃভূমিকে মনে করিয়ে দিল।

ওই পুকুরটা যে রাত্রে জানলা দিয়ে একটা অন্ধকারের গহ্বর মনে হচ্ছিল, আর ওর ধারের নারকেল গাছগুলোকে এক পায়ে খাড়া দৈত্যের মতো লাগছিল, সে কথা ভেবে হাসি পেল মলিনার।

বাড়িটা ছোট্ট, জমিটা অনেকখানি। সবুজ ঝোপঝাড়ের মাঝে মাঝে গাছ আলো করে ফুটে থাকা জবা, করবী যেন মলিনার জ্বরতপ্ত মনে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিল।

ভাবল, বড়ো সুন্দর জায়গাটি আবিষ্কার করেছে সুধানাথ। এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতাই তো এখন মলিনার কাম্য। অনেকের দৃষ্টির কলুষ সহ্য করবার ক্ষমতা কি তার আর আছে?

থাকার মধ্যে দু'টো বুড়ো বুড়ি।

তাও দোতলায় থাকে।

এক আধবার আসবে। একটু ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে। ভুললে চলবে না, সে সুধানাথ মিত্তিরের বোন।

সুধানাথ এলে আর বলা হল না মলিনার, 'আমাকে পুরনো বাসায় রেখে এস।'

বাগানে বুড়ি শাক তুলছিল, তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ও দাদা, দাদাগো, কী চমৎকার জায়গা খুঁজে বার করেছ। মনে হচ্ছে সেই আমাদের ছোটোবেলার গাঁয়ে এসে পড়েছি।...আহা এমন বাড়িতে তুমি থাকতে পাবে না দাদা!...আর একটা যদি ঘর থাকত!'

সুধানাথ কাছে এসে হেসে বলে, 'এত এরকম 'দাদা দাদা' করলে তো—'তুই' না ডাকলে মানায় না।'

'তা ডাকো! যেটা মানানসই সেটাই কর।'

'এদিকে তো দাদা ছোটো বোনের নাম জানে না।'

'ওমা তাই নাকি? গিন্নিরা তো ডাকতেন শোননি?'

'আমি আর কবে বাড়ি থেকেছি?'

'তা বটে। তা জেনে রাখো, আমার নাম 'মলিনা।'

'মলিনা!'

সুধানাথ নাক কুঁচকে বলে, 'এঃ, মানানসই কোথায়? একেবারে বেমানান! এ নাম অচল।'

'এতদিন চলে এল, আর এখন অচল?'

'হুঁ! পদবী যখন পালটেছে, নামও পালটাক। মলিনা নয়, মণিলা।'

'মণিলা আবার নাম হয়?'

'হওয়ালেই হয়।'

'লাভ কি?'

'মলিনা শুনতে বিচ্ছিরি।'

হঠাৎ কথাটা ভারী অদ্ভুত লাগে মলিনার। তার এই উনত্রিশ বছরর জীবনে একথা তো কেউ কোনোদিন বলেনি! অজিত তো 'মলিনা মলিনা'ই করেছে, কোনোদিন বলেনি 'শুনতে বিচ্ছিরি'।

মলিনাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুধানাথ একটু ভয় পায়। বলে, 'রাগ করলেন?'

মলিনা হেসে ফেলে বলে, '' 'করলেন?' আবার 'আপনি!' তুমিই ফাঁসাবে দেখছি।''

সুধানাথ জিভ কাটে।

তারপর বলে, 'তা হলে রাগ নয়?'

'না রাগ কিসের! তবে নামটা ছোটো করেও নিতে পার। 'লীনা' বলতে হয়'

'লীনা! লীনা! তা মন্দ নয়।'

বাড়িওলা-গিন্নি চারটি শাক এনে ধরেন, 'মেয়ে শাক খাওতো?'

'ওমা খাব না কেন? শাক ভাতই তো সম্বল মাসিমা।'

'আহা ষাট! এয়োস্ত্রী-মানুষ! তা নামটি কি গো?'

'লীনা।'

'লীনা? তা ওসব শক্ত নাম আমার মুখে আসবে না, লীলাই বলব! ভাই খাবে তো তোমার কাছে?'

'কোথা?' মলিনা বলে, 'ওতো এক্ষুনি চলে যাবে। দেখুন না, এমন কাজ, খাবার সময় নেই। শুধু নিজের জন্যে রাঁধতে ভালো লাগে?'

'তা তো সত্যি।' বলে চলে যান গিন্নি শাকগুলি নামিয়ে রেখে।

মলিনা মৃদু হেসে বলে, 'আর একবার নাম পালটালো।'

'জীবনটাই তো ওলট-পালট।'

'গিন্নি আমায় একটু কম ভালোবাসলে হয়। কিন্তু মনে হচ্ছে বড্ড বেশি ভালোবাসেন।'

'সেটা বোধহয় আপ্—থুড়ি, তোমার স্বভাবের গুণ।'

স্বভাবের গুণ!

মলিনার স্বভাবে কোনো গুণ আছে, একথাই বা কে কবে বলেছে? সবাই তো মলিনার মেজাজের নিন্দেই করে। অজিত তো ফি হাত বলতো, 'রণচণ্ডী!' বলতো 'বাবাঃ আগুনের খনি!'

মলিনার সে স্বভাবের যে পরিবর্তন হয়েছে, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় মলিনা গুঁড়ো হয়ে গেছে, এ মলিনা নিজে টের পায় না।

আর এও জানতে পারে না ওই সুধানাথই মলিনাকে 'উঁচু নাকী' বলে অভিহিত করত।

রোজ সকালে একবার করে আসে সুধানাথ। কি আছে নেই দেখতে।

অভিনয় চলে। 'লীনা, তুই' বলে হেঁকে হেঁকে কথা বলে। বলে, 'কী রাঁধছিস, কি? শুধু আলুসেদ্ধ ভাত? কেন, মরতে হবে না কি? তবে তিলে তিলে আর কষ্ট করা কেন? গলায় এক গাছ দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়!'

গলা তুলে বলে, আর গলা নামিয়ে হাসে।

সেই নামানো গলায় বলে, 'এর চেয়ে সিনেমা থিয়েটারে নেমে পড়লে আখের গুছিয়ে নেওয়া যেত। তার চাইতে তো কম করছি না।'

করছে না!

সত্যিই কিছু কম করছে না। দুজনেই!

সুধানাথ চলে যাবার মুখে মলিনা হেঁকে হেঁকে বলে, 'ও দাদা, তা এক বাটি খেয়ে যাও অন্তত। রোজ অমনি মুখে চলে যাও।'

সুধানাথ আরও হেঁকে, যাতে দোতলার ঘর ভেদ করে কণ্ঠস্বরটা পৌঁছয় সেইভাবে বলে, 'আজ আর নয়, কাল। কাল চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভেজে রাখিস!'

এমন যে পারবে তারা, এ একেবারে ধারণাই ছিল না। এ যেন এক মজার খেলা! সত্যিই যেন অভিনয়ে নেমে পার্ট প্লে করছে দু'জনে। যত করে তত পুলকিত হয়, তত কথার জোগান আসে, তত হাসিতে ঔজ্জ্বল্য আর ভঙ্গিতে সাবলীলতা আসে।

তবু পণ্ড হল।

তবু শেষ রক্ষা হল না!

প্রথমে মাঝে মাঝে তাল ভঙ্গ।

গিন্নি বলেন, 'হ্যাঁ গা লীলা, তুমি যে বলেছিলে এখানে আসার আগে শিবপুর থাকতে, আর তোমর ভাই ওনার কাছে বলল, 'গড়ে'য় না কোথায় থাকত?'

মলিনা যদিও চটপট বলে, 'গড়ে'য় আর ক'দিন থেকেছি মাসিমা! কুল্লে একটা মাস। ভাড়া বেশি বলে ছাড়তে হল—।' তবু মলিনার হঠাৎ শুকনো হয়ে আসা মুখটা ক্ষীণদৃষ্টি বুড়িরও নজর এড়ায় না।

আবার একদিন ধরেন, 'হ্যাঁ গা লীলা, তোমাদের ভাই বোনের কথার মিল নেই কেন বল তো? তুমি বললে তোমাদের দেশ নবদ্বীপের কাছে পাটুলী, আর ও বলল, মুর্শিদাবাদ। এমন উল্টোপাল্টা কথা আমরা পছন্দ করি না।'

মলিনা কষ্টে হেসে বলে, 'বিয়ে হওয়া মেয়ের দেশটা যে আর বাপ ভাইয়ের দেশ থাকে না, সে কথাও কি ভুলে গেলেন মাসিমা?'

তবু বুড়ি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, 'তুমি তো পাটুলীতে তোমার ছেলেবেলার খেলার গল্প করলে—।'

মলিনা তবু বাঁধ দেবার চেষ্টা করে।

মলিনা তবু হাসে, 'তা মাসিমা ছেলেবেলা ছাড়া আর কি! বারো বছরে পড়তেই বিয়ে, খেলারই তো বয়েস!'

কিন্তু এই ঝুরো বালির বাঁধে কত দিন আটকানো যায়?

ধরা পড়ল। অনেক জেরার মুখে জোগাবার মতো বালি আর কুলোল না। বরং ভাঙন ধরলো আর এক ঘটনায়।

মাধব ঘোষের বাসার নগেনবাবু ক'দিন খুঁজে খুঁজে এ বাসায় এসে লীনার অজান্তে বাড়িওলার সঙ্গে আলাপ করে গেলেন।

তারপর গিন্নি ধরলেন সাট্টে পাট্টে।

প্রথমে ভালোমানুষী করে জিগ্যেসবাদ, ক্রমশ জেরা, অতঃপর উগ্রমূর্তি।

বললেন, 'দু'দিন হলে, তিন দিন করবে না, আমার বাড়ি ছেড়ে দেবে। এত বড়ো পাহাড় মেয়েমানুষ তুমি, সোয়ামি রেলে কাটা পড়ল, সে কথা উড়িয়ে দিয়ে দু'দিন না যেতেই একটা পরপুরুষের সঙ্গে ভেগে এলে, আবার ভাই-বোন পরিচয়! ভাই-বোন সম্পর্কয় কলঙ্ক ধরানো! ছিঃ ছিঃ! তুমি বামুনের মেয়ে না? তোমার বরের নাম অজিত ভঠ্চায্যি ছিল না? ও ছোঁড়া কায়েৎ না?'

এরপর আর কি দিয়ে বাঁধ দেবে মলিনা।

সুধানাথ এলে বাড়ির কর্তা হাল ধরলেন। বললেন, 'এই দণ্ডে পার, এই দণ্ডে! আমার এই ধর্মের বাড়িতে এত অনাচার!' এমন ইসারাও দিলেন, সুধানাথ লোক দেখিয়ে সকালে এসে চলে যায়, তারপর কে জানে রাতের অন্ধকারে আসা-যাওয়া করে কিনা।

মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসতে হল সেই বাগান পুকুর ঘেরা স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয় থেকে।

'আমাকে তুমি ছাড়', বলল মলিনা। 'আবার আমায় ঘাড়ে করে করে বেড়াবে, আর কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলবে। এ কেন? কি দায় তোমার?'

'কি দায় আমার, বাঃ!' সুধানাথ তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'এ কথার কোনো মানে হয়? হঠাৎ তোমাকে ছাড়ব কিভাবে? গড়ের মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসব?'

'সে যাই হোক', মলিনা উত্তেজিত হয়, 'আমার জন্যে তুমি 'মিনারের' চাকরি ছাড়বে, বেলেঘাটায় বাস করতে যাবে, এর কোনো মানে হয় না। কেন তুমি এত করবে আমার জন্যে?'

হঠাৎ সুধানাথের মুখের চেহারা কেমন একরকম হয়ে যায়। সুধানাথের চোখের দৃষ্টিতে কিসের যেন ছায়া পড়ে। সুধানাথ আস্তে বলে, 'সব কথা কি খুলে বলা যায়?'

মলিনা মাথা নীচু করে।

মলিনার সিঁথির কালচে হয়ে যাওয়া অতীতের সিঁদুরের অস্পষ্ট রেখাটায় যেন সিঁথিটাকে ক্লেদাক্ত মনে হয়। মলিনা তারপর মুখ তুলে বলে, 'কিন্তু আমি এত দয়া নেব কেন?'

'না হয় মনে করো, আমায় দয়া করছ।'

সত্যিই 'মিনারের' চাকরি ছাড়ল সুধানাথ।

শেয়ালদা অঞ্চলে একটা কাটা কাপড়ের দোকানে কাজ জোগাড় করে ফেলল, আর বেলেঘাটায় একটা বাসা ভাড়া করল।

এ বাসায় বাড়িওলা নিজে নেই।

আর একঘর ভাড়াটে আছে—মাত্র স্বামী-স্ত্রী। তাও নেহাত যেন বোকাসোকা মতো। সুধানাথ বলল, 'এই বেশ। চালাক পড়শী আগুনের সমতুল্য।'

কিন্তু এ খেয়াল ছিল না সুধানাথের, বোকার লেজের আগুনেই লঙ্কাকাণ্ড বাধে।

প্রথম দর্শনেই সেই বউ বলে বসল, 'এই বেশ হল ভাই, আমরাও বরটি বউটি, তোমরাও বরটি বউটি। আমারও ছেলেপুলের বালাই নেই, তোমারও—'

মলিনা তাড়াতাড়ি বলল, 'কি বাজে বাজে কথা বলছ? ও আমার দাদা।'

'দাদা!'

বউটা যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। শুকনো মুখে বলল, 'দাদা আর বোন? এই সংসার?'

'দাদা তো থাকবে না, অন্য জায়গায় খাবে শোবে। আমার জন্যেই—'

'শুধু তোমার জন্যে? তা তোমার স্বামী?'

'স্বামী দেশে থাকেন। পাগল!'

'ওমা! সেই পাগল স্বামীর সেবা যত্ন ছেড়ে তুমি ভাইয়ের ভাতে কলকেতায় বাসা ভাড়া করে থাকতে এসেছ?'

মলিনা অনেক সয়েছে।

মলিনা অনেক বদলেছে।

তবু মলিনা মানুষ তো! মেয়ে মানুষ! আর কত সইবে? তাই বিরক্ত স্বরে বলে, 'আমি কি করতে এসেছি না এসেছি, সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? আমি তো তোমার সংসারে ঢুকতে আসিনি!'

বউটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'বলছ তো ঢুকতে আসিনি। আসতে কতক্ষণ? এই তুমি একা সুন্দরী যুবতী, মাথার ওপর না শাশুড়ি ননদ, না স্বামী, দাদা পর্যন্ত থাকবে না বলছ। যার নাম একেবারে বেওয়ারিশ! আমার বরকে আমি সামলাব কি করে? সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখলে ওর আর জ্ঞানগম্যি থাকে না!'

মলিনা হাসবে না কাঁদবে? ডাকছেড়ে কাঁদতেই তো ইচ্ছে করছে, তবু মলিনা হেসেই বলে, 'তোমার স্বামীর সামনে আমি না বেরোলেই তো হল?'

সে বেচারি এ আশ্বাসে কোনো ভরসা পায় না। চোখের জল ঠেকাতে ঠেকাতে বলে 'এক বাড়ি, এক ঘর, ওকি আর একটা কাজের কথা? তুমি না বেরালেও, ও তো ঘুরঘুরিয়ে বেড়াবে। সঙ্গে তোমরা একটা দুঁদে বর থাকত, আমি নিশ্চিন্দি থাকতাম। এ যদি রাতবিরেতে উঠে গিয়ে—'

শেষ পর্যন্ত আর শোনার ধৈর্য হয় না মলিনার, নিজেই উঠে যায়।

কিন্তু চিন্তায় পড়ে।

এ বাড়িতে কি থাকা সম্ভব হবে?

সুধানাথকে বলতে লজ্জা করে, অথচ অস্বস্তিরও শেষ থাকে না।

সত্যিই, বেচারি বউটির জ্ঞানগম্যি-হীন বর ছুতোয়নাতায় মলিনার ধারে কাছে ঘুরঘুর করে, মলিনার জানলায় উঁকি মারে, স্নানের ঘরের ঘুলগুলিতে চোখ ফেলে বসে থাকে।

সাপের কামড় এক কোপ্!

কাঠপিঁপড়ের কামড় অসহ্য!

সুধানাথকে না বলে পারা যায় না। আর শোনামাত্র শান্ত সুধানাথের ভিতর থেকে এক দুর্দান্ত গোঁয়ার মূর্তি বেরিয়ে আসে।

যে মূর্তি ছুটে গিয়ে অপরাধীর ঘাড় চেপে ধরে।

বলা বাহুল্য, পরবর্তী ঘটনা এক কুৎসিত কেলেঙ্কারির রূপ নেয়। পতির বিপদাশঙ্কায় পতিব্রতা সতী পরিত্রাহী চিৎকারে পাড়ার লোক জড় করে, এবং 'সত্য' নামক দেবতার মাথায় লাঠি বসিয়ে সক্রন্দনে বলতে থাকে, 'ওগো এতদিন সয়ে সয়ে আছি, তোমাদের বলিনি। ওই একটা নষ্ট মেয়েমানুষ পাগল স্বামীকে দেশে ফেলে রেখে পাতানো দাদার সঙ্গে চলে এসে বসে আছে, আর আমার ভালোমানুষ স্বামীকে নষ্ট করবার তালে নিত্যদিন হাসছে, ইসারা করছে, ডাকাডাকি করছে। তা চোরের সাতদিন, সাধুর একদিন! আজ ওর ওই ভাই না ভালোবাসার লোক কে, তাঁর সামনে ধরা পড়ে গেছে। এখন ও এসেছে আমার স্বামীকে খুন করতে—'

স্বামীকে বাঁচাতে এমন বহুবিধ কথা বলে চলে সে। এবং দেখা যায় পাড়ার লোক তার প্রতিই সহানুভূতিশীল।

না হবেই বা কেন? একটা নষ্ট দুষ্ট মেয়ের প্রতি কার সহানুভূতি থাকে?

আর একা একটা বাসা ভাড়া করে থাকে কোনো শিষ্ট সভ্য মেয়ে?

অতএব ধরে নিতে হচ্ছে এ বাসাও গেল।

সুধানাথ হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আচ্ছা এরকম কেন হচ্ছে বল তো?'

মলিনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'অলক্ষ্মী কিনলে এই রকমই দশা হয়। দেখছ না আমি বিষকন্যে! তোমায় দোহাই দিচ্ছি, তুমি আমায় ছাড়।'

সুধানাথ একমিনিট চুপ করে চেয়ে থেকে বলে, 'বেশ, ধর ছাড়লাম। এই চলে গেলাম আর এলাম না। তারপর?'

'যা করবেন ভগবান। যা আছে কপালে।'

'কথাটা বলতে সোজা, ব্যাপারটা সোজা নয়। এমনও তো মনে করতে পার, ভগবান আমার মধ্যে দিয়েই তোমাকে দেখছেন। সব মানুষের মধ্যেই তিনি আছেন, একথা মান তো?'

'মানতে পাচ্ছি কই? মনে হচ্ছে 'ভগবান' বলে কোথাও কেউ নেই।'

সুধানাথ আস্তে বলে, 'এখুনি অতটা বিশ্বাস হারাবে কেন? মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, সুবিধে-অসুবিধে তো আছেই—আসবেই।'

'আমার জীবনটা কি অন্য কোনো মানুষের মতো?'

'বল কি? তুমি ক'টা জীবন দেখেছ? আরও কত বিপর্যয় আসে জীবনে!'

'দাদা' বলতে বাধ্য হওয়া থেকেই তুমিটা রপ্ত করতে হয়েছে সুধানাথকে। অতএব কেমন করেই যেন মলিনার পোস্টটা ছোটোর মতোই হয়ে গেছে। সুধানাথ ওকে বুঝ দেয়, সান্ত্বনা দেয়, কখনও কখনও ধমকও দেয়।

সেদিন দিল ধমক।

যেদিন সুধানাথ আবার এসে একটা নতুন বাসার খোঁজ দেওয়ায় মলিনা বলে উঠল, 'যতই তুমি বল ভগবান মানুষের মধ্যে দিয়েই দেখেন, তবু আমি তোমায় হাত জোড় করছি, আমার চিন্তা ছাড়ো।'

সেদিন ধমকে উঠল সুধানাথ।

বলল, 'এই এক বাতিক হয়েছে দেখছি তোমার। তোমাকেই হাত জোড় করছি, ওই কথাটা বলা তুমি ছাড়ো। আশ্চর্য! চিন্তা করব না? কোনো মানে হয় কথাটার?'

সুধানাথের মনে হয়েছিল মলিনার কথার মানে হয় না। তাই সুধানাথের হিসেবে যে কাজের মানে আছে, তাই করেছিল সুধানাথ উঠেপড়ে লেগে। কাজকর্ম কামাই দিয়ে বাড়ি খুঁজেছিল।

আর সাধনায় সিদ্ধি ঘটেছিল তার।

অথবা অসাধ্য সাধনের একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সে।

তা কলকাতা শহরে নিত্য এক একটা বাসা খুঁজে ঠিক করে ফেলা অসাধ্য সাধন ছাড়া আর কি।

মলিনা বলে, 'আবার হয়তো সেখান থেকে দূরদূর করে খেদিয়ে দেবে।'

সুধানাথ বলে, 'পরের কথা পরে আছে, এখন যে আজই এদের মুখের সামনে দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে যেতে পারব, তাই ভেবেই স্ফূর্তি লাগছে আমার।'

'তা এই স্ফূর্তিটির জন্যে কতটি দাম দিতে হল?'

কথাটা সুধানাথ বুঝতে পারলো না, অথবা না বোঝার ভান করল। তাই ভুরু কুঁচকে বলল, 'দাম মানে?'

'মানে? আমি একেবারে সোজা মানেটার কথাই জিগ্যেস করছি। ভাড়া কত দিতে হবে?'

'সে খোঁজে তোমার দরকার কি?'

'দরকার আছে।' মলিনা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'এই অলক্ষ্মীর জন্যে কতটা দণ্ড দিতে হচ্ছে তোমায়, জেনে রাখতে চাইছি।'

'লাভ কি জেনে?'

হঠাৎ মলিনা আর এক দৃষ্টিতে তাকায়। খুব আস্তে বলে, 'জানতে পারলে নিজের দামটাও যাচাই হয়ে যেত!'

সুধানাথ এ দৃষ্টির সামনে মুহূর্তকাল চোখ নামায়, তারপরই খুব খোলা গলায় বলে ওঠে, 'শুধু ওইটুকু থেকেই আপনি সেই দামটা যাচাই করবেন? আচ্ছা মেয়ে তো? নিন সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিন। আমি একটা 'ঠেলা' নিয়ে আসি।'

অনেকদিন পরে আবার আজ হঠাৎ 'আপনি' বলে।

সুধানাথ চলে যায়।

মলিনা তার সেই ক'দিনের 'ঘরের' দিকে তাকিয়ে দেখে।

গুছিয়ে নিতে হবে।

এই জঞ্জালগুলো আবার গুছিয়ে নিতে হবে তাকে?

এই বঁটি কাঁটারি, শিল নোড়া, ঝুড়ি কুলো, বাসন উনুন।

কেন?

কী দরকার এসবের?

খেতে হবে?

সে তো ওই একটা অ্যালুমিনিয়মের বাটিতেই হয়ে যাচ্ছে সারা। ভাতে ভাত ছাড়া তো আর কিছু রাঁধেনি কোনোদিন তারপর থেকে।

শুধু একটা খাবার থালা আর ওইটা নিলেই তো চুকে যায়, আর সব থাক না পড়ে। বাড়িওলা টান মেরে ফেলে দেবে।

আশ্চর্য! এই জঞ্জালগুলোই একদা প্রাণতুল্য ছিল মলিনার।

আর কত চেষ্টায়, কত আগ্রহেই না সংগ্রহ করেছে এসব! অজিত বলত, 'কি হবে এত সবে? যত আসবাব বাড়াবে, তত খাটুনী বাড়বে।'

মলিনা ঝঙ্কার দিত।

মলিনা বলত, 'তা বাড়ুক। তাই বলে বেদের টোলের মতোন সংসার হবে না কি? খাটুনী কমিয়ে আমি আর কোন মহৎ কর্ম করব শুনি?'

অজিত জানত, এ ধরনের কথাবার্তার পরই একটি অশ্রুবর্ষণের পালা এসে পড়তে পারে। কারণ মলিনার যে আর পাঁচটা মেয়ের মতো 'আসল' কর্মটাই নেই, সেই অভাবটা উথলে ওঠে মলিনার এসব প্রসঙ্গে।

অতএব অজিত তাড়াতাড়ি বলত, 'থাকবে না কেন? পতিদেবতার পিঠটা একটু চুলকে দাও দিকি ভালোবাসা মাখিয়ে মাখিয়ে। ওর বড়ো মহৎ কর্ম আর কিছু নেই।'

মলিনা বলত, 'আহা রে! কী একেবারে মহৎ কর্মের হিসেব নিয়ে এলেন! নারকেল কোরবার কুরুণী একখানা চাই আমার।'

একটা মানুষের অভাবে যে সমস্ত জিনিসগুলো এমন মূল্যহীন হয়ে যায় জানা ছিল না মলিনার।

আজ তাই অবাক হয়ে যাচ্ছে।

ভাবছে, আচ্ছা এত জঞ্জাল কেন জমিয়েছিলাম আমি?

এই তুচ্ছ জিনিসগুলোর জন্যে কত সময় কত উত্যক্ত করেছি মানুষটাকে!

কিন্তু—হঠাৎ যেন চমকে ওঠে মলিনা। যেন হঠাৎ একটা অনাবিষ্কৃত দেশ দেখতে পায়।

আচ্ছা, ওকে আমি তেমন করে ভাবি কই?

ও কেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে?

আমি স্বপনকে ভাবি, স্বপনের মাকে ভাবি, দাস গিন্নি, মণ্ডল গিন্নি, সবাইয়ের কথাই ভাবি, এমনকি মাঝে মাঝে সুখদার কথাও ভাবি, অতএব ওকেও ভাবি।

তার বেশি নয়।

তবে কি আমি সত্যিই খারাপ? আমার মতো মেয়েকেই অসতী বলে?

একটা জিনিসও গোছায় না মলিনা, চুপ করে বসে থাকে।

একটু পরে সুধানাথ এসে পড়ে ঠেলা নিয়ে।

অবাক হয়ে বলে, 'এ কি গোছাওনি কিছু?'

'না!'

'না কেন বল তো? এরা কিছু বলেছে নাকি?'

'না, ওরা আবার কি বলবে?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই গুছিয়ে নিচ্ছি।'

তারপর—

সুধানাথ যখন হাত লাগিয়েছে, তখন আর কিছু ভাববার নেই।

সব করবে, গাড়ি ডেকে আনবে, মলিনাকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

'পূর্বজন্মের কত শত্রু ছিলাম আমি তোমার!' বলে মলিনা।

সুধানাথ হাসে, 'পূর্বজন্মের কেন, এজন্মেরই।'

'তাও মিথ্যে নয়। শুধু শত্রু কেন, শনি, রাহু সব।'

গাড়িতে চলতে চলতে কথা হয় ভবিষ্যৎহীন ভবিষ্যতের।

মানিকতলার সরু এক গলির মধ্যে বাসাটা। কিন্তু মুশকিল এই, দু'খানা ঘরের আস্ত একটা বাড়ি। ভাড়া তো বেশি-ই কিন্তু সেজন্যও নয়, একা কি করে থাকবে মলিনা, সেইটাই বলে সুধানাথ।

মলিনা তীব্রস্বরে বলে, 'তবু তোমার লোক-সঙ্গের সাধ?'

সুধানাথ অপ্রতিভ হয়।

দু'কানে হাত দিয়ে বলে, 'সাধ কিছুমাত্র নেই। লোকের নামে দু'কান মলি। তবু তুমি একেবারে একা—'

মলিনা গম্ভীরভাবে বলে, 'একেবারে একা কেন? বলছ তো দু'খানা ঘর। তুমি তোমার শেয়ালদার দোকানের বাস উঠিয়ে চলে এস। একত্রে রাঁধাবাড়ায় খরচেরও সাশ্রয় হবে।'

সুধানাথ স্তব্ধ হয়ে যায়।

সুধানাথ পাথরের পুতুল বনে যায়। তারপর সুধানাথ নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা?' মলিনা শান্ত গলায় বলে, 'না ঠাট্টা করছি না, সত্যিই বলছি।'

'এটা কি সত্যি করে বলবার কথা?'

'কেন? অসম্ভবই বা কিসে? সাহস নেই?'

সুধানাথ উঠে দাঁড়ায়।

চঞ্চলভাবে পায়চারি করতে করতে বলে, 'এত তাড়াতাড়ি তোমার এই জিগ্যেসের উত্তর দিতে পারছি না।'

'বেশ, একা রাত ভাবতে সময় নাও।'

'আগুন নিয়ে খেলতে তোমার সাহস হয়?'

মলিনা অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলে, 'সর্ব্বস্ব যার পুড়েই গেছে, তার আবার আগুন নিয়ে খেলার ভয় কি?'

'লোকে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছে, সে আলাদা কথা। কিন্তু—'

মলিনা তেমনি করেই হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু আর কি? তখন না হয় লোকে সত্যি বদনাম দেবে।'

সুধানাথ উত্তেজিত গলায় বলে, 'তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছ?'

'তোমায় নয়, আমায়। খোলা তরোয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটেই দেখি না একবার। পরীক্ষা হয়ে যাক সতী, কি অসতী!'

সুধানাথ বসে পড়ে।

অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে বসে থেকে বলে, 'বেশ! তোমার যা ইচ্ছে।'

'আর এই শোনো'—মলিনা হেসে উঠে বলে, 'বাড়িওলাকে বলতে যেও না—ভাই বোন।'

সুধানাথ অবোধের মতো ওর কথাটাই আবৃত্তি করে, 'বলতে যাব না ভাইবোন?'

'না! ওইখানেই যত গণ্ডগোল! যা সচরাচর হয় না, তাই হতে দেখলেই একশো দিকে একশো চোখ কটমটিয়ে ওঠে।'

'তবে কি বলব?'

মলিনা নিতান্ত সহজ সুরে, যেন কিছু নয়, এইভাবে বলে, 'কিছু বলবে না, লোকের যা ইচ্ছে ভাবুক। যা স্বাভাবিক, তা ভাবলে কেউ কটমটিয়ে তাকাবে না।'

সুধানাথ আর একবার ছিটকে দাঁড়িয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'কী করেছি আমি তোমার? কী অন্যায় ব্যবহার দেখেছ আমার কাছ থেকে, তাই এইভাবে জুতো মারছ আমায়?'

'এই দেখ—'

মলিনা আস্তে এগিয়ে আসে। ওর একটা হাত ধরে বলে, 'রেগে অস্থির হচ্ছ কেন? আমি কি তোমায় অপমান করছি? যারা আজ অকারণে রাতদিন অপমান করছে, তাদের মুখের মতো উত্তর দিতে চাইছি। দু'টো মানুষ যদি বাসা খুঁজে বেড়ায়, ও ছাড়া আর কোনো কিছু ভাবতে পারে না লোকে! ব্যতিক্রম দেখলেই ছুরি শানায়, ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে, তাই ভাবছি, এই অবধি থিয়েটারই তো করা হচ্ছে, এখন আর একটা নতুন পার্ট প্লে করি। দেখা যাক, কেমন উৎরোই।'

তা প্রথম ধাক্কাটা উৎরোলো বৈকি।

বলতে গেলে ভালোভাবেই উৎরোলো।

বাড়িওয়ালা অবশ্য ভাড়াটাদের সঙ্গে এক বাড়িতে নয়, তবে কাছেই তাঁর বড়ো দোতলা বাড়ি। এই অঞ্চলে ছোটোখাটো ভাড়াটে বাড়ি তাঁর বেশ খানকতক আছে। অতএব ব্যবস্থাও আছে।

বেকার ভাইপো আছে একটা, সে ভাড়াটেদের দেখাশোনা করে। এদের আসার সাড়া পেয়েই বাড়ির চাবি নিয়ে চলে এল। আকর্ণ হাস্যে বলল, 'যেমন বলেছিলেন, সক্কালবেলাই ঘর-দোর ধুইয়ে রেখেছি। রান্নাঘরে আপনার গিয়ে পাতা-উনুনও আছে, তাক আলমারি, খুব সুবিধের ব্যবস্থা।'

ওকে ভাগাবার তালে সুধানাথ তাড়াতাড়ি বলে, 'হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাক, করিয়ে রেখে অনেক উপকার করেছেন। আচ্ছা তাহলে—'

এখন স্পষ্ট 'বিদায় হও' শুনেও নড়ে না ছোকরা। তেমনি হাস্যরঞ্জিত মুখে প্রশ্ন করে, 'শুধু এই দু'জন? বাচ্চা-কাচ্চা নেই বুঝি?'

'না।'

'তা ভালো! খুব ভালো! আমার জ্যাঠামশাই আপনাদের খুব নেক্ নজরে দেখবে। বাচ্চা-কাচ্চা দু'চক্ষে দেখতে পারে না কি না! বলে একজোড়া করে পাখি আসবে, তার সঙ্গে একপাল করে ছানা। তার ওপর থাকতে থাকতে আবার ডিম পাড়বে।'

মলিনা এসেই একটা জানলার ধাপের উপর বসে পড়েছিল। ঘরের মেঝেয় তখনও সকালের ঘর ধোওয়া জল গড়াচ্ছিল, তাই পা-টা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল।

ছেলেটার সঙ্গে কথা কয়নি গোড়ায়। এখন কথা বলে ওঠে, 'ওঁর বুঝি নিজের ছেলেমেয়ে নেই?'

'নাঃ। তাতেই তো বাচ্চা অসহ্য। যে ভাড়াটে পাঁচটা কুচোকাচা নিয়ে আসে, তাদের ছুতো-নাতা করে উঠিয়ে ছাড়েন। আপনাদের সে ভয় নেই।'

ছোকরা যে ঘরভেদী বিভীষণ, তা বোঝা যাচ্ছে। যার খায় তার চাল কাটে। তবে নীরেট বোকা।

মলিনা একটু নিশ্চিন্ত হয়।

বলে 'তোমার জ্যাঠামশাইকে বোলো, বাসা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই থাকবে। দু'জনেই আমরা পরিষ্কার মানুষ।'

'হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা আবার আসব। যা সুবিধে অসুবিধে হয় জানাবেন।'

'না না, অসুবিধের কি আছে?' সুধানাথ বলে ওঠে।

মলিনা হঠাৎ একটু হেসে ওঠে, 'তোমার আবার সুবিধে অসুবিধে! সংসারের কিসে কি হয় জানো তুমি? ও ভাই, তোমাদের গোয়ালা আসে তো? আমার তো একটু দুধ চাই। অবিশ্যি বেশি নয়, পোয়াটাক, চায়ের জন্যে।'

'পাঠিয়ে দেব, গয়লা পাঠিয়ে দেব—'

ছেলেটা বলে, 'বাসন মাজা ঝিও তো চাই আপনার?'

'বাসন মাজা ঝি?' মলিনা হেসে ওঠে, 'না ভাই, ওসব বাবুয়ানীতে দরকার নেই। আমিই ওনার রাঁধুনী, বাসনমাজুনী, ঘরগুছানি সব।'

এবার সুধানাথ বলে ওঠে, 'তা বাসনটা মাজবার জন্যে একটা—এই শুনুন, আমাদের তো এই দেখছেন সামান্য বাসন, তিন-চার টাকায় পাওয়া যায় না কাউকে?'

'তিন-চার টাকা!' ছেলেটা মাথা নাড়ে, 'পাঁচ টাকার কমে রাজী হবে বলে মনে হয় না। আমাদেরই লোক, বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়ায়। তাই করে মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে।'

আরও খানিক বকবক করে চলে যায় ছেলেটা।

সুধানাথ বলে, 'যে প্যাটার্নের ছেলে দেখছি, যখন তখন এসে হানা দেবে মনে হয়।'

মলিনা অদ্ভুত একটু হেসে বলে, 'তাতে আর ভয়টা কি? পার্টটা কেমন প্লে করা গেল? নিখুঁত হয়নি?'

তা অভিনয় ক্ষমতা বোধ করি মানুষের সহজাত। তাই সহজ সুস্থ একটা মানুষ পাগলের পার্ট প্লে করেও কাটিয়ে দেয় ছ'মাস আট মাস। হাতে পয়সার বালাই নেই, তবু খাওয়াও জুটে যাচ্ছে, চেয়ে চিন্তে জুটে যাচ্ছে।

উলঙ্গ পাগল নয় যে, ধরে পুলিশে দেবে,—উন্মাদ পাগল নয় যে, ধরে কেউ ঠেঙাবে। এ হচ্ছে মজার পাগল!

কথার পাগল!

তাই আদর আছে লোকের কাছে।

সুস্থ লোকের কাছে পাগল বড়ো আকর্ষণীয় জীব। পাগলের মগজটা যেন একটা অজানা রত্নখনি, সেখান থেকে আহরণ করে তুলে নেওয়া যায় মণিমাণিক্য।

তাই পাগলের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা কয় লোকে, কুরে কুরে প্রশ্ন করে, খাওয়ার লোভ দেখিয়ে দীর্ঘ সময় বসিয়ে রেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে, তার তারপর ক্ষেপিয়ে মজা দেখে।

এ সবই নাকি সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ!

এইসব সুস্থদের কাছে পাগলের আদর আছে।

তা লোকটা এদের বিপরীতে ভালোই অভিনয় করে চলেছে। মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ অনেক জায়গায় ছিটকে ছিটকে বেড়িয়ে, আশ্রয় নিয়ছে কাশীতে।

আর কাশীটা রীতিমতো ভালোই লেগে গেছে। তাই থেকে গেছে। ভাবে, এই বা এমন কি মন্দ পেশা? লোকে নাচ দেখায়, থিয়েটার দেখায়, ম্যাজিক দেখায়, ভাঁড়ামি দেখায়, আমি না হয় পাগলামি দেখাই। ওসবেও পয়সা দেয় লোকে, এতেও দিচ্ছে। দোষ কি?

কিন্তু কবে থেকে ওর এই অভিনয়ের শুরু?

তা জানতে হলে ওই মাস আষ্টেক পিছনে সরে যেতে হয়।

যখন নাকি লোকটা আস্ত এটা মানুষ ছিল, বউ ছিল তার, বাসা ছিল।

বউ তার জন্যে পরিপাটি করে রেঁধে রাখত,—আর নিজে পরিপাটি হয়ে বসে থাকত, ও যখন ঘরে ফিরত, ওকে মনে হতো সম্রাট।

এই সম্রাটের জীবনেই হয়তো জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো লোকটা, যেমন আরও হাজার হাজার লোক দিচ্ছে। অসাধুতা করছে, অজ্ঞতা করছে বলে কে আর সাম্রাজ্য হারাচ্ছে?

হারজিত শুধু ধরা পড়ায়, আর না পড়ায়।

লোকটা ধরা পড়ে গিয়েছিল।

আর বড়ো মোক্ষমই ধরা পড়েছিল।

একেবারে সরাসরি মালিকের সামনে।

কাছার খুঁটে হোমিওপ্যাথি শিশিতে 'কুন্তলবিলাস' বেঁধে নিয়ে সরে পড়া নয়, খদ্দেরের কাছে মকরধ্বজের পুরিয়া পাচার করছিল।

খদ্দেরকে বিদায় করে সিঁদুর আর মিহি ইটের গুঁড়ো মিশিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করছিল, অসময়ে এসে পড়লেন মনিব।

জেরার চোটে বেরিয়ে গেল সব।

অনেকদিন ধরেই এ ব্যবসা চলছিল।

সালসার বোতলে আধাআধি চিরেতার জল, 'বজ্রচূর্ণ মাজনে' স্রেফ ঘুঁটের ছাই, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে গেল। ওই খদ্দেরটিই এসব বুদ্ধি দিয়েছে অজিতকে, হাতে ধরে শিখিয়েওছে। অর্ডার দিয়ে যায়, অজিত সাপ্লাই করে।

লাভজনক ব্যবসা।

তিল কুড়িয়ে তাল।

কর্তা বললেন, 'তুমি অনেকদিন আছ। তোমায় খুব বিশ্বাস করতাম। তাই পুলিশের হাতে আর দেব না, এই দণ্ডে আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও, জীবনে আর মুখ দেখিও না।'

চাকরি গেল।

পকেটে একটাকা এগারো আনা পয়সা সম্বল।

এতদিনের সহকর্মীদের সামনে থেকে ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে আসতে হল।—মনে হল, পৃথিবী দ্বিধা হও।

যে লোকটা তার কুমন্ত্রণাদাতা, তাকে মালিক আটকে রেখেছেন, নইলে হয়তো কিছু আদায় হত। অনেক পাওনা ছিল তার কাছে। সে এল না। অথচ পৃথিবীরও দ্বিধা হবার নাম নেই।

এই মুখ নিয়ে কি করে মলিনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে অর্জিত? এ খবর কি চাপা থাকবে? চাকরি যাওয়ার খবর চাপা থাকবে না, যাবার কারণও চাপা থাকবে না। মাধববাবুর বাসার সবাই জেনে ফেলবে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র আর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত অজিত ভট্টাচার্যের এই কাজ! এই স্বরূপ!

না, এ মুখ নিয়ে বাসায় ফেরা যায় না।

অথচ এই একটাকা এগারো আনা পয়সা সম্বল করে এতবড়ো পৃথিবীতে কোথায় পাড়ি দেবে?

হাওড়া স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসে অনেকক্ষণ ভাবল অজিত, তারপর একটা প্লাটফরম টিকিট কেটে ঢুকে পড়ে মারাত্মক ভীড় সম্বলিত একটা থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে পড়ল।

বিনা টিকিটের যাত্রীর ভাগ্যে যে কত লাঞ্ছনা জোটে, সে আর তখন মনে পড়ল না তার। বিনা টিকিটে উঠে পড়ার বাহাদুরীতেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

মনে পড়ল না, চুরির অপবাদে চাকরি হারিয়ে মুখ দেখাতে পারবে না বলে বাড়ি ফেরেনি সে। মনে পড়ল না, একটু আগে মনে মনে কান মলেছিল সে যে, জীবনে আর অসততা করব না বলে।

আপাতত যে মাধববাবুর বাসার কারও সামনে পড়তে হল না এটাই পরম লাভ মনে হল।

ওর না ফেরাটা মলিনার ওপর কি আঘাত হানবে, তা স্পষ্ট খেয়ালে এল না। একবাড়ি লোকের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলল মলিনাকে।

ভীড়ে ঠেলাঠেলি গাড়িতে একটা কোণে গুঁজে বসে রইল, আর ট্রেন ছাড়তেই বলল, 'দুর্গা দুর্গা'।

কোথায় যাবে জানে না।

টিকিট চেকার যদি না ধরে, তাহলে অনেক দূর পাড়ি দেওয়া যাবে। যদি ধরে, কী অদৃষ্টে আছে কে জানে?

আচ্ছা, পাগল সাজলে কেমন হয়?

চমৎকার! চমৎকার ! এতক্ষণ কেন মনে পড়েনি!

অজিতের মনে হল জগতের সমস্ত রকম অসুবিধে আর বিপদ, অপমান আর লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এর থেকে সহজ উপায় আর নেই।

মনে হল এ চালটা মাধববাবুর বাসাতেও চালালে মন্দ হত না!

যাক।

এখন তো অজানা সমুদ্রে পাড়ি!...মাসের বাজার করা আছে মলিনার। মাসের মাইনেটাও আছে বাড়িতে। এক্ষুণি চট করে কষ্টে পড়বে না।

এখন পাগলের ভঙ্গিটা রপ্ত করা!

তা এখন থেকেই শুরু করলেই বা মন্দ কি?

সেই থেকে পাগলের ভূমিকা।

ক্রমশ যেন এইটাই স্বাভাবিক হতে চলেছে।

এখন আর গায়ে ছাই-কাদা মেখে, অথবা গালে-মুখে লাল-নীল রং মেখে নিতে বুকটা ফাটে না, যার তার জামায় টান দিয়ে বলে উঠতে দ্বিধা হয় না, 'এই শালা, আনা কতক পয়সা দে দিকি, পেটের মধ্যে খাণ্ডব দহন হচ্ছে।'

পাগলে গাল দিলে কেউ রাগ করে না। বরং কথার চার ফেলে ফেলে আরও গালমন্দ আদায় করে, তবে দু' আনা চার আনা পয়সা দেয়।

নেহাত যেদিন না জোটে, গিয়ে বসে পড়ে কোনো 'ছত্রে', পেটটা ভরে যায়।

ছত্রের খাওয়ায় পেটটা ভরলেও হয়তো মনটা ভরে না। এসে দাঁড়ায় কোনো খাবারের দোকানের সামনে, গিয়ে বলে 'ও দাদা, খুব যে খোসবু বার করেছ, চারটি ছুঁড়ে মারো না, এইখানে রাখি।'

বলে আর পেটটা দেখায়।

পাগলের মতো কথা এখন আর ভেবে ভেবে সাজাতে হয় না ওকে, কথা আপনিই এসে হাজির হয় ঠোঁটের আগায়।

লজ্জাও হয় না।

এটা যে একটা বেশ মজাদার পেশা, সেটাই সে ধরে নিয়েছে।

আর এটাও ধরে নিয়েছে, এ পেশার পক্ষে কাশীই হচ্ছে উপযুক্ত ক্ষেত্র।

চোর-জোচ্চোর, ভিখিরি, পাগল, আর ধর্মের ষাঁড় এই জীবগুলোর জন্যে সদাব্রত খোলা আছে এখানে।

তাই শুধু যে পেটটাই ভরে যাচ্ছে তা নয়, পকেটেও কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হচ্ছে।

তবে ওই পয়সাগুলো লুকিয়ে রাখার জন্যে অনেক প্যাঁচ কষতে হয়।

মণিকর্ণিকার ঘাটে যে সাধুটি রাতদিন ধূনী জ্বালিয়ে বসে থেকে ভস্মের পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে, তার সেই ভস্ম-পাহাড়ের খাঁজে এক খুরি পয়সা-টাকা আছে পাগলার, আর ঘাটের ওপর যে অশ্বত্থ গাছটা অনেক ঝুরি নামিয়ে বসে আছে অগুনতি বছর ধরে, তার একটা ঘন অন্ধকার ডালে ঝোলানো আছে একটা কৌটো ভর্তি টাকা। শ্মশানে কুড়িয়ে পাওয়া ময়লা ন্যাকড়ার টুকরো দিয়ে বেঁধেছে, পাছে কারও চোখে পড়ে যায়।

আর এসব করে সে রাতবিরেতে।

অথচ লোকটা নাকি একদা জাতে বামুন ছিল, নিরীহ ভদ্রলোক ছিল।

বাসায় কারও সঙ্গে একদিনের জন্যে বচসা হত না তার।

এই জীবনের মধ্যে আটকে গেছে সে।

যদিও ভাবছে অভিনয় করছি।

তবে এক এক সময় বউয়ের জন্যে মন বড়ো উচাটন হয়ে ওঠে।

তখন এই ঘৃণ্য খোলসটাকে বড়ো অশুচি মনে হয়। তখন এই পেশাটাকে নারকীয় মনে হয়।

আর তখনই প্রাণটা ছটফটিয়ে ওঠে সেই বিস্মৃতপ্রায় সহজ সুস্থ জীবনটার জন্যে।

ইচ্ছে হয় বউটাকে কোনো প্রকারে একবার কাশীতে এনে ফেলে। তারপর সব সহজ হয়ে যাবে।

কাশীতে থেকে বুঝেছে, রাজ্যটা যে মা অন্নপূর্ণার বলা হয়, সেটা ভুল বলা হয় না। উপোসী এখানে থাকতে হবে না।

বামুনের মেয়ে তো, একটা কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। কিছু না হোক, একটা ঠাকুর মন্দিরে ফুল জল ফেললে, মন্দির ধোয়া মোছা করলে, পুজোর বাসন দু'খানা মাজলেও পেটটা চলে যাবে।

আর—

কে জানে বউটার কী হচ্ছে! সারাদিনের ছলনার পর রাত্রে কোনো মন্দিরের আনাচে কানাচে শুয়ে ভাবে পাগলা।

অবিশ্যি, সামান্য যা কিছু সোনা-রূপো, কাঁসা-পেতল ছিল, তাতে চলেছে কিছুদিন। তারপর? তা অতগুলো ঘর কি আর এক মুঠো করে চাল চাঁদা দিয়ে একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে না? আর বাড়িওলা?—ওর অবস্থা দেখে কি আর ঘর ভাড়াটা মাপ করছে না?

পাগলামির নেশায় সত্যিই যেন পাগল হয়ে থাকি আমি। একখানা চিঠিও তো লিখতে পারতাম! অন্তত বেঁচে আছি, এই খবরটুকু দিয়ে! কিন্তু—

আমি পালিয়ে আসার পর নিশ্চয়ই ওরা আমার ওই আপিসে খোঁজ নিয়েছিল, আর যা শোনবার শুনেছিল। 'চোর স্বামী' এই ঘেন্নায় গলায় দড়ি দেয়নি তো মলিনা? যে মানিনী!

এই কথাটা যেই মনে আসে, সত্যিই যেন মাথার মধ্যে পাগলেরই মতো হিজিবিজি হয়ে যায়। আর চিঠি লিখতে সাহস হয় না। ভাবে যা থাকে কপালে, গিয়েই পড়ব একবার। আশেপাশে জিগ্যেস করব, মলিনা বেঁচে আছে কিনা। তারপর যা আছে অদৃষ্টে।

এখন চিঠি দিলে হয়তো বিপদই বাড়বে। বিপদই হয়েছে চিন্তা।

এখন দরকার কিছু নগদ টাকার।

ভেবে চিন্তে পাড়াটা বদলায়।

পাগলামীর ভোলটাও বদলায়।

আর সেই গায়ে ছাই মেখে হি হি করে হেসে লোকের মনোরঞ্জন করে না। চেয়ে চিন্তে একটা ধুতি আর শার্ট জোগাড় করেছে, পরে মন্দিরের রাস্তায় আসে, আর কোনো যাত্রী নামলেই কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'বিলেত থেকে এলেন তো বাবু? দেশটা মন্দ না, কী বলেন? তা আমারও একবার যাওয়া দরকার। পরিবার সেখানে পড়ে আছে, আনতে পারছি না, এরোপ্লেনের ভাড়াটা জোগাড় হচ্ছে না, গোটা পাঁচেক টাকা ছাড়ুন না, বাবু?'

অধিকাংশই অবশ্য ব্যঙ্গ হাসি হেসে সরে যায়, কেউ কেউ মজার মজার কথা শোনে জিগ্যেস করে করে।

বলে, 'তা বউ বুঝি মেম? এরোপ্লেন ছাড়া চড়বে না?'

'আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন। মেমই। বাঙালির মেয়ে হয়েও মেম! বুঝলেন কি না বিলেত গেলে যা হয়, মেম দেখে দেখে মেম বনতে সাধ হয়। আমি চাষাভুসো বামুন, আমার পরিবার হয়ে তুই—'

ওরা হেসে হেসে বলে, 'তা তুমিই বা হঠাৎ পরিবার নিয়ে বিলেত গেলে কেন?'

'কেন?'

পাগল চোখ মটকায়, আঙুল মটকায়, লজ্জা লজ্জা মুখে বলে, 'গেলাম কি আর সাধে? পরিবারের জেদ, বিলেত দেখবে, সাহেব-মেম দেখবে, চুরি-জোচ্চুরি যে করে হোক টাকা জোগাড় কর।'

'নে শালা তুই মর।'—বউয়ের জন্যেই যে তার এত জ্বালা সেই কথাই বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

তারপর হঠাৎ সুর ফের্তা করে বলে, 'তা যাই বলুন বাবু, দেখবার মতোন দেশ বটে!'

লোকে হাসির কথার দাম স্বরূপ দেয় চার আনা আট আনা।

কিন্তু কে জানে কথাগুলো ওর শুধুই বানানো কি না। না কি সাজা পাগলের পাগলামি আসলে অবয়ব নিচ্ছে?

সেদিনও এমনি ধরেছে একজনকে। গড়গড় করে বলে চলেছে, 'সব দেশ দেখলাম বাবু—চিন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া। বিলেতের মতন এমন দেশ দেখলাম না। বিশ্বাস না হয়, চলুন।'

লোকটা হেসে বলে, 'তুই বুঝি ঘুরে এসেছিস!'

'শুধু ঘুরে?' পাগল দু'হাতের দশটি আঙুল ছড়িয়ে বলে, 'পাক্কা দশটি বছর কাটিয়ে এসেছি। পরিবার বলল, 'তুমি এখন যাচ্ছ যাও, আমি আর দু'টো দিন থেকে যাই।' তা বলব কি বাবু, পয়সার অভাবে পরিবারকে আনা হচ্ছে না।'

লোকটা আরও হেসে ওঠে, 'তা এত দেশ বেড়ালি, পয়সা কে দিল? হঠাৎ সে সব পয়সা গেল কোথায়?'

'ওই তো, ওই বেড়িয়ে বেড়িয়েই তো বিলেত গেছি, এন্তার চাল ফলাচ্ছি, ষোলো ঘোড়ার গাড়ি ভিন্ন চড়ি না, ফল ফললো! পকেট গড়ের মাঠ! এখন এই দেখুন—ভদ্দরলোকের ছেলে, পায়ে এক জোড়া জুতো নেই।...আর বিলেতের এমন আইন, পায়ে জুতো নেই তো দাও ঠেলে হাজতে।

'দিন না বাবু গোটা দশ টাকা—একজোড়া জুতো কিনে ফেলি—'

লোকটা হয়তো আরও মজা করত, হঠাৎ বিশ্বনাথের গলি থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক।

পাশের লোককে বললেন—'কি রে যতীন?'

যতীন মৃদু হেসে বলে, 'কিছু না বাবু, এক ব্যাটা পাগল। বলে, বিলেত যাবে—'

কথা শেষ হয় না, হঠাৎ পাগলটা সামনে দাঁড়ানো মোটর গাড়িটাকে পাক দিয়ে ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু পালাতে পারে না।

পথ আগলানো এক ষাঁড়ের ধাক্কায় ছিটকে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আচরণটা পাগলজনোচিতই।

কিন্তু প্রৌঢ় ভদ্রলোক যেন দিশেহারা হয়ে এগিয়ে যান। হাত ধরে তোলেন পাগলকে। এবং পাগলের একরাশ দাড়ি গোঁফ সম্বলিত মুখটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'কে তুই?'

পাগল হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে।

মুখ নীচু করে বলে, 'কেউ নেই। একটা পাগলা-ছাগলা। ছেড়ে দিন বাবু।'

ভদ্রলোক কিন্তু ছেড়ে দেন না।

বরং আরও শক্ত করে চেপে ধরে বলেন, 'তুমি অজিত ভট্চায না?'

চেষ্টা করেছিল কিছুক্ষণ।

বলেছিল—'আমি বাবু, সাহেব মানুষ, ভট্চাযের খবর জানি না।' বলেছিল—'বিলেত যাবার টাকাটা জোগাড় হলেই চলে যাই বাবু—পরিবার সেখানে পড়ে আছে!'

কিন্তু বেশিক্ষণ পারেনি।

হাউ হাউ করে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরেছিল।

যোগাযোগটা অদ্ভুত।

কাশীতে বেড়াতে এসেছেন 'কুন্তল বিলাসের' মালিক। যোগেন তাঁর সরকার। যোগেনের গুপ্তচরবৃত্তিতেই মালিক ধরতে পেরেছিলেন ওকে।

মালিক যেন বড়ো বেশি মর্মাহত হয়েছেন।

হয়তো অজিতের এই দুর্দশা দেখে তাঁর মনে হচ্ছে সেদিনের ব্যবহারটা বড়ো বেশি নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। হয়তো মনে হয়েছে, লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছিলাম আমি। গরিব লোক, লোভ সামলাতে পারেনি, একবারের দোষ ক্ষমা করা উচিত ছিল। অতগুলো লোকের সামনে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে লোকটার জীবনটাই নষ্ট করে দিলাম।...

'আমার ব্যবহারে পাগল হয়ে গেছে লোকটা!'

এই মর্মদাহ তাকে পীড়িত করতে থাকে।

আসলে অজিতকে ভালোওবাসতেন। আর বাসতেন বলেই বোধ করি অত বেশি রেগেছিলেন তার অবিশ্বাসের কাজে।

জোর করে গাড়িতে তুলে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

আর নাইয়ে, খাইয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, বস্তুত পুরো পাগল নয়। লজ্জায়, ঘেন্নায় পালিয়ে এসে আর পথে পথে ঘুরে ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেছে।

যে জীবনটা নষ্ট হবার জন্যে তিনি নিজেই কিছুটা দায়ী, সে জীবনটাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না তিনি? ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না আর একবার সুযোগ দিতে?

'চল আমার সঙ্গে।'

বললেন মনিব।

অজিত মাথা হেঁট করে বলল, 'এ মুখ আর কলকাতায়—'

'আরে বাবা, রাগের মাথায় বাপ জ্যাঠা, মাস্টার মনিব অমন কত বলে। সেইটা ধরে, মাথা খারাপ করে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে? ছি ছি! তোমার স্ত্রী আছে না?'

'ছিল তো—'

'ছিল মানে?'

'মানে, আর তো খবর নিইনি!'

'না না, অজিত কাজটা ভালো করনি। এতদিন কিভাবে কাটছে মেয়েটার, কে জানে। তুমি এই করে বেড়াচ্ছো জানলে, খোঁজখবর নিতাম। এখন চল আমার সঙ্গে, কাজকর্ম করবে।'

'আবার কাজকর্ম!'

বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকায় অজিত।

মালিক জোর দিয়ে বলেন, 'কেন করবে না? মানুষ তো ভুল করেই। এবার নতুন করে—'

কর্পূরের মতো উবে যাওয়া অজিত ভট্চায তবে নতুন করে জীবন শুরু করতে আবার দেশে ফেরে।

কিন্তু কোথায় তার সেই জীবন?

মাধব ঘোষের বাসার তিন কুড়ি লোক এই হতভাগ্যকে ঘিরে বসে নিখুঁত নির্মমতায় জানিয়ে দেয়, 'নেই সে বস্তু।' বুঝিয়ে দেয়, 'ছিলই না কোনোদিন।'

থাকলে কখনও এমন কর্পূরের মতো নিমেষে উবে যায়?

'দু'টো মাস তর সইল না—' সুখদা সখেদে বলে, 'এতগুলো মানুষের উপরোধ অনুরোধ ঠেলে সবাইয়ের নাকের ওপর দিয়ে ছোঁড়ার হাত ধরে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল!'

রেলেকাটা মানুষটার কথা কেউ তুলল না। তারা যে স্পষ্ট দেখে এসেছে অজিতের মড়া, সে কথা বলল না।

অজিতের জন্যে তারা শয়নে স্বপনে পথ চেয়ে বসেছিল সেই কথাই বলল।

অনেকক্ষণ বিহ্বলতার ঘোর ছিল, তারপর—

অজিত ভাবল, আশ্চর্য আমি! সামান্য একটু 'চোর' অপবাদে দেশত্যাগ করেছিলাম, গায়ে ছাই মেখে পথে পথে ঘুরেছিলাম, আর এখন স্ত্রী কুলত্যাগ করেছে শুনেও দিব্যি বসে আছি। এতগুলো লোককে মুখ দেখাচ্ছি। এরা চা দিয়েছিল, তাও খেয়েছি। এরা বলেছে, 'সে কি কথা, যাবে কোথায়? কেনই বা যাবে? আবার বে'থা কর, ঘরসংসার কর,' তাও শুনছি বসে বসে।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নগেনবাবু সেখানে গিয়েছিলেন বললেন না?'

'গিয়েছিলেন তার কি? সে বাসায় কি আর আছে নাকি? যেই জানাজানি হয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়ে বেলেঘাটায় না কোথায় চলে গেছে। বলে পর্যন্ত যায়নি। পাড়ার লরি গাড়ির ড্রাইভার গিয়েছিল, বাড়ি উঠ্‌নো জিনিস নিয়ে, সেই বুঝি বলেছিল। কিন্তু তার খোঁজ করে আর কি হবে?' দাসগিন্নি আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলেন, 'মিথ্যে একটা খুনোখুনির দায়ে পড়া বৈ তো নয়! পুরুষের রক্ত তো গায়ে আছে? তার চেয়ে—'

কিন্তু অজিত কি খুনোখুনির কথা ভাবছে?

না।

তেমন প্রতিহিংসার তীব্রতা খুঁজে পাচ্ছে না অজিত মনের মধ্যে। সে শুধু একবার দেখতে চায় মলিনাকে। দেখতে চায়, কি রকম চেহারা হয়েছে মলিনার।

কি রকম হয়ে যায় হঠাৎ অসতী হয়ে যাওয়া মেয়েমানুষ!

আর সেই অন্যরকম হয়ে যাওয়া মলিনাকে একবার শুধু প্রশ্ন করতে চায়—'মলিনা তুমি এই?'....বলতে চায়—'মলিনা, এইটাই কি তুমি? তবে আগের সেই মানুষটা?...যে আমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকত? আমার অস্তিত্ব নিয়েই বেঁচে থাকত?

সে কে?'

মানিকতলার সেই সরু গলির অন্ধকার একতলার ছোট রান্নাঘরটায় বসে মলিনাও ভাবছিল, সে তবে কে?

মাধব ঘোষের বাসায় দাওয়ায় বসে যে মলিনা রান্নার সরঞ্জাম আর মহিমা নিয়ে বসত, সেই মলিনাই কি আমি?

তবে অজিত ভট্‌চায নামের সেই মানুষটা এসে খেতে না বসলেও কিছু এসে যাচ্ছে না কেন আমার? কেমন মনে হচ্ছে না সব মিথ্যে?

রাজ রোজ নতুন নতুন রান্নায় উৎসাহ আসে কোথা থেকে আমার? আর একটা মায়াবী রাক্ষস যখন উৎসাহের জোয়ার বইয়ে সেই রান্না তারিফ করে খায়, তখন আমার প্রাণটা পুলকে ভরে ওঠে কেন?

কই কিছুতেই তো মায়াবীটাকে আমার 'ভাই' বলে মনে হয় না! বারেবারে কেন অজিত ভট্‌চাযের মুখের সঙ্গে মুখটা গুলিয়ে যায় ওর?

তবে কি তরোয়ালের খেলায় হার হবে আমার? কেটে টুকরো হয়ে যাব তার ধারে?

আর ওই ছেলেটা!

সে যে সারারাত জেগে পায়চারি করে, সেকথা টের পাওয়া যায় পাশের ঘর থেকে। আর

সকালে এসে সেই না-ঘুমানো ক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটিয়ে সে শুধু বলে, 'আজ কি রাঁধবে বল? কি আনব?'

ওর পয়সা নেই।

এই বাসাটুকু ভাড়া করতে আর দু'টো লোকের ভাত যোগাতেই সারা হয়ে যায় ও। তবু ছোটোখাটো ঘর সাজানোর জিনিস এনে জড় করে ও, আনে গেরস্থালীর অদরকারি টুকিটাকি।

বারণ করলে হাসে।

বলে, 'সংসার জিনিসটা যে কি, তার স্বাদ তো জানিনি কখনও। তাই সাধ হল।'

মলিনা হাসি মুখে সেই হাসিমুখটা সহ্য করবে? মলিনা কিছু না দিয়ে শুধু নিয়েই চলবে?

কেন?

অজিত ভট্চায নামের সেই ছায়াটার অনুশাসনে?

কিন্তু এই মলিনা তো মাধব ঘোষের বাড়ির সেই মলিনা নয়!

এ তো অন্য আর একজন। এ তো একটা থিয়েটারের অ্যাকট্রেস!

অবিরত অন্যের লেখা পার্ট প্লে করে চলেছে। তাই হঠাৎ একদিন যখন বাড়িওলা মানিক দাসের গিন্নি বেড়াতে আসেন, অথবা সরেজমিনে তদন্ত করতে আসেন বাড়ি কেমন ভাবে রেখেছে, আর দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন মলিনা অম্লান বদনে বলে, 'ওই তো, ওই পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিকেই ম'লাম মাসিমা! বলব কি দু'টি মানুষই সমান! চিরটাকাল ওই বাড়ি পরিষ্কারই ধ্যান-জ্ঞান।'

যেন দু'টি মানুষে চিরটাকাল একসঙ্গে থেকেছে।

দাসগিন্নি সে কথা বুঝতে পারবেন এমন হতে পারে না। তিনি শুধু বলেন, 'এই রকমই চেয়েছিলাম আমরা। শুধু স্বামী-স্ত্রী, কোনো ঝামেলা নেই।'

এই চলছে।

এই অভিনয় উৎরোনো।

তবে আর কি করে বলা যায় সেই মলিনাই এই লীনা?

ছিল মলিনা ভট্চায, হতে হয়েছে লীনা মিত্র। নাপিত পুরুত ডেকে বদল নয়। রেজিস্টারি অফিসে গিয়ে বদলও নয়, শুধু শুধু বদল, অভিনয়ের বদল।

আর সেই বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওর কথার ধরন বদলাচ্ছে, চিন্তার ধারা বদলাচ্ছে।

বারো ঘরের ভাড়াটেদের মধ্যে যখন থেকেছে উঁচুনাকী মলিনা, তখন চিন্তার ধারা ছিল তার শুধু ওদের থেকে বিশিষ্ট হওয়া! ওরা রাতদিন গাধা-খাটুনী খাটে, রাতদিন একবস্ত্রে কাটায়, যে বস্ত্রে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে, অসহ্য হলে সাবান সোডার জলে সেদ্ধ করে নিজেরাই কেচে নেয় ওরা। পুরুষদের জামাটা কাপড়টাই শুধু ধোবার বাড়ির মুখ দেখে।

মলিনার গায়ে সর্বদা ব্লাউস সায়া, আর তাদের গায়ে ময়লার ছোপ ধরতে না ধরতে ধোবার বাড়ি চালান হয়।

সংসারের গাধা-খাটুনী কি মলিনাই খাটত না? কিন্তু নিঃসন্তান জীবনের সুবিধায় অবলীলায় সব করে নিত। তারপর ফিটফাট হয়ে বেড়াত।

চুলে গামছা চেপে চেপে পাতা কাটত মলিনা, রাঙতা দেওয়া টিপ কিনে পরত।

তখন মলিনার কথার ধরন প্রায় ওদের মতোই ছিল। স্বপ্নার মা, দাসগিন্নি, সুখদা।

এখন যেন আর একটা ভাষা এসেছে মলিনার মুখে। মেয়েমানুষদের সঙ্গচ্যুত হয়ে গিয়ে মেয়েলি ধরনের কথাগুলো বুঝি ভুলেই গেছে মলিনা। ভুলে যাচ্ছে আটপৌরে কথা।

কথা বলছে পোশাকী ভাষায়।

সে কথার ভঙ্গিতে রহস্যের ব্যঞ্জনা।

ছুটির দিনে সুধানাথ যদি কোথাও থেকে ঘুরে এসে বলে, 'আর একবার চা হলে কেমন হয়?'

মলিনা বলে, 'খাওয়ার সঙ্গী চাইলে হবে না, না হলে হবে।'

সুধানাথ বলে, 'অমন চায়ের মুখে ছাই।'

মলিনা বলে, 'এ তো ভারী আবদার! সঙ্গী তা হলে জোটাও?'

সুধানাথ গম্ভীরভাবে বলে, 'ভগবান তো দয়াপরবশ হয়ে দিয়েছেন জুটিয়ে।'

মলিনা বলে, 'ভগবানের বালাই নিয়ে মরি। শ্মশান থেকে একখানা আধপোড়া কাঠ এনে তাকে পুতুল বানিয়ে ধরে দিয়েছেন সঙ্গী বলে।'

সুধানাথ বলে, 'হতভাগার ভাগ্যে সেটুকুও সইলে হয়। দুর্ভাগাদের তো পোড়া শোলমাছও জলে পালায়।'

মলিনা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, 'অধিক দুর্ভাগাদের আবার তাও পালায় না, গলায় কাঁটা বিঁধিয়ে ঝুলে থাকে।'

হয়তো সুধনাথকে বলে মলিনা, 'তা তুমি সুদ্ধু নিরিমিষ খাবে কেন? মাছ আনো বাপু, ঝাল ঝাল করে সর্ষের ঝোল রেঁধে দিই—'

সুধানাথ বলে, 'আমার শর্ত তো জানো?'

'জানি। তা বলে পাগলের পাগলামী মানতে রাজী নই। মাছ না আনলে রাগারাগি করব।'

'করো! সেটাই বা মন্দ কি! তবু বোঝা যাবে বাড়িতে দু'টো জ্যান্ত প্রাণী আছে।'

'বেশ তা হলে আগে যেমন করতে, তাই কর। সকালে সাত্ত্বিক আহার, রাত্তিরে রেস্টুরেন্টের মাংস পরোটা!'

'দায় পড়েছে আমার রাত্তিরে 'খাই খাই' করে দু' মাইল ছুটতে।'

মলিনা রাগ করে বলে, 'তার মানে আমাকে চির অপরাধিনী করে রাখা। দেখানো যে, দেখো তোমার জন্যে কত সর্বত্যাগী হয়েছি আমি।'

সুধানাথ কিন্তু এতেও রাগ করে না। বলে, 'বাঃ তোমার তো বুদ্ধিটা খুব প্রখর! ভেতরের রহস্য এতো বুঝে ফেলেছ?'

তা হয়তো সুধানাথের কথার বাঁধুনীতে মলিনাও শিখেছে বাঁধুনী।

আর চিন্তাতেও বুঝি সেই নতুনত্বের বাঁধুনী।

এখন আর মলিনা ঘুম থেকে উঠে ভাবে না, আজ কয়লাগুলো সব ভেঙে ফেলব, আজ জড়ো করা জামাকাপড়গুলো সাবানে কেচে ফেলব, আজ কেটে-রাখা ব্লাউসটা সেলাই করে ফেলব। অথবা এ ভাবনাও আসে না তার, ছাপা ছিটের শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে, কেটে জানলার দু'টো পর্দা বানালে হয়, বাসনওয়ালি এলে জিগ্যেস করতে হবে ছেঁড়া পাঞ্জাবী নেয় কি না।

না, এসব চিন্তা আর নেই এখন মলিনার।

মলিনা এখন ঘুম থেকে উঠে এই ধরনের কথা ভাবে, আজ দু'খানা মোচার বড়া করতে হবে, আমার জন্যে মানুষটা নিরিমিষ খেয়ে সারা হচ্ছে।...

মুখ ফুটে সেদিন বলেছিল, ওর মা মরে পর্যন্ত নাকি সরুচাকলি খায়নি, দুটো চাল ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে, আজই করে দেব।

সামান্য দু'টো নিরিমিষ রান্না, তাই খেয়েই কত খুশি, যেন বর্তে যাচ্ছে। অথচ তার বিনিময়ে কত দিচ্ছে তার হিসেব করবারও সাহস নেই মলিনার।

শুধুই কি খাওয়া পরা?

শুধুই আশ্রয়? শুধুই কি অর্থসামর্থ্য?

জীবনটা বিকিয়ে দেয়নি?

সমগ্র ভবিষ্যৎ?

মান সম্ভ্রম, সমাজ পরিচয়?

আত্মীয়জনের দিকে যায় না আর ও, পুরনো আলাপীদের ছায়া মাড়ায় না, নির্বাসন দণ্ড নিয়ে বসে আছে।

অথচ আমি ওকে অহরহই দিচ্ছি মুখনাড়া, দিচ্ছি ঝঙ্কার। বলছি, 'আমাকে খাঁচায় পুরে রেখেছ।...আমায় স্বাধীনতার ভাত খেতে দিচ্ছ না।'

রাগ করে ও একদিন বলে বসেছিল, 'ও স্বাধীনতার চিন্তা তো তোমার লোকের বাড়ি রান্না করা? তা বেশ তো মনে কর না তাই করছ। মিটে যাবে বিবেকের দংশন।'

তখন মলিনাকে বাধ্য হয়ে ভ্রূভঙ্গি করতে হয়েছে। অলৌকিক একটু হাসতে হয়েছে।

বলতে হয়েছে, 'আহা তাতে তো মাইনে আছে গো! এ যে বিনি মাইনের খাটুনি।'

'গরিবের বাড়িতে কাজে ঢুকলে এই দুর্দশাই ঘটে।'

বলে নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকেছিল ও মলিনার মুখের দিকে।

যদিও মলিনার সেই পাতা কাটা চুল আর পরিপাটি টিপ পরা উজ্জ্বল মুখ আর নেই এখন।

চুল বাঁধার পাট গেছে। একরাশ জট পড়া চুল হাতে জড়িয়ে জড়িয়েই চলছে।

কিন্তু কদাচ কখনও চুলটা জট ছাড়াতে বসে আর্শীতে দেখতে দেখতে মনে হয় মলিনার মুখটা যেন আজকাল তার থেকে বেশি ভালো দেখাচ্ছে। অন্য ধরনের ভালো।

রাস্তায় ঘাটে যে সব ফ্যাসানি মেয়েদের দেখেছে মলিনা, মলিনার মুখে যেন তাদের ছাপ। তাছাড়া সুধানাথও তো কই বলে না চুলে তেল দাও না কেন? বাঁধো না কেন?

মলিনা তাই চুলে আর তেল দেয় না।

অথচ সুধানাথ ভাবে মলিনা কৃচ্ছ্রসাধন করছে।—মলিনার চিন্তার ধারা বদলেছে বৈ কি।

আচ্ছা, এই মলিনাকে কি লোকে সতী মেয়ে বলবে?

অকস্মাৎ কর্পূরের মতো উবে যাওয়া স্বামীর জন্যে যে কেঁদে কেঁদে নিজকে কর্পূরের মতো শেষ করে ফেলছে না, পরপুরুষের ভালো-লাগা, ভালো-না-লাগার চিন্তায় দিনের অধিকাংশ ব্যয় করে ফেলছে, এ মেয়ে অসতী ছাড়া আর কি?

হঠাৎ একটা পোড়া গন্ধে চমক ভাঙল।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গলার স্বরেও।

'এই সেরেছে, রাঁধতে রাঁধতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? কি পুড়ল?'

মলিনা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র একটু হেসে বলে, তোমার কপাল!'

'আমার কপাল!'

হেসে ওঠে সুধানাথ, 'সে কি তোমার ওই কড়াতে চাপানো ছিল নাকি?'

'ছিলই তো! ওই কপালকে লোহার কড়াইতে করে গনগনে আগুনে চড়িয়েই রেখেছি তো সর্বদা, পুড়ছে আঙার হয়ে।'

সুধানাথ একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে বলে, পোড়া কপালই বা মন্দ কি? বেগুন পোড়াও তো ভালোবেসে খায় লোকে।'

'হতভাগা, অভাগারা খায়।'

সুধানাথ একটু ক্লান্ত হাসি হেসে বলে, 'তা সবাই কি আর ভাগ্যবান হয়? এও ভালোই।'

হঠাৎ অলসভঙ্গি ত্যাগ করে রান্না ছেড়ে উঠে আসে মলিনা।

তীব্রস্বরে বলে, 'ভালো থেকে আমাদের কী হবে বলতে পার?'

সুধানাথ দাঁড়িয়ে ওঠে।

চমকে ওঠে।

বলে, 'কী বলছ?'

'যা বলছি তা বুঝতে পারবে না এত খোকা তুমি নও। আমি বলছি আমাদের কি আর কেউ সমাজে নেবে? প্রাণপণ করে ভালো হয়ে থাকলেও কেউ ভালো বলবে? আমরা যে কী করে কাটাচ্ছি, কেউ বুঝবে? বিশ্বাস করবে?'

হাঁপাতে থাকে মলিনা।

সুধানাথ উত্তর দেয় না।

সুধানাথ একটা অদ্ভুত কাজ করে। সুধানাথ দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে খিলটা বন্ধ করে দেয়।

পোড়া তরকারি সুদ্ধ কড়াটা নামানো থাকে, পড়ে থাকে মাখা ময়দা। উনুনটা জ্বলে জ্বলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মলিনা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

মলিনা বুঝতে পারে না কার কাছ থেকে পালাল সুধানাথ! নিজের কাছ থেকে, না মলিনার কাছ থেকে?

সন্ধ্যা গড়িয়ে অনেকটা রাতে গিয়ে ঠেকে।

মলিনার হঠাৎ অজিতের সেই না-ফেরার রাতটা মনে পড়ে যায়। তেমনি বুক ছম ছম রাত যেন এটা! তেমনি ভয়ানক একটা বিপদ যেন হাঁ করে তাকে গ্রাস করতে আসছে।—যেন সব কিছু হারিয়ে ফেলবে আজ মলিনা।

মলিনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ এক সময় সুধানাথের ঘরের দরজাটা খুলে যায়। মনে হয় চুলগুলো কে যেন ওর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছে। চোখ দু'টো জবাফুলের মতো লাল। কাছে এসে মলিনার একটা হাত চেপে ধরে। অস্বাভাবিক গলায় বলে, 'চল আজ রাত্তিরে বাড়ি থেকে কোথাও বেরিয়ে যাই।'

'বেরিয়ে যাব!'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ। চল না রাস্তায়, গঙ্গার ধারে, কোনো ঠাকুরতলায়। হেঁটে হেঁটে কাহিল হয়ে ফিরে আসব।'

মলিনা উঠে দাঁড়ায়।

শান্তস্বরে বলে, 'না! এত কষ্ট তোমায় করতে দেব না। ভালো থাকার আমার দরকার নেই।'

চার বাড়ির কাজ করা একটা ঝি, সামান্য মাইনেয় বাসন মেজে দিয়ে যায়। ভোরের ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়, অধৈর্য কড়া নাড়ার শব্দে।

কিন্তু আজ যেন সে শব্দটা বুকের মধ্যে ঝনাৎ করে একটা লোহার ঘা মারল। যেন মলিনাকে ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি দেবার গোঁ নিয়ে এই শব্দটা হানছে ও।

উঠি তো পড়ি করে ছুটে এসে দরাজাটা খুলে দিল মলিনা, আর সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

বসে পড়ল ধুলো কাদা আর জলে ভেজা গলিটায়।

যে এই শব্দের মুগুর হেনেছিল, সে কি মলিনার এই দুর্দশায় হেসে উঠল?

অস্ফুট চেতনায় ঘর থেকে মনে হল সুধানাথের একটা যেন হাসির শব্দ উঠল কোথায়।

যে হেসেছিল, সে কি ক্রূর একটা ব্যঙ্গের সুর নিয়ে কথাও বলেছিল কিছু?

মলিনারও মনে হল কী যেন বলল লোকটা। মলিনার মাথার মধ্যে শুধু শব্দটা ধাক্কা দিল। মলিনা কথাটা শুনতে পেল না।

তারপর মলিনা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, 'না, না, আমি মলিনা নই।'

সুধানাথ খুব জোরে একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ পেল।

সুধানাথ ভাবল ঝিটা কি অসভ্য!

এই ভোরবেলা দুম দাম! তারপর ভাবল, কিন্তু মলিনা কেন ফিরে আসছে না। ওর সঙ্গে কী এত কথা কইছে! কিন্তু নিঃসাড়েই বা কেন?

অনেকক্ষণ পরে উঠে এসে বাইরে দাঁড়াল, বলল, 'তোমার ঝিয়ের সঙ্গে এত দেরী হচ্ছিল কিসের?'

মলিনা মাথা নেড়ে আস্তে বলল, 'কই আসেনি তো ঝি।'

'আরে! কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম, দরজা খোলার শব্দ পেলাম!'

'পাশের বাড়ি বোধহয়!'

'পাশের বাড়ি? কক্‌খনো না, কে এসেছিল বল?'

মলিনা বলল, 'অধিকার জন্মেছে বুঝি? তাই সন্দেহ করতে শুরু করছ।'

সুধানাথ একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মলিনার মুখের দিকে। আর সহজ সুরের সহজ কথা এগোল না। আস্তে সরে গেল।

একটু পরে মলিনা বলল, 'শরীরটা ভালো লাগছে না, বাইরে কোথাও খেয়ে নিতে পারবে?'

সুধানাথ অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'পারব না কেন? কিন্তু—তুমি?'

'আমি? খাবার মতো শরীর হয়, উঠব, রাঁধব, খাব।'

একটু পরে জামা জুতো পরে বেরিয়ে গেল সুধানাথ।

তখন ভর দুপুর।

মাধব ঘোষের বাসার জোয়ান পুরুষরা তখন সকলেই কাজের ধান্ধায় বাইরে। মেয়েরা কেউ কেউ সকালের রান্নার পাট সেরে রাতের রান্না সেরে রাখছে। কেউ বা স্কুল থেকে ফেরা ছেলেমেয়ের জন্যে রুটি গড়ে রাখছে। কেউ বা সব সেরে ভাতের কাঁসি নিয়েও বসেছে।

হঠাৎ চোখ পড়ল দাস গিন্নির।

চমকে উঠে বললেন, 'ওমা, তুমি আবার পোড়া মুখ পুড়িয়ে কোথা থেকে?'

মণ্ডল গিন্নি মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'কি গো দাস দিদি?'

নগেনবাবুর বউ বললেন, 'ওমা কী সর্বনাশ!'

সুখদা এল।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বলল, 'ওমা আমার কপাল! কাল মানুষটা সারাদিন এইখানে বসে, তখন তোমার টনক নড়ল না? বলি খবরটা দিল কে?'

মলিনা এত কথার উত্তর দিল না।

মলিনা শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'কোন্ ঘরে উঠেছে ও?'

'ঘরে আবার কি? এইখানেই। পাঁচ ঘরে। কত সাধলাম দু'টো খেতে। তা কী আর খায়! এত বড়ো ঘেন্না সয়ে যে হার্টফেল করেনি, খাড়া বসে ছিল, এই ঢের! তারপর কখন যেন উঠে গেল। তা তুমি আবার কী মনে করে?'

মলিনা আরও উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'ও কি ওর জিনিসপত্তর রেখে গেছে?'

'শোনো কথা, জিনিসপত্তর আবার কোথা?'

'আজ আসেনি ও?'

'আজ আবার কই এল? আর আসে মানুষ? আর মুখ দেখায়? পরিবার যার পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, সে আর লোকালয়ে থাকে? মেয়ে জাতের মুখে তুমি কালি দিয়েছ মলিনা। তোমার কলঙ্কে আমাদের মাথা হেঁট!'

মলিনা উঠে দাঁড়ায়।

মলিনা রাস্তায় বেরিয়ে অনেকগুলো গলার হাসি শুনতে পায়।

লহরে লহরে হাসি।

তার সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা।

'ঘরের খোঁজ! জিনিসপত্তরের খোঁজ! আবার সংসার করবার সাধ না কি লো? হতে পারে ছোঁড়া বোধহয় ভেগেছে। শুনল কোথায়? কে বলল?'

কানের পর্দাটা পুড়ে যাচ্ছে। এত রোদ কেন?

মলিনা ছুটতে শুরু করল।

মলিনা এই ভর দুপুরের চড়া রোদ থেকে পালাবে।

খবরটা আনল সেই হাবা, কালা মদনা।

বলল, 'ও বাবা গো, সে কী রক্ত! যেন এক কুড়ি পাঁঠা কেটেছে!'

তিন কুড়ি লোক ঠিকরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলল, 'কোথায় কোথায়?'

'উই সেইখেনেই। সেই লেবেল ক্রসিংয়ের ওইখানে। মুখটা ছেঁচে যায়নি, তাই সদ্য চিনতে পারলাম বামুন কাকি। রক্তে আর কাপড়চোপড়ের কিছু পদাথ্যি নেই—'

ওরা শেষ অবধি শুনল না।

ছুটতে লাগল।

এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখবার সুযোগই বা ক'বার আসে জীবনে?

—ঃ ঃ—

কুমিরের হাঁ

না, এখন আর আমার নিজের সেই সত্যিকারের নামটায় কেউ ডাকে না। জানেও না অনেকে। যারা জানত তারাও ভুলে গেছে।

তাদের স্মৃতিশক্তির প্রতি অভিযোগ করে লাভ নেই, আমি নিজেই তো প্রায় ভুলতে বসেছি। আমি আমার ছদ্মনামের খোলসের কাছে আমার সত্তাকে সমর্পণ করেছি। ওই খোলসটা আশ্চর্যরকম সেঁটে বসে গেছে সেই সত্তার উপর, ওকে আর ওর থেকে পৃথক করে বার করে আনা যাবে এমন মনে হয় না।

অথচ দীর্ঘকাল ধরে ভেবে এসেছি বার করে আনাটা আমার ইচ্ছাধীন। যখন প্রয়োজন ফুরোবে, তখন ওই খোলসটাকে ভেঙে ফেলে বার করে আনব আমার আমিটাকে। এখন প্রয়োজন রয়েছে, এখন আমাকে ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতে হবে।

এই ছদ্মবেশ যেদিন ভেঙে ফেলব, সেদিন প্রকাশিত হব, বিকশিত হব, উদ্দাম হব, প্রমত্ত হব। সেদিন হাততালি দিয়ে বলে উঠব সবাইকে, 'দেখ, এতদিন কেমন ঠকিয়ে এসেছি তোমাদের। তোমাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে কেমন ছল করেছি।'

সেই অনাগত দিন-রাত্রিকে চিন্তা করতে করতে আমার এই ব্রহ্মচর্যে শীর্ণ দেহটার মধ্যেকার প্রবাহিত রক্তস্রোতে ঘুঙুর বেজেছে দ্রুত ছন্দে। গভীর রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থির পদচারণায় জেগে কাটিয়েছি।

জেগে কাটিয়ে আর একজনের চোখে নিজেকে দেখে থরথরিয়ে কেঁপেছি, দেহটাকে নিয়ে জর্জরিত হয়েছি, তার খাদ্য যোগাতে না-পেরে দিশেহারা হয়ে মাঝরাত্রে স্নানের ঘরে গিয়ে শাওয়ার খুলে মাথা পেতেছি।

চুলে-ভরা মাথাটা ভিজিয়ে ভিজিয়ে জলের সেই ধারাবর্ষণ গড়িয়ে পড়ছে আমার অনাবৃত বুকে পিঠে, গড়িয়ে পড়েছে আরও নীচে পা বেয়ে অনেক—অনেকক্ষণ ধরে। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রক্ত, থেমে গেছে ঘুঙুরের ঝমঝমানি। ঘরে এসে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে, ভিজে চুল বালিশে ছড়িয়ে সাধনা করেছি উধাও হয়ে যাওয়া ঘুমকে ফিরিয়ে আনবার।

আমার এই ছোট্ট ঘরখানার অপর কোনো অংশীদার নেই, তাই আমার এই নৈশচারণের সাক্ষী থাকে না। যদিও জানি আমার মায়ের মনটা ভেঙে গিয়েছিল আমি হঠাৎ তাঁর শয্যাংশ ছাড়তে চাওয়ায়। করুণ করুণ মুখে বারবার বলেছিলেন তিনি, 'শুধু রাতটুকু শুবি বৈ তো নয়, ভোরবেলা উঠে নিজের কাজ করিস না বাপু!'

কিন্তু মা-র সে অনুরোধ আমি রাখিনি।

আমার যে মমতা হয়নি তা নয়, আমি মায়ের কোলের মেয়ে, জন্মাবধি বাইশ বছর বয়েস পর্যন্ত মায়ের কাছেই শুয়েছি, নতুন কোনো ভাগীদার এসে আমাকে স্থানচ্যুত করেনি, তাই বোধ হয় বড়ো বেশি শূন্যতা বোধ হয়েছিল মা-র।

কিন্তু কি করা যাবে?

বিয়ে হয়ে বরের ঘরে চলে যেতে পারতাম তো এতদিনে! তখন মা-র সেই শূন্য শয্যা পূর্ণ করতে কে আসত? এই ভেবেই মনকে শক্ত করে নিয়েছিলাম আমি।

বাবা বেঁচে থাকতে মা আর আমি বড়ো একটা চৌকিতে শুতাম, বাবা তাঁর সেই বিয়ের সময়কার ফুল-পাখিদার পালঙ্কে। বাবা মারা যাবার পর মা পালঙ্কটাকে খুব মূল্যবান বলেই দাদার ঘরে নিইয়ে দিলেন। তখন দাদার বিয়ের কথা চলছিল, শুধু বাবা মারা যাওয়ার জন্যে পিছিয়ে গিয়েছিল কিছুটা।

মা বলেছিলেন, 'এই খাটে আমার ফুলশয্যে হয়েছিল, আমার খোকারও হবে।' কিন্তু মা-র সেই সাধ পূর্ণ হয়নি, দাদার শ্বশুরবাড়ি থেকে সাদা পালিশের জোড়াখাট পেল দাদা, বাবার খাট ঠেলামারা হয়ে পুরনো ঘরে ফিরে এল।

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'খোকা তো নিল না, যখন আমার ছোটোজামাই আসবে, এই খাটে বিছানা করে দেব।' হেসে বলতাম 'ছোটোজামাইয়ের স্বপ্নটা একটু কম করে দেখ মা, স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে।'

মা রেগে উঠে বলতেন, 'কেন? কী ভেবেছ তুমি? বিয়ে করবে না?'

'করব না এমন প্রতিজ্ঞা করছি না', হেসে বলে উঠতাম, 'তবে তোমার জীবদ্দশায় নাও হতে পারে।'

মা বলতেন, ক্রুদ্ধ আর গম্ভীর গলায়, 'তা বেশ। তাহলে খোকাকে বলে যাব, যেন এই খাটখানাতে চাপিয়েই শ্মশানে নিয়ে যায় আমায়।'

আমি মায়ের রাগ দেখে হেসে ফেলতাম। বলতাম, 'তাহলে তো তোমার ছেলের কাঁধে চড়া হবে না মা, গোটা বারো অন্তত মুটে ডাকতে হবে।'

বাস্তবিক সেকেলে সেই ফুল-লতা-পক্ষীদার আর গুমো গুমো পায়া দেওয়া ওই পালঙ্কটা একেবারে রাক্ষুসে ভারী। কিন্তু পালঙ্কটা আমরা না-পছন্দ বলেই তো মা-র ঘর ছাড়িনি সত্যি, আসলে আমার দেহ-মন নির্জন রাত্রির স্বাদের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মা যখন শুতে এসে তাঁর ঘামে-ভেজা আর স্নেহে-ভেজা হাতটা আমার গায়ের উপর রাখতেন, স্বীকার করতে লজ্জা হলেও স্বীকার করব, মনটা কেমন একটা বিরস স্বাদে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠত। অথচ জানতাম মা-র মনের মধ্যে একটু প্রত্যাশার প্রতীক্ষা। জানতাম, মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আশা করতেন আমিও তাঁর গায়ের উপর একটি হাত রাখি।

সেই বিনিময়ের সূত্রে মা একটু সাহস সঞ্চয় করতে পারেন, আমার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসতে পারেন, ফিসফিসিয়ে দু'টো সুখ-দুঃখের কথা কইতে পারেন।

সুখের নয়, দুঃখেরই।

বউদি আসার পর থেকে মা-র যে চিরদিনের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব-গৌরব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সে দুঃখকে মা বহন করছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই যেন পরিপাক করে নিতে পারছেন না। অপরিপাকের সেই গ্লানি ব্যক্ত করে কিছুটা হাল্কা হতে চান মা। কিন্তু কেন জানি না, আমার সহানুভূতি আসে না, আমার ওই ফিসফিসিনি অসহ্য লাগে। মা-র ওই সহানুভূতি-প্রত্যাশী মনের বাহক হাতখানাকে ক্লেদাক্ত লাগে। যা অনিবার্য, যা চন্দ্র-সূর্যের নিয়মের মতোই অমোঘ, তার বিরুদ্ধে ওই প্যানপ্যানানিতে অরুচি আসে আমার, তাই মা-র সেই ভিজে ভিজে হাতখানাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে কৌশলে ঘুমের ভান করে পাশ ফিরি।

বুঝতে পারি মা ক্ষুণ্ণ হন, গভীরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলেন, স্বগতোক্তি করেন, 'বাবাঃ, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লি? এই তো কথা বলছিলি।'

আমাকে জেগে ঘুমিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকতে হয়, নড়বার উপায় থাকে না।

কিন্তু ওসব তো বর্তমান নয়, অতীত।

এখন তো আমি বারান্দার পাশের ওই ছোট্ট ঘরটায় আস্তানা গেড়েছি। যে ঘরটায় আমার বাবা যত রাজ্যের পুরনো পত্রিকা জমিয়ে রাখতেন, জমিয়ে রাখতেন ফুটপাত থেকে কেনা পুরনো বই। পত্রিকাগুলোকেও বাবা 'বই' বলতেন, তাই একফালি ঘরটাকে বলতেন লাইব্রেরি।

আমরা হাসতাম বাবার ঘরের ওই নামের বাহার শুনে, কিন্তু এখন বুঝতে পারি ওই বলাটুকুর মধ্যে দিয়েই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটাতেন বাবা। হয়তো এমন কতজনের জীবনেই হয়, অন্যজনের কৌতুকহাসির কারণ হয়েও সাধ মেটায়। লোকে সেই দুধের সাধ ঘোলে মেটানো দেখে 'আহা' না বলে বলে, 'আহারে!'

কিন্তু সে যাক। বাবার লাইব্রেরির সেই অমূল্য গ্রন্থরাজী ভাঁড়ারঘরের তাকে, চিলেকোঠার ঘরে চালান করে দিয়ে আমি নিজের জায়গা করে নিলাম। খাট-পালঙ্ক নয়, মাটিতে সতরঞ্চি পেতে সামান্য বিছানার সম্বলে শোয়া শুরু করলাম। বললাম, 'একা না শুলে আমরা ধ্যান-ধারণার সুবিধে হচ্ছে না।'

'ধ্যান-ধারণাই' তো বলতে হবে, কারণ আমি তো তখন ছদ্মবেশের খোলসে ঢুকেছি। শঙ্কর মহারাজ আমার নামকরণ করেছেন 'দেবী মা'।

প্রথম দর্শনের দিন থেকেই আমার উপর তাঁর অহেতুক অগাধ কৃপা। যেচে বললেন, 'কাল আমি একে দীক্ষা দেব।'

শুনে তো মা-র মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। মা থতমত গলায় বললেন, 'ও এমনি বেড়াতে এসেছে বাবা, ওর এখনও বে-থা হয়নি—'

মহারাজ বললেন, 'সবাই কি সংসার করতে আসে? আপনার এই মেয়ে ভগবতীর অংশ। একে উচ্চমার্গের পথে এগিয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য। জননীই প্রকৃত হিতকারিণী!'

এই ছেঁদো ছেঁদো কথা শুনে মনে মনে ভারী হাসি পেয়েছিল, বুঝলাম এইভাবেই ওঁরা শিষ্য নম্বর পাঁচশো পঞ্চান্ন বা ন'শো নিরানব্বই করে থাকেন।

কিন্তু মা ওই ছেঁদো কথায় ভয় পেলেন, মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'আচ্ছা বাবা, বাড়ি গিয়ে মেয়ের মন বুঝি—'

মা একরকম পালিয়েই এলেন আমাকে নিয়ে। বউদি বসে রইলেন তাঁর সদ্যবিধবা ছোটো-বোনকে নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে তার জন্যেই আসা। নচেৎ দাদা-বউদি কোনো মঠে এসে কোনো বাবা মহারাজের সামনে জোড়হস্তে বসে আছেন, এ দৃশ্যের মতো অকল্পনীয় দৃশ্য আর কি ছিল?

কিন্তু আশ্চর্য, সেই সদ্যবিধবা তরুণীর বিষাদাচ্ছন্ন মুখের দিকে নাকি দৃষ্টিপাতও করেননি মহারাজ। বউদি যখন কাঁদো-কাঁদো গলায় তার অবস্থা জানিয়েছিল, তখন শুকনো দুটো উপদেশ-বাণী দিয়েছিলেন, 'অদৃষ্ট, নিয়তি, প্রাক্তন কর্মফল' ইত্যাদি শব্দ-সংবলিত।

কিন্তু আমাকে কেন?

পরে বাড়ি ফিরে ভেবে দেখেছি—আমার মুখে-চোখে অবিশ্বাসের যে কৌতুকচ্ছটা খেলা করছিল, ওঁর ওই অহেতুক কৃপা তার বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ।

অনমনীয়কে আয়ত্তে আনতে পারাই তো শক্তির পরীক্ষা। বিরুদ্ধবাদীকে স্বমতে আনতে পারার মধ্যেই তো আত্মচরিতার্থতা। আমি যে ওঁর কথাগুলোকে 'ছেঁদো' ভাবছি, এটা ধরে ফেলে উনি রণক্ষেত্রে অবতরণ করলেন তূণে তীর ভরে। তাই আমার মধ্যে উনি ভগবতীর অংশ আবিষ্কার করলেন।

সেটাও বুঝে ফেলে আরও কৌতুকবোধ করলাম আমি, কিন্তু মা প্রমাদ গনলেন। মা বাড়ি ফিরে এসে বললেন, 'তোর আর তোর ওই বউদির সঙ্গে মঠে-ফটে যাবার দরকার নেই।'

এটাও কৌতুককর।

বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এই জীবনের কোন্ ঘটনাই বা কৌতুককর নয়। মঠটা বউদির আবিষ্কৃত বটে, কিন্তু মা-রই আকুলতা ছিল বেশি। বউদিরই বরং ইচ্ছা ছিল না তার নিজস্ব আবিষ্কৃত ভূমিতে তার 'প্রতিদ্বন্দ্বিনী'র প্রবেশাধিকার ঘটুক। কিন্তু সাধু-সন্ত দেব-দেবী তো কারও কেনা জিনিস নয়, কাজেই মাকে আর আমাকেও সঙ্গে নিতে হয়েছিল বউদি বেচারাকে।

তা তখন তাকে আমার বেচারাই মনে হয়েছিল। কারণ বউদি বেশ কয়েকবার বলেছিল, 'শানু লজ্জা পাবে।'

শানু অর্থাৎ শান্তি, বউদির সদ্যবিধবা বোন।

মা কিন্তু বউদির সে অনিচ্ছাকে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'সেকি জয়ন্তী, আমরা কি শানুর পর? বেবির সঙ্গে এক বয়সী, কতদিনের ভাব ওদের!'

হ্যাঁ, তখনও আমার নাম ছিল বেবি।

শঙ্কর মহারাজ না শুনে হেসে বলেছিলেন, 'নামের একটি অক্ষর আমি বদলে দেব। ধ্বনিটা ঠিক থাকবে, ছন্দটাও। শুধু একটি অক্ষর—বেবির বদলে 'দেবী'। দেবী মা।'

শুনে তখনই বউদির মুখটা ভারী হয়ে উঠেছিল। তবে তাতে আমি দোষও দেখিনি। সেটাই স্বাভাবিক। ওর অবস্থাটা হয়েছিল যেন 'যে এল চষে, সে রইল বসে'।

বউদিকে ব্যাজার করে আর আমাকে তোয়াজ করে তবে সেদিনকার অভিযান মা-র। হ্যাঁ, তোয়াজ করতে হয়েছিল। আমি রেগে রেগে বলেছিলাম, 'তোমরা যাচ্ছ যাও না, আবার আমাকে টানা কেন? ও সব আমার ভালো লাগে না।'

মা বললেন, 'একদিন গেলেই বা তোর কী এত লোকসান? শানু যাচ্ছে, তোর সময়বয়সী।'

জানি এটা মা-র একটা ট্রিক্। এই সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে কথা বলা। শানু বিধবা হয়েছে, শানু দুঃখী, অতএব শানুকে করুণা করা তোমার কর্তব্য, তাকে সঙ্গ দেওয়া তোমার মানবিকতা বোধের পরিচায়ক। এই আর কি।

কিন্তু আসলে মা-র উদ্দেশ্য ছিল অন্য তা বুঝেছিলাম। মা সেই মহারাজের কাছে জানতে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর মেয়েটির কবে বিয়ের ফুল ফুটবে। সে ফুল যে অনেকদিন আগেই ফুটিয়ে বসিয়ে রেখেছে তাঁর মেয়ে, সে কথাটি তো জানা ছিল না মা-র!

তাই ব্যাকুল হচ্ছিলেন।

আর উৎখাত করছিলেন দাদাকে।

তা শালী বিধবা হবার আগে পর্যন্ত দাদাও চেষ্টার ত্রুটি করেনি, উঠে পড়ে লেগে পাত্র যোগাড় করে এনে আমার সামনে ধরে দিয়েছে, আমার সঙ্গে মিশতে দিয়েছে, আমাকে তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে দিয়েছে। কিন্তু দাদাকে 'সফল' হতে দিইনি আমি, যে কটাকে এনেছে, সব ক'টাকেই নাকচ করে দিয়েছি।

অবিশ্যি মা যতই মেয়ের বিয়ে বিয়ে করুন, এই ধরনটা মা-র পছন্দ হত না। সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে মেয়ের অষ্টাঙ্গে গহনা পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে আর জানলামুখো করে বসিয়ে কনে দেখনোটাই ছিল মা-র আদর্শ। তারপর তো দেনা-পাওনার প্রশ্ন আছেই। কন্যাপক্ষ যে দেনদার, এবং বরপক্ষ পাওনাদার, এটাকে নিতান্তই স্বাভাবিক রীতি বলে মনে মনে গ্রহণ করতেন, এবং এই ভাবটাই পোষণ করতেন—ওই সব স্বাভাবিক পদ্ধতির অভাবেই বিয়েটা ঘটছে না। আর এ সন্দেহও পোষণ করতেন—টাকাকড়ি খরচা হবার ভয়েই বউদি এই ফ্যাসানটির আমদানী করেছে।

হ্যাঁ, ফ্যাসানটি বউদিরই আমদানী।

বউদির সঙ্গে দাদার 'ভাবের' বিয়ে বলে, বউদি ঘটকে-ঘটানো বিয়েকে খুব নিম্নশ্রেণীর বলেই মনে করে।

কিন্তু এটাই বা কি?

মনে মনে একচোট হেসে নিতাম আমি।

তুমি দাদা, আমার হিতৈষী অভিভাবক, কুল-শীল মিলিয়ে কেরিয়ার বিবেচনা করে পাত্র ধরে এনে তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে দিলে আমায়, অথবা দুখানা টিকিট কেটে হাতে গুঁজে দিয়ে সিনেমা হল-এ পাঠিয়ে দিলে, তার নাম পূর্বরাগ?

আমার তো এটাকে ক্যারিকেচার মনে হত।

বার কয়েক নাকচ করে, অথবা বলতে পারা যায়, নাকচ হয়ে হয়ে (অর্থাৎ আমার ব্যবহারে নাকচ করতে বাধ্য হত তারা) যখন দাদা বউদি এবং মাকে বিরক্তির সীমারেখায় এনে ফেলেছি, আর মা জোরগলায় ঘোষণা করেছেন 'এসব ফ্যাশানেপনায় বিয়ে হবে না—' তখন শানু আমায় উদ্ধার করল। বিধবা হয়ে এসে তার দিদির গলায় পড়ে ননদের বিয়ের থেকে অনেক বেশি গুরুতর সমস্যার জালে জড়িয়ে ফেলল বউদিকে।

মা নেই বউদির, তাই বোনকে কাছে টেনে না এনে পারল না। আমি দৃশ্যপট থেকে একটু সরে গেলাম।

তবে সরে গেলে মা-র চলবে কেন?

তাই মা বউদির সঙ্গ ধরে শঙ্কর মহারাজের কাছে ছুটেছিলেন মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী শুনতে।

কিন্তু এ কী বাণী শুনলেন?

সবাই কি সংসার করতে আসে? কিছু কিছু মানুষকে অধ্যাত্ম পথের পথিক হতে হয়।

মা ভয় খেয়ে বললেন, 'তোকে আর মঠে-ফটে যেতে হবে না।'

তিন

মা-র ওই নিষেধবাণীতে আর একবার কৌতুক বোধ করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা দুষ্টুমি খেলে গেল। ভাবলাম এই তো বেশ একটা পথ পাওয়া যাচ্ছে—মার 'বিয়ে বিয়ে' উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার। কিছুদিন অন্তত এই পথে খেলানো যায় মাকে।

আর মনের অগোচর পাপ নেই, বউদির উপর টেক্কা দেবার এই একটা সুযোগ পেয়েও বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বউদি গেল তার বোনকে নিয়ে আকুলতা পেশ করতে, আর বিজয়িনী হয়ে ফিরে এলাম আমি, হলাম 'দেবী মা', হলাম ভগবতীর অংশ, এটা অহমিকা পরিতৃপ্তির একটা সুখ এনে দিল বৈকি।

তাই আমি অবহেলাভরে বললাম, 'কেন? যেতে ভয় কি? শঙ্কর মহারাজ কি আমাকে স্বর্গের পথে চালান করে দেবেন?'

মা বললেন, 'থাক বাবু, ঠাট্টা-তামাসা। ওদিকে আর নয়। সাধু-সন্নিসীরা বড়ো সর্বনেশে জিনিস। ওঁদের দিকে না-মাড়ানোই ভালো।'

হেসে ফেললাম।

বললাম, 'মা, এই ঘণ্টাকতক আগে তুমি আমায় গঞ্জনা দিয়েছ, 'ওদিক' মাড়াতে রাজী হচ্ছিলাম না বলে।'

'সে আলাদা', মা-র গলায় অসন্তোষ, 'সে এমনি একবার দর্শন করতে যাওয়ার কথা বলেছি।'

'আমি তো ভাবছি কাল গিয়ে দীক্ষাটা নিয়ে নেব।'

'বকিসনে, থাম।'

'বকিসনে কি মা? অত লোকের মধ্যে থেকে তোমাদের মহারাজ আমাকেই সিলেক্ট করে বসলেন, এটা কি কম মজার? আমি কাল যাচ্ছি—'

'কুমতলব ছাড় বেবি, আমাকে জ্বালাতন করতে ওসব গোলমেলে কাণ্ড করতে বসিসনে। কে জানে বাবা ওঁরা সব অন্তর্যামী কিনা, ঠাট্টা-তামাসা না-করাই ভালো।'

'বেশ তো, অন্তর্যামী কিনা তার পরীক্ষাটা হয়েই যাক।'

'আগুন নিয়ে খেলতে চেষ্টা করিসনে বেবি!'

হেসে উঠলাম।

বললাম, 'তুমি ভাবছ আগুন, আমি তো ভাবছি স্রেফ ফুলঝুরি।'

তারপর বউদি এল, থমথমে মুখ, শানুকে নিয়ে ঝপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তাই যায় অবশ্য। শানুকে নিয়ে বেড়াতে যায় সর্বত্র, দোকানে, সিনেমায়, অনাত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে, আর বুঝতে আটকায় না বেশ সহজভাবেই যায়, কিন্তু বাড়ি ফিরলেই দুই বোনেই মুখটা বিষণ্ণ করে ফেলে। আত্মীয়-বাড়িতে যায় না ওই জন্যে।

অবশ্য শানু এটা করতেই পারে। জানি, শোকের থেকে লজ্জটাই বড়ো হয়ে ওঠে এ বয়সে। ও যে স্বামী মরে যাওয়া সত্ত্বেও হাসছে, গল্প করছে, সিনেমা দেখছে, এটা স্বচ্ছন্দে করতে লজ্জা করত ওর।

অথচ ওর যা বয়েস, তাতে শোক নিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া ক'দিনই বা বিয়ে হয়েছিল ওর? কতইবা ভালোবাসা পড়েছিল বরের উপর?

বউদি বলত, 'ওর মনটা অন্যমনস্ক রাখতে নিয়ে নিয়ে বেরোই।' দাদাও সেই সমীহতে তটস্থ থাকে, আর শানু মুখের উপর একটা বিষণ্ণতার প্রলেপ মেখে মনকে অন্যমনস্ক রাখবার সাধনা করে চলে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওই 'মহারাজ' আবিষ্কার করাও বউদির আর এক চাল। যেন অন্ধস্নেহ কেবলমাত্র অসার আমোদে নিমজ্জিত রাখছে না বিধবা ছোটোবোনকে, তার উন্নতির পথের সহায়তা করছে। খুঁজে খুঁজে বার করে ফেলেছে তার মুক্তির উপায়।

চার

প্রথম দিকে আমি একদিন বলে ফেলেছিলাম, 'অন্যমনস্ক রাখতে এত রকম উপায় আবিষ্কার না করে শানুর আর একবার বিয়ে দাও না বাবা! জীবনের কী-ই বা হয়েছে ওর!'

বউদি ভাবলেন, এটা বোধহয় ওঁর শোকে ভেঙে-না-পড়া বোনকে ব্যঙ্গ করা হল, তাই রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন, 'কুমারী মেয়েরই একটা বর জোটে না এদেশে, তার আবার বিধবার।'

এই কুমারী কন্যাটার উল্লেখ অবশ্য আমার উপরই কটাক্ষপাত, তাই মৃদু হেসে চুপ করে গেলাম।

যাই হোক, সেদিন বউদি যখন সাধুর মঠ থেকে ফিরে এল, মুখটা আরও থমথমে। সিনেমা দেখে ফিরে আসার থেকেও অনেক বেশি। আর ঘরে ঢুকে আদৌ বেরোলই না।

খাবার জন্যে ডাকতে গিয়ে মা প্রায় অপমানিত হয়েই ফিরে এলেন।

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওখানে কি প্রসাদ পেয়েছ?'

বউদি ঘর থেকে ছুঁড়ে মরালেন, 'অভাগারা প্রসাদ পায় না মা!'

এ প্রসাদ অবশ্যই অন্য অর্থবাহী।

মাকে ডেকে বললাম, 'ইচ্ছে করে অপমান হতে যাও কেন?'

'কি করে জানব বল? খেতে ডাকতে হবে তো? না-খেয়ে থাকবে?'

'একদিন না-খেলে মানুষ মরে না।'

'একদিন কেন, নিত্যই তো খায় না। বোনের জন্যে নিজের দেহটা পাত করছে।'

বড়ো করুণা হল মায়ের উপর।

ভাবলাম কী অবোধ, কী অবোধ!

কিন্তু এই অবোধের শান্তিটুকু নষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। তা ছাড়া যদি মাকে বলে বসতাম অত ভয় করবার হেতু নেই মা, হোটেল-রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার আসে, দুই বোনে তার সদ্ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে মা জীবনে আর কোনোদিন শানুকে শ্রদ্ধার বা স্নেহের চক্ষে দেখতে পারতেন না। কারণ সেটা হত মা-র চিরায়ত সংস্কারের ওপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা।

সেটা আমি চাই না।

শানুকে আমি ভালোবাসি। বয়সে আমার সমান-বয়সী হলেও, ওকে আমার অনেক বালিকা মনে হয়। ও অন্যের ইচ্ছের পুতুল হতে পারে। ওর স্বামী থাকলে সেই ইচ্ছের পুতুলটিকে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারত। কিন্তু সেটা ভাগ্যে নেই লোকটার। তাই ফট্ করে মরেই গেল।

এখন তাই শানু তার দিদির ইচ্ছের পুতুল হয়ে কোনোদিন দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে, কোনোদিন সিনেমা যাচ্ছে। কখনও আশ্রমে দীক্ষা নিতে ছুটেছে, কখনও লুকিয়ে হোটেলের চপ-কাটলেট খাচ্ছে।

জানি, বউদি এটা মমতার বশেই করে। ওই ছোট্ট বোনটাকে, যে নাকি মাছ-মাংস ব্যতীত এক গ্রাস খেতে পারত না, তাকে শাকপাতা খাইয়ে রাখতে প্রাণ ফেটে যেত তার, তাই এই লুকোচুরি। সে লুকোচুরিটাকে ঘৃণা করে করুণা করতাম আমি। আর বউদি ভাবত বুদ্ধির কৌশলে ও আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারছে।

শানুকে ভালো না বাসলে হয়তো কোন্‌দিন বউদির এই গোপনতাকে ধিক্কার দিয়ে বসতাম, কিন্তু আগেই বলেছি, শানুকে আমি ভালোবাসি। দাদার বিয়ে হয়ে ইস্তক তো দেখছি। ভারী নিরীহ আর ভীতু ভীতু মেয়েটা। ঠিক তার দিদির বিপরীত!

কিন্তু সেদিন আমার হঠাৎ কেমন রোখ চেপে গেল, ওই মেয়েটার প্রতিপক্ষ হয়ে বসলাম।

অথবা ওই মেয়েটায়ও নয়, ওর দিদির। কিন্তু বহির্দৃশ্যে ওই মেয়েটারই প্রতিপক্ষ হলাম।

ওকে ডিঙিয়ে আমি শঙ্কর মহারাজের কৃপা অর্জন করে ফেলব।

আর আমি সংকল্প করলাম,—ওদের নাকের সামনেই দীক্ষা নিয়ে আসব। আর দেখিয়ে দেব কৃচ্ছ্রসাধন কাকে বলে।

এই একটা দিক। তাছাড়া, আরও একটা দিক আছে। আর সে কথা তো আগেই বলেছি। এই সুযোগে একটা ছদ্মবেশ নিয়ে আমি আমার মা-র হাত থেকে রক্ষা করব আমাকে।

তাই পরদিন মা-র শত আপত্তি এড়িয়ে সেই শঙ্কর মহারাজের মঠে গিয়ে হাজির হলাম, দীক্ষা নিয়ে এলাম।

প্রাণ ধরে আমায় একা ছাড়তে পারেননি মা, সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি মা-র তোয়াক্কা রাখিনি। সোজা মহারাজের সামনে গিয়ে বলেছিলাম, 'দীক্ষা নিতে কি কি লাগবে বলুন।'

আমার এই প্রায়-দুর্বিনীত উক্তিতে মহারাজের চেলা-চামুণ্ডারা বোধকরি চমকে উঠেছিল, কিন্তু মহারাজের চক্ষে বরাভয়।

কিন্তু শুধুই কি বরাভয়?

কেমন একটা পুলক-চাঞ্চল্যেরও আভাস ছিল না কি? কিসের সেই পুলক? বিজয়-গৌরবের? বোধহয় তাই। বোধহয় ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন আমি তাঁর মহিমায় অভিভূত হয়ে ছুটে গিয়েছি। অতএব পরীক্ষা হয়ে গেল, অন্তর্যামী নয়।

পাঁচ

সেই শুরু।

মা আমার সঙ্গে ফিরলেন চোখের জল মুছতে মুছতে।

আমি জোরে জোরে হেসে বললাম, 'কী হল? কান্নার কী হল?'

মা ডুকরে উঠলেন, 'কোথায় তুই বিয়ে হয়ে বরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাবি, তা নয় সন্নিসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে এলি!'

'বাঃ, তাতে খারাপটা কি?'

'খারাপ নয়?'

'আমি তো কিছু খারাপ দেখছি না। কোনো বন্ডে তো সই করিনি যে, জীবনে কখনও সংসার করব না, অর্থাৎ বিয়ে করব না।'

'সই করার বাকিই বা কি? বললেন তো, আমিষ খাদ্য খাওয়া চলবে না, নিত্য হাজার জপ করতে হবে—'

'জপ করতে হবে না তো—' আমি হেসে উঠে বললাম, 'জপের খাতা তৈরি করে তাতে হাজার বার ইষ্টনাম লিখতে হবে।'

'সে একই।'

'উহুঁ, এক নয়। চোখ বুজে জপ করার থেকে অনেক সহজ। বললেন শুনলে না, কলিতে সাধনার পদ্ধতি সহজ।'

'কিন্তু এই বয়সে এসব তুই করতে যাবি কেন?'

আমি মা-র জ্বালা দেখে খুব আমোদ পেলাম। আর কারও জ্বালাতে সেইমাত্র শুনে আসা পরমার্থিক বাক্যি কিছু বর্ষণ করে ফেললাম, 'সাধনার কি বয়েস আছে মা? বয়েস তো এই দেহটার, আত্মার বয়েস তুমি জান? জান কি কত কোটি কোটি বছর তার আসা-যাওয়া চলছে?'

মুখস্থ করার বিদ্যেটা চিরদিনই আমার প্রবল। বাবা আমার এ বিদ্যেটায় ভারী খুশি ছিলেন। বলতেন, 'আমার আর তিনটে ছেলেমেয়ে রাবিশ। একটা লাইন মুখস্থ রাখতে পারে না। আজ শিখলে কাল ভোলে। বেবিই শুধু—'

আসল কথা 'মুখস্থ' শব্দটা ভুল। বলা উচিত, 'অন্তরস্থ'। অন্তরস্থ করতে না পারলে মুখস্থ থাকে না।

তা যে শব্দের যে অর্থই হোক, বাবা আমায় রাশি রাশি কবিতা মুখস্থ করাতেন, এবং সন্ধেবেলায় বসে বসে সেই সব আবৃত্তি শুনতেন। শুনতেন আর বাহবা দিতেন। বলতেন, 'আশ্চয্যি, কমা-সেমিকোলনটি পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয় না।'

তাই গুরু-উপদেশবাণীও আমার একবার শুনেই নিখুঁত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মা কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে ভয় পেয়ে গেলেন। মা ভাবলেন সত্যিই বুঝি মা-র এই আদুরে মেয়েটার উপর ভগবতীর ভর হল। সংসারী মানুষের ভূত আর ভগবান দুইয়ের উপরই সমান ভয়। তাই মুখে যতই বলুক ভগবানে ভক্তি হোক, সত্যি ভক্তির পরিচয় পেলে আতঙ্কিত হয়। ভাবে ওই বুঝি ছাড়ল সংসার।

মা-র এই আতঙ্কে আরও কৌতুক লাগল, বললাম, 'হয়তো পূর্বজন্মে আমি একটু কাজ এগিয়ে রেখেছিলাম, তাই এ জন্মে চট করে হয়ে গেল যোগাযোগ। নইলে শানুকে তো—'

ছয়

না, শানুকে দীক্ষা দেননি শঙ্কর মহারাজ। বলেছিলেন, 'এর এখনও সময় আসেনি।'

বউদি ক'দিন ঘোরাঘুরি করল, তারপর আশ্রমে আমার আদর আর আধিপত্য দেখে বিতৃষ্ণ হয়ে ছেড়ে দিল। রাগ করে বোনকে তার ক'মাসের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। ক্রমশ ক্লান্তও হয়ে উঠেছিল বোঝা যাচ্ছিল। রাত্রে স্বামীসান্নিধ্য ত্যাগ করে বোনকে নিয়ে পড়ে থাকা, কতদিন চলতে পারে?

এ একটা ছুতো হল।

মাকে আর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'মহারাজ ওভাবে ফিরিয়ে দেওয়ায় বড্ড মন-ভাঙা হয়ে পড়েছ, যাক, দু'দিন ঘুরে আসুক।'

আমি সেদিন আর-একবার ওর বিয়ের কথাটা তুললাম। দাদার উপস্থিতিতে। বললাম, 'ভাঙা মন জোড়া লাগাতে ওকে নিয়ে যা-তা না করে আর একবার বিয়েরই চেষ্টা কর না বাপু!'

দাদা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার মানে?'

'মানে তো কিছু শক্ত নয় দাদা! বেচারা তো বলতে গেলে কুমারীই। নিজের বোনের জন্যে তো পাত্র খুঁজছিলে, সেই খাটুনিটা না হয়ে বউয়ের বোনের জন্য খাটলে।'

'থাক, তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না', ঝেঁজে উঠল বউদি, 'তুমি ঊর্ধ্বলোকের জীব, এসব তুচ্ছ চিন্তায় না-থাকাই ভালো।'

তখন বলেছিল।

তখন ওরা অভিভূত হয়নি।

দাদা বলেছিল, 'নিজের বোনের জন্যে খোঁজাটা ছেড়েই দিতে হবে তাহলে?'

'নিশ্চয়।'

'দেবী মা হয়েই থাকবে ঠিক করেছ?'

'দেখা যাক না।' বলে হাসলাম মনে মনে। মনে ভাবলাম, আমার দিন আসুক, আসুক দুরন্ত অমিতাভ আফ্রিকার অরণ্য থেকে সোনার তাল কুড়িয়ে নিয়ে। তখন জানাব কেন তোমায় মুক্তি দিচ্ছি বোনের বর খোঁজার দায় থেকে।

সাত

হ্যাঁ, দুরন্তই ওর আসল নাম, ডাক-নাম। অমিতাভটা পোশাকী নাম। বলতাম, 'পোশাকী নামটা তোমার সম্পর্কে স্রেফ অচল। এই এইটেই হচ্ছে ঠিক। দুরন্ত!'

ও বলত, 'ঠিক তো? তাহলে আমার দোষ নেই, নামের উপযুক্ত কাজই করছি।'

আমি ছিটকে সরে আসতাম, বলতাম, 'রক্ষে কর, ক্ষ্যামা দাও। শ্রীযুক্ত অমিতাভবাবুই হও।'

'নাঃ। দু'বার দু'রকম নির্দেশ চলবে না।'

বলতাম, 'তাহলে আমারও থাকা চলবে না।' বলতাম, তবু বসে থাকতাম। কে যেন পেরেক দিয়ে পুঁতে রাখত আমায় সে-ঘরের মাটির সঙ্গে। যদিও সেই ঘরটায় দুরন্তর কোনো অধিকার ছিল না। দুরন্ত হচ্ছে রমেশবাবুদের আশ্রিত। যে রমেশবাবুর কাছে আমি পড়তে যেতাম। রমেশবাবু আমাদের স্কুলের ইংলিশের টিচার।

এমন কিছু বড়োলোক নয় রমেশবাবু, তবু একটা ছেলেকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন, তার লেখাপড়ার ভার নিয়েছিলেন। বিনা স্বার্থেই নিয়েছিলেন।

কিন্তু রমেশবাবুর গিন্নি এটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনির মনোভাব—'বেশ, আছে থাক, কিন্তু কিছুটা উসুল হোক।'

সেই উসুলটা করতেন তিনি চাকর তুলে দিয়ে।

ঝি না এলে বাসনও ধুইয়েছেন দুরন্তকে দিয়ে। নিজের অসুখ করলে ভাতও রাঁধিয়েছেন।

আমি রেগে যেতাম, বলতাম, 'এসব তুমি সহ্য কর কি করে?'

ও হেসে বলত, 'কী হয়েছে? গ্রামের বাড়িতে মায়ের অসুখ করলে তো কতদিন রান্না করেছি, কাপড় কেচেছি, বাসনও মেজেছি।'

'সেটা আর এটা এক নয়।'

'এক ভাবলেই এক।'

এই বলিষ্ঠতা ছিল ওর চরিত্রে।

আশ্রিতের কর্তব্যবোধ ছিল, আশ্রিতের ক্ষোভ-অভিযোগ ছিল না। ছিল না চিত্তদৈন্য, ছিল না অভিমান বা অপমান জ্ঞান। যেন নিজের বাড়িতেই আছে। ও যেমন স্বচ্ছন্দে স্নানের ঘর থেকে হাঁক পাড়তে পারত, 'কাকিমা, শীগগির! শীগগির! ভাতটা রেডি করে ফেলুন।' তেমনি স্বচ্ছন্দেই বলতে পারত, 'ঠ্যাংটা বাড়ান তো একটু, মালিশটা করে দিয়ে যাই। নিজে তো আর করবেন না। মালিশের ওষুধ টেবিলে পড়ে থাকলেই কি বাত সারবে?'

এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ছিল বলেই বোধহয় ও প্রথম দিনেই আমায় 'তুমি' বলেছিল।

ও তখন রমেশবাবুর জুতোটা নিয়ে পালিশ করছিল, বলল, 'কাকাকে খুঁজছ, কাকা তো বাড়ি নেই। বসতে চাও তো বসবার ঘরে বস।'

আমি জানতাম না যে, রমেশবাবুর বাড়িতে এমন কোনো ছেলে আছে। ভাবলাম চাকর। আর ভাবলাম এতই গাঁইয়া যে, 'তুমি আপনি'র ভেদ জানে না। কিন্তু দেখলে কে বলবে চাকর!

সেদিন চলে এলাম।

পরদিন আর একটু দেরিতে গেছি, দেখি দিব্যি ফর্সা কাপড়-জামা পরে বেরোচ্ছে, হাতে বইয়ের গোছা। বললাম, 'স্যার বাড়ি আছেন?'

'আছেন।'

'বই নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

'কলেজে, আর কোথায়?'

'কলেজে? তুমি কি কলেজে পড় নাকি?'

'তা নইলে গ্রাম থেকে এলাম কি করতে?'

'তুমি' বলা হয়ে গেছে আর 'আপনি' চলে না, তাই বললাম, 'মাস্টারমশাইয়ের কোনো আত্মীয় হও বুঝি?'

'আত্মীয়?' ও হাসল।

বলল, 'আমি ওঁর আত্মীয় হই না, তবে উনি আমার আত্মীয়।'

চাকর যে নয়, তা বুঝে ফেলেছিলাম। আর ওর ওই ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল চোখ দুটো যেন আমাকে তীব্রভাবে সম্মোহিত করছিল।

তাই কথার পিঠে কথা বাড়ালাম, 'তুমি ওঁর আত্মীয় নয়, উনি তোমার আত্মীয়? সেটা আবার কি রকম?'

'বুদ্ধি থাকলে বুঝতে।'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল।

বললাম, 'বুদ্ধি না থাকতে পারে, তবে কথার একটা মানে থাকা দরকার।'

'মানেটা বুঝতে না-পারাই তো আশ্চয্যি। থাক, আর মানে বুঝতে হবে না। দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'দেরি! ইস! কলেজে পড়ে না হাতি! বই নিয়ে কাউকে দিতে যাওয়া হচ্ছে।'

'তা হলে তাই।'

বলে হেসে চলে গেল ও।

ও যদি সতেজে প্রতিবাদ করত, তাহলে আমার অভিমানবোধ এমন ক্ষুণ্ণ হত না। আর সেই সূত্রে আরও কথা চালাতে পারতাম। অবচেতন মনে যা চাইছিলাম। কিন্তু ও অবজ্ঞা করে চলে গেল।

তখন হায়ার-সেকেন্ডারির জন্য টেস্টে অ্যালাউ হয়েছি, স্যার বলছেন খুব নাকি ভালো পড়ছি আমি, তাই মনের মধ্যে বিরাট আত্মমর্যাদাবোধ, তাই এই অবজ্ঞাটা প্রাণে লাগল। ভাবলাম, রোসো শোধ নিচ্ছি!

আট

সেই প্রথম পরিচয়।

শোধ নেবার সংকল্পে দৃঢ় হলাম।

তারপর জানলাম ও রমেশবাবুর বাল্যবন্ধুর ভাইপো, দীনহীন আশ্রিত। জানলাম ওর নাম 'দুরন্ত'। জানলাম আশুতোষে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। জানলাম যেমনি সপ্রতিভ, তেমনি জলি।

তারপর জানলাম ওকে ভালোবেসে ফেলেছি।

ও বলত—মানে পরে, যখন আমি মাকে নানা মিথ্যা কথায় ছলনা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ওর সঙ্গে লুকিয়ে বেড়াতে পালিয়ে যাচ্ছি।

কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন, সুবিধে কিছু সঞ্চয় হয়েছে। কোনোদিন বলি বান্ধবীর বাড়িতে পড়তে যাচ্ছি, কোনোদিন বলি লাইব্রেরি যাচ্ছি। কোনোদিন হয়তো—অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনো মেয়েই যা যা বলত, যেভাবে ছলনা করত, ঠিক তাই করতাম। নতুন কিছু না।

ছলনা করে বেরিয়ে পড়ে আবার ওর সঙ্গে ছলনা করতাম। বলতাম, 'আর এরকম চলবে না। মা জেনে ফেলেছেন।'

তখন বাবা মারা গেছেন, শুধু 'মা'। মা-র কথাই বলতাম।

ও বলত, 'লুকোচুরির কি আছে? বললেই পার স্পষ্ট করে।'

'আহা রে! কী বলব শুনি?'

'কেন? বলবে, 'মা, মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির জুতো-ঝাড়া চাকর সেই দুরন্তটার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। তাই তাকে নিত্য একবার না-দেখলে ছটফটিয়ে মরি।'

রেগে বলতাম, 'আমি তোমায় বলেছি কোনোদিন জুতো-ঝাড়া চাকর?'

'বলনি, ভেবেছ।'

'আহা একেবারে অন্তর্যামী! কে কি ভেবেছে—'

'অন্তর্যামীই তো।' হেসে উঠত ও, 'না হলে সেই প্রথম দিনেই কী করে বুঝলাম, মেয়েটা স্কুলের বালিকা হলে কি হয়, রীতিমতো পরিপক্ক। একটা ছেলেকে দেখল আর প্রেমে পড়ল! একেবারে অগ্নিতে পতঙ্গবৎ।'

'ইস্, অহমিকার আর শেষ নেই! দেখল আর প্রেমে পড়ল!'

'পড়নি তো এত ছটফটানি কিসের?'

'ছটফটানি আবার কি?'

'ও', নেই বুঝি? আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল থেকে আর আসবার দরকার নেই।'

'বেশ।'

ও হঠাৎ দুরন্ত বেগে এক সেকেন্ডের মধ্যে আমার চোখের কাজল, ঠোঁটের রং, খোঁপার বাঁধুনী, সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে বলত, 'এই খবরদার! অ্যাবসেন্ট হলে চলবে না। আমার দরকার আছে।'

রেগে যেতাম, হাঁপিয়ে যেতাম, বলতাম, 'কে তোমার নামটা রেখেছিল?'

'কি জানি। নিশ্চয়ই কোনো দূরদ্রষ্টা ঋষি।'

'কক্ষণো আসব না আর।'

'পাগল! কালই আসবে আবার আরও সেজে-গুজে।'

'এইভাবে ঘোচাতে?'

ও একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলত, 'এ আর কিই বা!' ওর সেই চোখদুটোয় যেন আগুন জ্বলে উঠত।

আমার বুকটা কেঁপে উঠত।

পালিয়ে আসতাম।

ভাবতাম, নাঃ, সত্যিই আর নয়।

কিন্তু ক'দিন থাকত সে প্রতিজ্ঞা?

নয়

ছেলেমানুষী মজা থেকে ক্রমশ জ্বলে ওঠে বাসনার আগুন, তীব্র থেকে তীব্রতর হয় আকর্ষণ। রাতে মা-র শয্যার একাংশে শুয়ে শুধু সেই পরম রমণীয় ক্ষণটুকুরই চিন্তা করি, যে ক্ষণটুকু অনেক চেষ্টায় আহরণ করি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আস্বাদ করি ওর কথা, ওর হাসি, ওর দুরন্ত আবেগ।

কোনো কোনোদিন মনে হয় কাল আর বাড়ি ফিরব না, বলব, চল আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

কিন্তু দিনের আলোয় সে চিন্তার অবাস্তবতা ধরা পড়ে। ও তখনও পরাশ্রিত পড়ুয়া ছেলে, আর আমি মা-দাদার পরম বিশ্বাসস্থল একটা থার্ড ইয়ারের ছাত্রী মাত্র। পালিয়ে গিয়ে কি গাছতলায় সংসার পাতব?

বলতাম, 'এম.এ. পড়ে তোমার কী ডানা গজাবে? এটা কিছু কর না?'

'করছি তো—'

'কী করছ?'

'কেন, প্রেম।'

'থামো অসভ্য! রোজগারপাতির চেষ্টা কর না?'

'তা সেটাই তো করছি। এম.এ. দিয়ে বেরোতে আর একটা বছর, তারপর দু'টো বছর যাবে রিসার্চে। একটা ডক্টরেট নিয়ে—'

'প্রফেসরি করবে, এই তো?'

'সেটাই আমার আপাতত লক্ষ্য। আমার বাবা শিক্ষকতা করতেন, আমিও তাই করব। মা-র তাই ইচ্ছে ছিল।'

'ঠিক আছে। মাস্টারিও শিক্ষকতা। যা তোমার বাবা করতেন। আমিও বি.এ. দিয়ে বেরোলেই—'

'নাঃ। স্কুলমাস্টারি নয়।'

'তা তো বটেই।' আমি রেগে বলতাম, 'তাতে সুবিধে কি? কলেজের অধ্যাপনা, দোহাত্তা ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম, তবেই তো সুখ।'

'কী সর্বনাশ! দেখছি যে তুমিই অন্তর্যামী। এত কষ্টে মনের গোপন ইচ্ছেটুকু লুকিয়ে রেখেছি, তাও ধরে ফেলেছ?'

'ফেলব না কেন? প্রকৃতিটি জেনে ফেলেছি যে।'

'ঘরে একটি বাঘিনী থাকতে কি সে সুযোগ হবে? হয়তো সেই অবলা বলিকগুলোকে কামড়েই দিয়ে আসবে।'

'আসবই তো। ভেবেই তো কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

ও গম্ভীরভাবে বলত, 'তা সে ইচ্ছের কিছুটা পূরণ করতে পার। আসামীর একজন হাতের কাছে হাজির।'

'সে আসামীকে কুচি কুচি করে কাটলেও রাগ মিটবে না।'

বলতাম ঠাট্টা করে।

কিন্তু ক্রমশই যেন ওর সম্পর্কে একটা আক্রোশ ভাবের সৃষ্টি হচ্ছিল। মনে হত যেন ওর তেমন গরজ নেই। নইলে এমন ধীর মাথায় ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা করছে? বসে বসে পরের অন্ন খাচ্ছে, আর কলেজ যাচ্ছে বাড়ি আসছে?

আর তার মাঝখানে আমায় নিয়ে খেলা করছে।

আমি অতএব ক্রমশ দুর্মুখ হলাম, মুখরা হলাম, রোজগার রোজগার করে ওকে উৎখাত করতে শুরু করলাম।

অথচ সত্যি কীই বা বয়েস ছিল তখন ওর। কী-ই বা বয়েস ছিল আমার। বুঝতে পারি, শুধু যে আমার দুর্দাম বাসনাই এই জ্বালাতন করাত আমায় দিয়ে তা নয়, ওর ওই অন্নদাসত্বও অসহ্য হচ্ছিল আমার।

আমার প্রেমাস্পদ তুচ্ছ একটু অন্নঋণ শোধ করতে সকালবেলা উঠে থলি হাতে বাজারে ছুটবে, পাতানো কাকার জুতো পালিশ করবে, পাতানো কাকিকে ঘুমের সুযোগ দিতে চা বানাবে, ডাল চড়াবে, এ অসহ্য! ভাবলেই আমার আপাদমস্তক রি-রি করে উঠত।

কিন্তু ওর যেন কোনো বিকার নেই।

বলত, 'ছোটো কাজ? কাজের আবার ছোটো-বড়ো কি? আমার কাছে ছোটো কাজের সংজ্ঞা আলাদা। তা ছাড়া কষ্টই বা কি? তুমি কর না এসব কাজ?'

'আমি করি নিজের বাড়িতে।'

'নিজের বাড়ি!'—ও হেসে ফেলত, 'তা বটে। তবে দু'দিন বাদে বাড়িটিও পরের বাড়ি হয়ে যাবে, এই যা।'

'কক্ষনো না। মা আমায় কী দারুণ ভালোবাসে জানো? পর করে দেবে ভেবেছ?'

'বেশ, ওখানে হারলাম। কিন্তু তোমার বউদি? ওই সব ছোটো কাজ করেন না কখনও? তাঁর তো পরের বাড়ি।'

'আহা কী বুদ্ধির ছিরি! বরের বাড়িটা বুঝি পরের বাড়ি?'

'তাও নয়? তাহলে সম্পূর্ণ হারলাম। আপন-পর জ্ঞানটা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারিনি।'

রেগে বলতাম, 'মহাপুরুষগিরি রাখো, এই অন্নদাসত্বর পালা শেষ কর। কাগজে কত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখি, দরখাস্ত করে যাও চোখ বুজে। একটা না একটা লেগেই যাবে।'

ও একটু চুপ করে থেকে বলে, 'ভেব না করছি না। তাও করছি। হবে, হয়ে যাবে।'

ও আবার একটু চুপ করে থেকে বলে, 'ধর যদি অনেক দূর চলে যেতে হয়?'

আমি মহোৎসাহে বললাম, 'সে তো আরও ভালো। অজানা সাগরে পাড়ি দেব মোরা দু'জনে। কেটে যাবে দিন শুধু গানে আর কুজনে।'

ও বলল, 'স্বপ্নটা বেশ গোলাপী দেখছি। নেশা টেশা করলে শুনেছি এ-ধরনের গোলাপী স্বপ্ন দেখে।'

'নেশা তো করেইছি—' বলে হেসে উঠলাম।

হঠাৎ ওর চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। বলল, 'নেশা একলা করতে নেই। দেখি, পানপাত্রটা আমার হাতে দাও তো একবার।'

এই ওর স্বভাব।

কখনও স্থির, কখনও অস্থির।

কখনও বিজ্ঞ, কখনও বেপরোয়া।

কারণ ওর বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ আর মাথাটা ঠাণ্ডা হলেও ওর প্রকৃতি উদ্দাম, ওর বাসনায় বন্যতা। ক্রমশই ওর মধ্যে দুটো সত্তা সমান প্রবল হয়ে উঠছে।

আমার কিন্তু ইচ্ছে হয় এই দুই বিভিন্ন সত্তার সমন্বয় দেখি ওর মধ্যে। কিন্তু তা হয় না, ও কখনও উদাসীন হয়ে বসে থাকে, কখনও দুরন্ত মূর্তিতে প্রকাশিত হয়।

একদিন হঠাৎ এসে বলল, 'ভেবে দেখলাম প্রফেসরি করে কিচ্ছু হবে না। টাকা চাই, অনেক টাকা। অতীত জীবনের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলবার মতো টাকা, ভবিষ্যতের সোনার প্রাসাদ গড়বার মতো টাকা। আচ্ছা, কি করলে বেশ রাশি রাশি টাকা পাওয়া যায় বলতে পারো?'

'বোধহয় চুরি করলে।'

'খবরদার ঠাট্টা কোরো না এখন। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।'

'হল কি?'

'কিচ্ছু না' বলে ও মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো মুঠোয় চেপে টানতে লাগল।

দশ

কি ওর হয়েছিল সেদিন জানি না, কিন্তু সেই দিন থেকে ওর যে একটা পরিবর্তন ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ওর ভিতরকার সেই মানসিক প্রশান্তি—যা দেখে এক এক সময় আমার রাগে গা জ্বালা করত, তা যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ও বেশিক্ষণ কথা বলতে পারত না, আমি 'দেরি হয়ে যাচ্ছে' বলে চঞ্চল হয়ে ওঠবার আগেই বলত, 'আচ্ছা, আজ চলি।'

আর কোনো কোনোদিন বলত, 'আকাশ থেকে একবোঝা টাকা পড়তে পারে না? উল্কাপিণ্ডের মতো?'

একদিন বললাম, 'এত টাকার তোমার দরকার কি? যা হোক একটা কাজকর্ম করলেই তো বেশ চলে যাবে আমাদের।'

ও অস্থির গলায় বলল, 'না, সেভাবে খুঁড়িয়ে চলায় আমার সুখ নেই, আমি রথে চড়ে রাজপথে চলতে চাই।'

কেন জানি না হঠাৎ চোখে জল এল।

মনে হল, সেটা কি শুধু তুমি একলাই চাও? কে না চায়? কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না! আর সেটা পাওয়া যাবে না বলে অভিমান করে জীবনের সুন্দর দিনগুলো, কবিরা যাকে নাকি বলে থাকেন 'নবযৌবন', বসে বসে বিকিয়ে দেবে?

কিন্তু মনে হলেই তো ঠিক গুছিয়ে বলা যায় না। ওর মনে এ আগুন তো আমিই জ্বেলে দিয়েছি, ওর চিত্তের প্রশান্তি তো আমিই নষ্ট করে দিয়েছি। ও তো ওর ওই অন্নদাসের জীবনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুঠো মুঠো মাটি দিয়ে পথ তৈরি করতেই চেয়েছিল। ওর গলাতেই তো একদা শুনেছি, 'পৃথিবীর এককোণে রহিব আপন মনে, ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা।'

এগারো

এদিকে বাড়িতে আমার বিরুদ্ধে গুঞ্জন উঠছে।

রোজ রোজ বান্ধবীর সঙ্গে এত কি দরকার?

তুমি রোজ যাও, সে তো কই একদিনও আসে না?

তার মানে তুমি হ্যাংলা, সে মানিনী।

না না, এতক্ষণ আড্ডা দিতে যাওয়া চলবে না। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

মা বলতেন, দাদা বলত।

আর বউদি টিপে টিপে হেসে বলত, 'কে জানে বান্ধবী না বান্ধব।'

মা তখন আড়ালে রেগে রেগে বলতেন, 'কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।'

আমি বুঝতে পারতাম, বউদির উপস্থিতিই আমার পথ কিছুটা সুগম করে দিয়েছে। মা বউদিকে অগ্রাহ্য করবার জন্যেই আমার গতিবিধির এদিক-ওদিককে অগ্রাহ্য করছেন। ভাবটা যেন—তুমি যা খুশি করতে পারো, বোনের বাড়ি যেতে পারো, দোকানে যেতে পারো, আর ও বেরোলেই দোষ? বেশ করবে ও বেড়াত যাবে।

সোচ্চারে না হলেও এই নিরুচ্চার বাক্যই আমার পৃষ্ঠবল ছিল। না হলে বউদির সঙ্গে এই টেক্কা দেওয়াদিয়ি না হলে মা কবেই হয়তো আমার ওপর পাহারা বসাতেন।

বারো

বসাননি পাহারা, তাই আমি যথারীতি ওর সঙ্গে দেখা করছিলাম। কোনোদিন ও প্রতীক্ষা করত, কোনোদিন আমি।

একদিন ও আলো-জ্বলা মুখে এসে বলল, 'বছর সাতেকের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে আমায়?'

বছর সাতেক!

ছেড়ে দেওয়া!

দু'টো শব্দই অবোধ্য।

বললাম, 'ধরলাম কবে যে ছেড়ে দেব?'

'ধরনি? উঃ! আষ্টেপৃষ্ঠে নাগপাশে বেঁধে রেখেছ। যাক শোনো, একটা চাকরি পাচ্ছি দু'বছরের ট্রেনিং, পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট সার্ভিস। ট্রেনিংয়ের দু'বছর চোদ্দ-শো করে দেবে, সার্ভিসে সাড়ে তিন হাজার।'

মনে মনে হিসেব করে নিয়ে উৎসাহের গলাতেই বলি, 'তা মন্দ কি? কোথায়? কোন্ কোম্পানি? ওদের বুঝি বাৎসরিক হিসেবে মাইনে?'

দুরন্ত আমার কথা শুনে প্রবলভাবে হেসে উঠল হা-হা করে।

হাসি আর থামতে চায় না।

তারপর বলল, 'বাৎসরিক মানে? মাসিক। বুঝলে? মান্থলি সাড়ে তিন হাজার।'

আমিও অতএব হেসে ফেললাম।

বুঝলাম ঠাট্টা।

বললাম, 'শুধুই মাইনে? তার সঙ্গে একটি সুন্দরী রাজকন্যা নয়?'

'কী ভাবছ, ঠাট্টা? তাহলে এই দেখো।'

ও পকেট থেকে কতকগুলো ছাপানো কাগজপত্র বার করল। ফরম, প্রস্‌পেক্টাস্‌, আরও কি যেন। তারপর আমায় ধরে বসিয়ে বোঝাতে বসল।

সত্যিই ওই রকম অবিশ্বাস্য হারের মাইনে।

কিন্তু কাজটা যে কি তার উল্লেখ নেই। ট্রেনিং নিতে হবে এই উল্লেখ আছে।

আর উল্লেখ আছে শর্তের।

ওই সাত বছরের মধ্যে দু'বছর কোনো ছুটি পাবে না। চাকরির পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্য ছুটি পাবে, বছরে তিন সপ্তাহ, তার মধ্যে দেশে আসতে পারো, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের ব্যবস্থাপনায়, ও বিষয়ে কোম্পানি তোমাকে কোনো সাহায্য করত অসমর্থ।

কিন্তু ছুটিতে তুমি তোমার দেশে আসবে তাতে সাহায্যের প্রয়োজনই বা কি?

তা আছে প্রয়োজন।

চাকরিটি যে পশ্চিম আফ্রিকায়।

আফ্রিকার মানচিত্রের কোণে ছোট্ট একটি নাম। কে জানে সেখানে অরণ্য উপড়ে উপনিবেশ স্থাপনের আয়োজন চলছে, না উপনিবেশ গড়ে ফেলে কাজ করবার মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই সারা পৃথিবীতে প্রলোভনের জাল ফেলেছে। একদল ছেলে চাই তাদের। স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ।

পড়বে কেউ না কেউ সে জালে।

হয়তো বা দলে দলেই পড়বে।

পৃথিবীতে বেকারের সংখ্যা তো কম নয়। যারা বেকারিত্বের জ্বালায় বাঘের মুখে যেতেও প্রস্তুত। কুমীরের হাঁয়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

'তাই বলে তুমি?' বললাম, 'পাগল নাকি?'

ও বলল, 'কেন পাগল কিসে? টাকার দরকার কি আমার কম?'

'এত কি দরকার?'

ও দৃঢ় গলায় বলল, 'আছে দরকার।'

'আমার ওপর রাগ করে বলছ?'

'না বেবি, তোমার ওপর নয়, হয়তো নিজেরই ওপর। শুধু একটা কথাই বলব—আমাদের দু'জনের মধ্যে এই ভালোবাসা আমার অন্নদাতাদের চোখ এড়ায়নি, আর এই সূত্রেই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন পৃথিবীটা শুধু নেমকহারামের বাসভূমি। সে ধারণাটা যে ভুল সেটাই প্রমাণ করতে হবে আমায়।'

এই প্রথম ও 'কাকাবাবু কাকিমা' না বলে 'অন্নদাতা' বলল।

কিন্তু আমাদের ভালোবাসার সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক কি?

আছে বৈকি।

কে না জানে রমেশবাবুর ছেলে নেই, কে না জানে রমেশবাবুকে এবার অবসর গ্রহণ করতে হবে। আর এটাই বা কে না জানে, একটা লোক যদি বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হয়ে বসে, তার আর পুরনো ঋণ শোধ দেবার ক্ষমতা থাকে না, গরজ থাকে না।

এই সব কথাগুলোই হয়তো জানা ছিল অমিতাভর, শুধু এইটা জানা ছিল না—দেবতার মুখ থেকেও এই জানা কথাগুলো বেরোতে পার।

রমেশবাবুকে অমিতাভ দেবতার প্রাপ্য আসনে বসিয়ে রেখেছিল।

হয়তো দেবতার মনেও হঠাৎ ক্ষোভ জন্মাতে পারে, হয়তো দেবতাও হঠাৎ বিচলিত হতে পারে। হয়তো সেটা নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু ওই বিশ্বস্তহৃদয় ছেলেটার সে বিচারের ক্ষমতা থাকবার কথা নয়। তাই তার দেবতা আসনভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তার হাতের পুষ্পাঞ্জলি স্খলিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সেই ক্ষোভে সে পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদে ঝাঁপ দেবে?

ও বলল, 'একথা বলছ কেন? মানুষ তো শুধু ভ্রমণের পিপাসাতেও পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়। ইতিহাসের সাক্ষী হয় সেই সব পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।'

'সে আলাদা। সেটা স্বেচ্ছাধীন।'

'ওটা ভুল। কোনো সময়েই মানুষ স্বেচ্ছাধীন নয়। প্রতিমুহূর্তেই তাকে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।'

তবু অনেক কথা বললাম।

অনেক নিষেধ-বাণী, অনেক প্রতিবাদ, অনেক অভিমান, অনেক যুক্তি খরচ করলাম। কিন্তু ও অটল। ও বলছে, কষ্ট হবার ভয় করলে উন্নতির আশা কোথায়?

তেরো

ও কোনো কথাই শুনল না, চলে গেল। আমাকে বলল, 'সাতটা বছর অপেক্ষা করতে পারবে না আমার জন্যে?'

'আমাকে উৎপীড়িত হতে হবে।'

'সইবে আমার জন্যে।'

আমি অভিমানে চুপ করে রইলাম।

ও বলল, 'উপায় থাকলে রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলে যেতাম। কিন্তু আইনের চোখে যে তুমি এখনও নাবালিকা। আশ্চর্য, এখনও এত কম বয়েস তোমার!'

তারপর যাবার আগে ও আমার চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'ফিরে এসে তোমায় ঠিক এমনি পাব তো?'

'সন্দেহ হচ্ছে?'

'না, সন্দেহ নয়, ভয়। মনে হচ্ছে যদি বদলে যাও।'

'কে জানে বদলটা কার হয়!'

'আমি? আমি ঠিক থাকব। জলে, জঙ্গলে, অরণ্যে, সভ্যতায়, বর্বরতায়, আদিমতায়।'

'জোর করে কিছু বলা যায়?'

'মনের জোর থাকলে যায়।'

আমার অভিমান ক্ষুব্ধ হল। আমিও মনের জোর দেখালাম। বললাম, 'তোমার বদল না হলে, আমারও বদল হবে না।'

চৌদ্দ

বলেছিলাম।

বলেছিলাম, আমারও বদল হবে না।

কিন্তু আমার বদল হল।

আমার নাম বদল হল, আমার সাজ বদল হল, আমার আচার-আচরণের বদল হল, আমার মুখের ভাষারও বদল হল। আমি এখন কথা বলি শান্ত গম্ভীর মৃদু ছন্দে। আর সেই কথার মধ্যে দার্শনিকের ঔদাস্য থাকে, থাকে আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়াটে রহস্য।

আমি ভাবি এগুলি আমার ভান, আমার ছলনা, কিন্তু হঠাৎ এক এক সময় মনে হয়, নাকি ওইগুলোই সত্যি হয়ে উঠেছে আমার জীবনে? ওই ছলনার খোলসের মধ্যেই আমি আমার সত্তাকে সমর্পণ করেছি?

তাই বউদির বোন শানু যখন বলেছিল, 'আশ্চর্য! কুমারী মেয়ে হয়েও তুমি অনায়াসে এতখানি কৃচ্ছ্রসাধন করছ। তোমাকে দেখে আমার নিজের উপর ঘৃণা আসছে বেবি!'

তখন বলতে পারিনি, 'এ-কথা বোল না শানু! বরং ঘৃণা তুমি আমাকেই করতে পার। তুমি তো সরল, সত্যবাদী, খাঁটি। আমি কি? মেকি। ভেজাল। একটা ঝুটো মাল।'

আমি শুধু মিষ্টি করে একটু হেসে শানুর গায়ে হাত রেখেছিলাম। কারণ, মনে হয়েছিল শানু যা বলছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আমার মধ্যে আছে নিশ্চয় কিছু। নইলে শঙ্কর মহারাজ কেন ওকে অবহেলা করলেন, আর আমায় এতখানি মর্যাদা দিলেন।

অথচ যে সার্কেলের মধ্যে আমার মর্যাদা, সে সার্কেলটাকে আমি কোনোদিনই মর্যাদা দিতাম না। আমি মনে করতাম—জীবনে যারা বঞ্চিত, যারা ব্যর্থ, যারা পৃথিবীর সত্যকার আলো-বাতাসের স্বাদ পায়নি, তারাই ভগবান ভগবান করে মাথা ঠোকে, তারাই গুরুর দরজায় ভিড় বাড়ায়। অতএব তাদের অভিমতের মূল্য ছিল না আমার কাছে।

কিন্তু এখন যখন সেই গুরুর দরজায় ভিড় করা মেয়ে-পুরুষের দল আমার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকায়, তখন আত্ম-অহমিকায় স্ফীত হই আমি।

আসল কথা, আমাদের সত্তা আমাদের পরিবেশের কাছে বিক্রিত। পরিবেশই আমাদের গড়ে ভাঙে। আর সেই পরিবেশের সমীহ দৃষ্টিই আমাদের কাছ সবচেয়ে মূল্যবান।

আগে আগে মা যখন কখনও কখনও তাঁর গুরুভগিনী বা গুরুভ্রাতাদের বাড়িতে ডাকতেন, তাদের জন্যে তটস্থ হতেন, তখন মায়ের উপর কৃপা হত, আর ওদের দেখে হাসি পেত। হাসি পেত ওদের সম্বন্ধে মা-র মূল্যবোধের বহর দেখে। কিন্তু এখন আমি আমার গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীদের চোখে একটু বিশেষ হয়ে উঠতে পারাকে রীতিমতো গৌরবের মনে করি। অথচ সেই একই শ্রেণীর তো এঁরাও।

পনেরো

কিন্তু ওই 'আমি'টা যেন সমুদ্রের উপরকার ঢেউয়ের মতো। আসল জলটা নয়, জলের ফেনা। কখনও অনেকখানি উঁচু হয়ে ওঠে বলে মনে হয় এটাই সত্য, কখনও হঠাৎ স্তিমিত হয়ে যায়। তখন নীচে দিয়ে বয়ে যাওয়া স্তিমিত জলটা চোখে পড়ে।

সেই রকম স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল আমার 'আমি'টা শানুর যাবার আগের দিন। সন্ধ্যাবেলা শানু আমার কাছে এসে বসেছিল।

আলতোভাবে আমার বিশুদ্ধ শয্যার একাংশে বসে বলেছিল, 'সেই বাড়িটায় আবার যেতে ভয় করছে। সেই শ্বশুরবাড়ি।'

আমার দেবিত্বটা তখন যেন ঝাপসা হয়ে গেল। বললাম, 'তুমি ভারী বোকা শানু, তাই তুমি এই বৈধব্যটাকেই নিজের জীবনের শেষ কথা বলে মেনে নিচ্ছ। তোমার জীবনে অফুরন্ত দিন-রাত্রি, তোমার রূপ আছে, বয়েস আছে, স্বাস্থ্য আছে। তুমি কেন আবার তোমার ভাগ্যটাকে যাচাই করে দেখবে না? ক্লাসে একবার ফেল হলে কি লোকে পড়া ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে? এত কিসের ইয়ে তোমার?'

শানু আস্তে বলল, 'তোমার কাছে লুকোব না ভাই, জীবনের প্রতি এখনও সম্পূর্ণ লোভ আছে আমার, লোভ আছে খাওয়া-পরায়, আমোদ-প্রমোদে। তা ছাড়া আর আমায় কেউ ভালোবাসবে না, আমি আর কাউকে ভালোবাসতে পাব না, একথা ভাবতে বসলে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয় আমার, কিন্তু সেকথা চেঁচিয়ে বলতে লজ্জা করে।'

বললাম, 'লজ্জার কিছু নেই শানু, তোমার এই বৈধব্যটা কৃত্রিম। সমাজের আরোপিত একটা

জুলুম। এটাকে জোরের সঙ্গে অস্বীকার কর। তাছাড়া তোমাদের বাড়িটা তো বেশ প্রগতিশীল?' বাপের বাড়িটার কথাই বলি।

শানু নির্বোধ, তবু শানু একটু হেসে বলে, 'প্রগতির পোশাক পরলেই প্রগতিশীল হওয়া যায় না বেবি! এখন আমি একটা রঙিন শাড়ি পরলে দাদা-বউদিরা তো দূরের কথা, আমার বাবা সুদ্ধু বিরক্ত হন। বিধবা মেয়েকে তাঁরা আহা আহা করবেন, কিন্তু তার আবার বিয়ের কথা? ভাবতেই পারবেন না।'

'তাহলে এবারে তোমায় নিজে হাতে ভার নিতে হবে।'

শানু কেমন একরকম চোখে তাকিয়ে বলে, 'লজ্জা আমার সবচেয়ে বেশি বেবি তোমার কাছেই। তুমি অকারণ এইভাবে স্বেচ্ছায় জীবনকে হাত দিয়ে ঠেলে দিতে পারছ—'

আমি লজ্জা পেলাম।

আমি যেন আমার ভেতরটা দেখতে পেলাম, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ভুল শানু, ওটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। আমার সব কিছুই ভান। এই বৈরাগ্যটা আমার ছদ্মবেশ।'

ও অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু কেন? তোমার এতে দরকার কি?'

'এমনি মজা। খেলা।'

শানু আরও অবাক হল।

বলল, 'মজা! খেলা! কিন্তু এই খেলাটা যখন আর ভালো লাগবে না?'

'তখন টান মেরে ফেলে দেব লোটা-কম্বল।'

শানু বিশ্বাস করল না। বলল, 'এ তুমি আমাকে স্তোক দিয়ে বলছ '

'না শানু, সত্যিই বলছি। আর সত্যিই তোমায় উপদেশ দিচ্ছি, জীবন জিনিসটা এমন তুচ্ছ নয় যে তুমি শুধু তুচ্ছ একটু লোকলজ্জার মুখ চেয়ে সেটা বরবাদ দেবে। তুমি আবার ভালোবাস, ভালোবাসা নাও।'

শানু একটু বিষণ্ণ হাসল। বলল, 'তুমি এমনভাবে বলছ, যেন আমার জন্যে কী একখানা ভালোবাসা অপেক্ষায় বসে আছে। ভালোবাসাটা আসছে কোথা থেকে?'

'আজ নেই, কাল আসতে পারে। তোমার মনটা প্রস্তুত রেখো তাকে গ্রহণ করবার জন্যে।'

শানু আস্তে উঠে গেল।

শানুর নিশ্বাসটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

আর শানু চলে যেতেই আমার রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। যে ভালোবাসা আমার জন্যে প্রহর গুনছে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে, তার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। ইচ্ছে হল ছিঁড়ে ফেলি এই খোলশ, সবাইকে ডেকে ডেকে বলি, শোন তোমরা, আমার ভালোবাসা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে বলে মরুভূমিতে সোনা কুড়োতে গেছে। অতীতের সব গ্লানি মুছে ফেলে, সব ঋণ শোধ করে ফেলে ও আমায় নিয়ে ঘর বাঁধবে, তাই আমার এই শবরীর প্রতীক্ষা।'

কিন্তু আবেগকে শাসন করে বুদ্ধি। তাই আমি কিছু বলি না। শুধু আমার ছদ্মনামের খোলশেই স্থির হয়ে বসে থাকি। যখন মা কাঁদো-কাঁদো মুখে বলেন, 'কোনোদিন ভাবিনি তুই এমন হয়ে যাবি—' তখন মৃদু হেসে বলি, 'কেন মা, এ তো বেশ। তোমার কাছেই রয়ে গেছি, ছেড়ে কোথাও চলে যাচ্ছি না—'

মা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আমার কাছেই বটে!'

বলেন, কারণ মা-র ধারণা আমি এখন আর মা-দের এই জানা পৃথিবীর মানুষ নই, আমি অন্য এক গ্রহের! যেখানে বাসনা নেই, কামনা নেই, বরং ভোগ-সুখের প্রতি তীব্র বিরাগ। সেই এক নির্মল জ্যোতির্লোকে বিরাজ করছি আমি আমার ভগবতী সত্তা নিয়ে।

কিন্তু আমি তো জানি, আমি তোমাদেরই লোক।

আমি যখন একটি বিরল নির্জনতার আশায় বলেছিলাম, আলাদা একটা ঘর না হলে আমার ধ্যান-ধারণার অসুবিধে হয়, তখন সে কোন্ ধ্যানের কথা বলেছিলাম?

সে ধ্যান কি শঙ্কর মহারাজের দেওয়া ইষ্ট-মূর্তির? তা যদি হয়, সে ধ্যান জননীর স্নেহ বাহুবেষ্টনের মধ্যে থেকেও হতে পারত না?

কিন্তু সে ইষ্ট-মূর্তির ধ্যান তো করতে চাইনি আমি। একক শয্যায় শুয়ে ধ্যানে বিভোর হই আমি একটি বলিষ্ঠ পুরুষ-মূর্তির।

রক্ত-মাংসের সজীব পুরুষ।

পাথরের 'নওল কিশোর' নয়। যাঁর প্রেমকাহিনী নিয়ে শঙ্কর মহারাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্তন করেন, ব্যাখ্যা করেন। শুনি তিনি নাকি বিশ্বের সমগ্র নারীর প্রেমাস্পদ। আর বিশ্বের সবাই তো নারী। তিনি ছাড়া পুরুষ কই এই বিশ্ব ব্রজভূমিতে?

হ্যাঁ, এসব কথা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, কারণ মুখস্থ করার ক্ষমতাটা নাকি আমার অদ্ভুত। এসব কথা আমিও গুছিয়ে বলতে পারি মহারাজের প্রধানা শিষ্যা বৃন্দাদির মতোই। যার জন্যে বৃন্দাদি আজকাল আমায় বিষনজরে দেখতে শুরু করেছেন।

ষোলো

কিন্তু ওসব তো রঙ্গমঞ্চের ভূমিকার সংলাপ।

রাত্রে যখন অভিনয়ের রঙ মুছে নিজের কাছে নিজে ধরা দিই?

তখন কি ধরা দিই না একটি তীব্র রোমাঞ্চময় কল্পনার কাছে?

দিই।

তখন ধ্যান করি এক রক্ত-মাংসের পুরুষের। ধারণা করতে চেষ্টা করি কী তীব্র সুখময় সেই বলিষ্ঠ বাহুর নিষ্পেষণ।

সেই ধ্যান-ধারণার দাহে কোনো কোনোদিন আমি যখন ঘরে টিকতে পারি না, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বারান্দাকে করি নৈশচারণার ক্ষেত্র, তখন সেই বারান্দার একাংশে অবস্থিত দাদা-বউদির পর্দাফেলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে হিংসেয় সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে আমার। আর কোনো কোনোদিন অদম্য হয়ে ওঠে একটা অন্যায় ইচ্ছার আকর্ষণ। আমার থেকে তেরো বছরের বড়ো দাদার ঘরের রাত্রির রহস্য যেন আমাকে তীব্রবেগে টানে অন্ধকারের আড়ালে গা ঢেকে ওই পর্দাকে ঈষৎ উন্মোচিত করে ভিতরে চোখ ফেলতে।

সেই ইচ্ছের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে শঙ্কর মহারাজের দীক্ষামন্ত্র নয়, নিতান্তই আমার চিরদিনের সভ্যতার সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার, শালীনতার সংস্কার।

কিন্তু এসব কি বর্তমান? বুঝতে পারছি না।

অতীতে আর বর্তমানে মিশে গিয়ে যেন একটা কুয়াশার পর্দা দুলছে আমার মধ্যে। আমি বুঝতে পারি না আমার দিনের বেলার 'আমি'টা আর রাত্রে বেলার 'আমি'টা অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে, না একজন অপরজনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

যদি আত্মসমর্পণ করে থাকে তো স্নায়ুতে শিরাতে এত চাঞ্চল্য কেন? কেন ওর খবরের জন্যে এত ছটফটানি?

সতেরো

আমার দিক থেকে খবর নেবার কোনো উপায় ছিল না কারণ, দুরন্তর ঠিকানার কোনো ঠিক নেই। কোথায় না কোথায় ক্যাম্প পড়ে ওদের, কখন না কখন চিঠি দেবার সময় পায়। তাও তো সে চিঠি আসে আমার এককালের সহপাঠিনী শিপ্রার শ্বশুরবাড়িতে তার স্বামীর নামে। এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিল ও।

শিপ্রা কোনো গতিকে আমায় সে চিঠি পৌঁছে দিত। নিতান্তই দীর্ঘ ব্যবধান ছিল সেই চিঠি আসায়।

তার মধ্যে আবোল-তাবোল কথাই বেশি থাকত, তার মধ্যে প্রকাশ পেতে শুধু তার আকুলতা, প্রকাশ পেত বিশ্বাস আর আশ্বাসের ব্যাকুলতা। তবু ওরই মধ্যেই টের পেয়েছিলাম, কাজটা ওর 'বন কেটে নগর বসাবার'। কুলি খাটাতে হয়, বন কাটাতে হয়, অরণ্যের দেবতার অভিশাপ কুড়িয়ে সেখানে আগুন জ্বালাতে হয় শুকনো পাতাকে ভস্ম করতে।

খুব স্পষ্ট করে কিছু লিখতে পারে না। মনে হয় স্পেন্‌সারের ব্যাপারটা কড়া, তাই লেখে 'ভালো আছি।' আর মাঝে মাঝে লেখে 'দিন গুনছি।'

আমি ওর খবর পাই, কিন্তু ও আমার কোনো খবর পায় না।

এক এক সময় ওর অবস্থা ভুলে নিতান্ত সহানুভূতিহীন নির্মম বিচার করে বসি আমি। বলি, 'দিব্যি তো নিশ্চিন্তে বসে দিন গুনছি, দিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে যে দিন ফুরোয় তা খেয়াল আছে? তুমি কি জানতে পারছ আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি? জানতে পারছ কি, কিভাবে আমার দিন কাটছে?'

আমি না হয় অদ্ভুত একটা হাতিয়ার হাতে পেয়ে গিয়ে আমার শত্রুপক্ষকে ঠেকিয়ে রেখেছি। তারা এই অভাবনীয় অস্ত্রটা দেখে ভয় পেয়ে গেছে, তারা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলছে, 'স্বপ্নেও ভাবিনি তুই এমন হয়ে যাবি।'

কিন্তু তুমি? তুমি কি জানতে পারছ এসব?

আমার এই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ কোথায় তোমার? অথচ তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। কারণ তুমি আমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছ, ঠিক থাকব আমি, বদলাব না।

এ পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা খোঁজ করতে একদিন রমেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। অনেকটা বুড়ো হয়ে গিয়েছেন যেন। ভারী যেন অসহায়। চুপচাপ বসে রইলেন।

কথা বললেন তাঁর স্ত্রী।

বললেন, 'এই দেখ মানুষ, একটা পরের ছেলেকে পুষে এমন মায়ায় জড়ালেন নিজেকে যে, তার বিহনে একেবারে জবু-থবু হয়ে গেলেন। অথচ তার ব্যবহার দেখ। চাকরি করতে বিদেশ যাচ্ছি বলে চলে গেল, না খবর না কিছু। নেমকহারাম যাকে বলে!'

ভাবলাম, ইচ্ছে করলে কি ও টাকা পাঠাতে পারত না?

হয়তো পারত, হয়তো পারত না।

হয়তো ওই অবিশ্বাস্য মাইনেটা ফাঁদ মাত্র। হয়তে বিনিমাইনেয় খাটিয়ে নিচ্ছে ক্রীতদাসের মতো। কে জানে! প্রাণটা কেমন করে উঠল।

চলে এলাম। আর যাইনি। তাছাড়া যাবার সময়ই বা কোথায়?

না, সময় নেই।

সময়টা আমার আঁট-সাঁট একটা ছন্দের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে আছে যেন। একটা অক্ষরেরও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে গুরুর দেওয়া ইষ্ট-মূর্তির পট সামনে রেখে মঙ্গল-আরতি করি, ধূপ জ্বালি, ফুল বাছি, মালা গাঁথি, চন্দন ঘষি। তারপর চোখ বুজে বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আমার সেই তপস্বিনী মূর্তি দেখে দেখে ক্রমশ বাড়ির লোকেরাও আমায় ভক্তি করতে শুরু করেছে। মা মালি দিয়ে নিত্য ফুলের যোগান করিয়ে দিয়েছেন, ফুল মিষ্টি দই ক্ষীর আনিয়ে রাখছেন ভোগের জন্য, সারা সকাল নিঃশব্দে সংসারের কাজ করেন, বাড়ির সকলকে সামলে রাখেন গোলমাল করা থেকে, পাছে পূজারিণীর পূজার ব্যাঘাত হয়। বউদি পর্যন্ত আজকাল আর মুখে-চোখে ব্যঙ্গহাসির ছুরি উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায় না, ঔদাসীন্যের ছবি হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ভাবটা যেন এ সংসারের নৈবেদ্যের ভাগটা তো তুমিই লুঠে নিলে, আমার আর এখানে থাকাই বা কেন!

যাক, মনের কথা দেখতে নেই, মোটের মাথায় আছি ভালো। যে দাদা প্রথম-প্রথম কত রাগ দেখিয়েছে, কত তাচ্ছিল্য করেছে, সেই দাদাই দেখি কাজে বেরোবার কালে একবার আমার ঠাকুর-ঘরের দরজায় এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাতটা জোড় করে কপালে ঠেকায়।

না, আলাদা কোনো ঠাকুরঘর নয়, আমার শোবার ঘরই আমার ঠাকুরঘর। সেই সরু একফালি ঘরেরই একপাশে চৌকি পেতে বসিয়েছি আমার গুরুর ফটো, আমার ইষ্টের পট। তার সঙ্গে অসুর-নাশিনী দুর্গারও।

শঙ্কর মহারাজের কাছে সর্বধর্মসমন্বয়। তিনি বলেন, 'হলই বা বৈষ্ণবমন্ত্র, অসুরনাশিনী মূর্তিও সামনে রাখা দরকার। মনের মধ্যেকার পাপাসুরকে দমন করতে হবে যে। 'মা', মা হচ্ছেন আশ্রয় আর উনি? ওই 'নওলকিশোর'? উনি হচ্ছেন সখা, বন্ধু, প্রিয়তম, প্রেমাস্পদ। উনি আধার, উনি প্রাণারাম।'

চৌকির উপর অতএব তিন দেবতার ছবি সাজিয়ে রেখেছি ফুলে চন্দনে, ছোট্ট চেলির কাপড়ে, রুপোর বাঁশীতে। ধূপের সৌরভে ঘরের বাতাস পবিত্র হয়ে ওঠে, সকালের আলো এসে আমার মুখে চোখে চুলে ছড়িয়ে পড়ে এনে দেয় একটা দিব্যদ্যুতি, আমার মুদিত চোখের পল্লব কাঁপে না। এসব আমার সাধনা।

আমার সুন্দর সুন্দর সিল্কের শাড়িগুলো পরি আমি পুজো করবার সময় অযত্নে অবহেলায়। কারণ, আমি তো আর বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্নে যাই না, যাই না সিনেমা দেখতে, থিয়েটার দেখতে।

যাবার মধ্যে মঠে।

সেখানে সাদা শাড়ি।

দুধ-সাদা ধবধবে।

গুরু যাতে বলতে পারেন, 'বাইরের মতো মনটিও করতে হবে।'

আমি যখন ধ্যান-ধারণা সেরে আবার নরলোকে ফিরে আসি, তখন দাদা অফিস চলে গেছে, দাদার ছেলেটা স্কুলে। বউদি রান্নাবান্না সেরে নিয়েছে। আগে আগে বউদি ওই রান্না-রান্না করে রাগারাগি করত, মস্তবড়ো একটা আইবুড়ো মেয়ে যে একদিন ভাত রাঁধতে পারে না, এর জন্যে অনুযোগ করত, কিন্তু এখন বউদির মুখে চাবি পড়ে গেছে। বউদির রান্নাঘরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি তো আমার মায়ের রান্নাঘরে খাই, বিশুদ্ধ, আমিষ-বর্জিত।

পুজোর পর ঠাকুরের ফল-মিষ্টির প্রসাদ, আর পাথরের গ্লাসে চা খেয়ে পেড়ে বসি সেই জপের খাতা। হাজার জপ লিখতে হবে। এতে নাকি কাজ আরও বেশি হয়। 'অক্ষরে'র মধ্যেই নাকি ব্রহ্ম!

গল্পের বই বলে পাগল ছিলাম আগে, লাইব্রেরি বইতে শানাতো না, পাড়াপড়শীর দরজায় হাত পেতে পেতে তবে মিটত কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা।

কিন্তু এখন ওসব বই নিষিদ্ধ খাদ্যের মতোই পরিত্যাগ করতে হয়েছে। গল্পের বই, নাটক-নভেল পড়ে সময়ের বৃথা অপব্যবহার করার মতো বোকামীতে মহারাজের বিশেষ ঘৃণা। আর যাতে তাঁর ঘৃণা, তা করতে লজ্জা হবে না?

দুপুরবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর্ব মিটলে দিবানিদ্রার বদলে পড়াশোনা করি, কিন্তু সে তো ধর্মগ্রন্থ। মঠের লাইব্রেরি থেকে আনা, মহারাজের টীকাভাষ্য সংবলিতও হয়তো।

তারপর যখন বেলা পড়ে আসে, তখন মঠ থেকে গাড়ি আসে আমার আর মা-র জন্যে, সন্ধ্যা-আরতি দেখতে যাবার কারণে। বিশেষ সমাদর, বিশেষ ব্যবস্থা।

গোড়ায় গোড়ায় বউদি বলত, 'লক্ষ্যটা তুমি, মা উপলক্ষ্য মাত্র।'

এখন আর বলতে সাহস পায় না।

তা প্রথম প্রথম মা নিয়মিত যেতেন, হয়তো এতবড়ো মেয়েটাকে সন্ধ্যায় একা ছাড়তে সংস্কারে বাধত। কিন্তু ক্রমে সবই সয়। তাছাড়া, রোজ সন্ধ্যাবেলা কাজকর্ম ফেলে আরতি দেখতে যাবেন, এত ভক্তি-ঢলঢল মা-র মন নয়।

মা তাঁর লক্ষ্মী-ষষ্ঠী-মনসা-ইতু বোঝেন, তার জন্যে উৎকণ্ঠিতও থাকেন, কিন্তু আরতি দেখতে রোজ মঠে যাবেন এত সময় বার করতে পারেন না। তাছাড়া, আরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে শুরু হয়ে যায় স্তব-স্তোত্র-কীর্তন। তার শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা তো মা-র পক্ষে যম-যন্ত্রণার শামিল।

ক্রমশ তাই গাড়ির আরোহী হই একমাত্র আমি। বউদিকে জিগ্যেস করি, 'যাবে?'

বউদি বলে, 'না, এখন কাজ রয়েছে।'

শানু এক কীর্তি করার পর থেকে বউদি একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বউদি আশঙ্কা করেনি শানুর মতো একটা ভীরু মেয়ে এমন বেপরোয়াভাবে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে।

লিখে রেখে গেছে নাকি, রেজিস্ট্রি বিয়ে করে স্বামী তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে তার কর্মস্থলে। কিন্তু সেকথা কে বিশ্বাস করেছে? তাছাড়া সেটাও যদি হয়েই থাকে সত্যি, দ্বিতীয়বারের স্বামীকে প্রকৃত স্বামীর মর্যাদাটা দিচ্ছে কে? ওটা যেন পরচুল দিয়ে খোঁপা বাঁধা, ঝুটো মুক্তোর মালা গলায় দিয়ে সাজা।

উনিশ

মা বললেন, 'মেয়েটাকে ওই শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েই ভুল করলে তুমি বউমা! শাশুড়ি নেই, বুড়ো শ্বশুর, জায়েরা যে যার নিজ নিজ সংসার নিয়েই ব্যস্ত। ওকে কে সামলেছে বল?'

বউদি কপালে হাত রেখেছে।

বউদির মুখে জগতের দুঃখ বেদনা রাগ অপমান। বোনের দ্বারা যে তার মুখ পুড়ল, এটা যেন শুধু তার বোনেরই নয়, সেই দগ্ধ দৃশ্যের দর্শকদেরও অপরাধ।

একে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, 'আজকাল আর এসব না-হচ্ছে কোন্ সংসারে?' কিন্তু অপরাধিনী বোনটাকে সামনে পেলে যে ধিক্কারে জীর্ণ করে ফেলত তাকে তাতে সন্দেহ নেই।

আশ্চর্য! বিধবা ছোটো বোনটার ওপর তো মমতার অবধি ছিল না তার, লুকিয়ে মাংসের চপ খাওয়াত। কিন্তু যেই সে নিজের জীবন গড়ে তুলতে গেল, অমনি সব মমতা কর্পূরের মতো উবে

গেল? তার মানে মমতা ততক্ষণই, যতক্ষণ তুমি ভাগ্যহত! ভালোবাসা ততক্ষণই, যতক্ষণ তুমি নিজের সম্পর্কে অচেতন। সচেতন হয়েছ কি ভালোবাসাটি হারিয়েছ।

শানুর প্রতি আর ভালোবাসা নেই বউদির।

কিন্তু আমার?

আমারও শানুর ওপর ভালোবাসাটা উবে যেতে চাইল কেন? সে কী হিংসেয়? আমার এই দেবিত্বের আবরণ কি এতই ব্যর্থ? শানু যে সেইরকম জীবনটা পেয়ে গেল, যে-রকমটি নাকি একদার 'বেবি' নামের মেয়েটার একান্ত কাম্য ছিল, সেটাই কি আমায় দগ্ধাল? নইলে শুনে এত জ্বালা ধরল কেন ভিতরে?

অথচ আমিই সাহস দিয়েছিলাম ওকে।

কুড়ি

কিন্তু সকল জ্বালা প্রশমিত হয়ে যায় গাড়ি থেকে নেমে মঠের চৌহদ্দিতে পা দিতে দিতে। নিত্যসেবার সুবিধের জন্যে অনেকখানি জমি জুড়ে মালঞ্চ আর তুলসীবন। মালঞ্চে শৌখিন ফুল নেই, আছে দেশী ফুল। গোলাপ, চাঁপা, বেল, জুঁই, টগর, গন্ধরাজ, কাঠছাঁপা, গাঁদা, দোপাটি, কিন্তু কেয়ারির কী বাহার! গাছে গাছে আলোর সমারোহ।

জুড়িয়ে যায় চোখ, জুড়িয়ে যায় মন।

তারপর উঠে যাই নাটমন্দিরে।

সুন্দর ডিজাইনের মোজেক টালি বসানো বিরাট চত্বর, আয়নার মতো নির্মল চকচকে। সেখানে নিঃশব্দ নিস্পন্দ ভক্তবৃন্দ বসে আছেন দু'ভাগে, মাঝখানে পথ রেখে। যে পথ শেষ হয়েছে গিয়ে বিগ্রহের পদপ্রান্তে। নাটমন্দিরের পরে অর্ধবৃত্তাকার অর্ধবেষ্টনী বারান্দা, সেখানেও ভক্তজনের শ্রেণীভাগ। একভাগে মহিলা, একভাগে পুরুষ, যেমন নাটমন্দিরে।

বারান্দার মধ্যে বসবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়, তাঁরা হচ্ছেন বিশেষ ভক্ত। বিগ্রহের পিছনে আলাদা কয়েকধাপ সিঁড়ি আছে তাঁদের ব্যবহারের জন্যে। যাঁরা অধিকারী তাঁরা এই নাটমন্দির না মাড়িয়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে ওঠেন, ভক্তপদরজঃ মাথায় ঠেকিয়ে। তারপর ঘেরা বারান্দা দিয়ে বিগ্রহের ঘর প্রদক্ষিণ করে আত্মস্থভাবে এসে বসেন নিজ নিজ স্থানে। নিত্য আসা-যাওয়ায় আপনা থেকেই স্থান একটা করে নির্বাচন হয়ে গেছে।

যেমন জানি, বৃন্দাদি বসবেন একেবারে ঠাকুরঘরের দরজা ঘেঁষে, সত্য ব্রহ্মচারী মোটা থামটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে, বারান্দার গায়ে গায়ে ছেলেদের দিকে ব্রহ্মচারী অভয়, বীরেশ্বরভাই, নিত্যমহারাজ, অচ্যুতানন্দ, মেয়েদের দিকে সুধাদি, অমলাদি, নীলিমাদি, বুড়িমহামায়া মা, রাইকমল, ব্রজরাধা।

এঁদের দু'জনেরও শঙ্করজীর দেওয়া নাম। এই বারান্দার এদিকের এঁরা সবাই এই আশ্রম বা মঠের অধিবাসী, এঁদের এখানে কিছু কিছু ভূমিকা থাকে।

যেমন আরতির পর কীর্তনের সময় ব্রহ্মচারী অভয় আর বীরেশ্বরভাই খোল বাজান, এঁরা সবাই দোহার দেন।

মূল গায়েন শঙ্করজী।

আরতিও তিনিই করেন।

সে এক অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা! কত তার মুদ্রা, কত তার ছন্দ! প্রৌঢ় শরীরেও কী শক্তি? আরতির সময় এদিক থেকে শুধু পিঠটি দেখা যায়, আর আবিষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে দেখতে হয় সেই স্বাস্থ্য-সংগঠিত

সুগৌর পিঠ, পাঁজর, কাঁধ আর দু'টি পা। গরদের ধুতি থাকে পরনে, গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় সেই দুধে-গরদের ধুতি। কাঁধে থাকে একখানি পাট-করা উত্তরীয়, বার বার খসে খসে পড়ে, বার বার তাকে কাঁধে তোলেন, সেও এক মধুর ভঙ্গি।

তারপর যখন আরতি শেষ হয়, ঘুরে দাঁড়ান শঙ্করজী, তখন তাঁর শ্বেতচন্দনচর্চিত ললাট, কুঁদে-কাটা মুখ, আজানুলম্বিত গোড়েমালা পরা বুক আর আশ্চর্য উদাস দু'টি পদ্মপলাশ চক্ষু, দেখে সকলের মনেই একটি প্রশ্নের উদয় হয়, নদীয়ার গৌরাঙ্গ কি আবার অবতীর্ণ হয়েছেন এই কলির শেষপাদে?'

প্রৌঢ় শরীরে এত লাবণ্য?

প্রৌঢ় মুখে এত দীপ্তি?

প্রৌঢ় চোখে এত আলো?

নিত্য দেখা চোখ, তবু প্রৌঢ়া বৃদ্ধা নির্বিশেষে মহিলাকুল বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বলেন, 'কী চোখ দেখেছ? যেন কাজলপরা! হাত-পায়ের তেলোর রং দেখেছ? যেন আলতা-মাখা! মহাপুরুষের পরিচয়ই তো এইসব লক্ষণে।...আহা, নদের গৌরাঙ্গ না দেখার আক্ষেপ মেটালেন বাবা!'

কেউ বলে 'বাবা', কেউ বলে 'মহারাজ', কেউ বলে 'ঠাকুর'।

আমি কিন্তু ওসব কিছু বলি না, বলি 'গুরুদেব'। আমি ওটা 'শিক্ষক' অর্থে বলি। এসেছিলাম তো সন্দেহ কৌতুক আর তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে, তাই প্রচলিত সম্বোধনগুলো হাস্যকর ঠেকেছিল আমার কাছে।

কিন্তু সন্ধ্যারতির সময়কার ওই পঞ্চ-প্রদীপের শিখার কম্পনে, নিয়নের নীল আলোয়, ভারী ঘণ্টার গম্ভীর ধ্বনির ছন্দময় ধাক্কায়, আর গোড়েমালা পরা এই দেবপ্রতিম মূর্তির লাবণ্যে ক্রমশ আমিও যেন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। একদা যে কৌতুক আর তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকিয়েছি, সেকথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছি, আর যখন বহু গুণীজ্ঞানী পণ্ডিত, বহু মানগণ্য বুদ্ধিজীবী, চিন্তাজীবী এসে এই পদপ্রান্তে মাথা লোটান, তখন মনে হয়, 'আচ্ছা, এঁরা কি সবাই অন্ধ অবোধ? যত বুদ্ধিমান আমি?'

আবার যখন সরে আসি সেই আবেষ্টন থেকে, তখন ভাবি, আসেন তো (গুরুদেবের ভাষায়) ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু সে আশ্রয় কি মেলে এঁদের? প্রশ্ন তো সেইখানেই। এঁরা যে মন নিয়ে লটারির টিকিট কেনেন, সেই মন নিয়েই হয়তো ঠাকুরের কাছে আসেন। যার জীবনে যত ফাঁকি, যত ফাঁকা, তার তত ব্যাকুলতা।

একুশ

তবু বিকেল না হতেই মন টানতে থাকে। স্নান করে, কপালে একটু চন্দন-রেখা এঁকে, দুধ-সাদা শাড়ি-ব্লাউজ পরে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকি গাড়ি আসার আশায়।

এই গাড়ি পাঠানোর ব্যাবস্থার পর থেকে মঠের কেউই আর আমায় সুচক্ষে দেখে না, প্রত্যেকের চোখেই যেন বিরক্তির বিরূপতা, হিংসের জ্বালা। মুখভঙ্গিতে যেন এই অভিযোগ ফুটে ওঠে, 'খুব দেখালে বাবা! উড়ে এসে জুড়ে বসলে একেবারে!'

কিন্তু আমি কি করব?

আমার কি দোষ?

আমি তো আর আবদার করে এ সুযোগ আদায় করে নিইনি! শঙ্করজী নিজেই নাকি বলেছেন, 'দেবীমা না এলে কীর্তনে প্রাণ আসে না।'

আর নিজেই নাকি রোজ হুঁশ করে ড্রাইভার হরিচরণকে বলে দেন, 'ওরে দেবীমাকে ঠিক সময় আনতে যাস।'

কেন এই পক্ষপাতিত্ব?

সত্যিই কি তবে আমি ভগবতীর অংশ?

'ভগবান ভগবান' করলে মানুষ যেন কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েমানুষ। গুরুর এই পক্ষপাতিত্বে সুধাদি, অমলাদি, রাইকমল, ব্রজরাধা ঈর্ষায় জ্বলে মরে, টেনে টেনে বাঁকা বাঁকা কথা শোনায় আমায়, কিন্তু কই, গুরুর কাছে গিয়ে সোজা সতেজ কৈফিয়ত চায় না তো, 'দেবী না এলে যদি কীর্তনে প্রাণ আসে না, তবে এতদিন কি আপনি আমাদের প্রাণহীন গান শুনিয়ে রেখেছিলেন?'

চায় না কৈফিয়ত।

কিন্তু আমি হলে চাইতাম।

আমি চেয়েওছি, অন্য কারণে।

প্রথম প্রথম যখন দেখেছি প্রসাদ পাবার দিন পংক্তি-ভোজনে বসেও প্রসাদের দুর্লভ অংশটুকু পড়ল আমার পাতে, অথবা হরির লুঠের সময় সন্দেশের জোড়াটি পড়ল আমার হাতে, তখন লজ্জায় কুণ্ঠায় মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

চাইলাম একদিন কৈফিয়ত।

যখন দুপুরের বিশ্রামের পর বিগ্রহের সামনের সেই অর্ধ-বৃত্তাকার বারান্দায় পায়চারি করছেন অলস চরণে, নবীনদার অপেক্ষায়। চারটে বাজলে নবীনদা এসে ঘণ্টা দেয়, বিগ্রহের দরজার ভারী তালাটা খুলে ফেলে দরজা হাট করে দেয়।

তখনও চারটে বাজেনি (আমি সেদিন প্রসাদ পাবার পর মঠেই রয়েছি কী একটা উৎসব বাবদ) আমি গিয়ে উঠলাম সেই বারান্দার সামনে নাটমন্দিরে। স্পষ্ট সতেজ গলায় প্রশ্ন করলাম, 'সবাই তো আপনার শিষ্য, আমাকে তবে 'বিশেষ' করেন কেন?'

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন উনি। হয়তো এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি ওঁকে কোনোদিন। হয়তো ওর উল্টোটা শুনে থাকবেন কোনো জল-ভরা চোখ আর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে।

এটা অপ্রত্যাশিতই।

তাই হাঁটা থামিয়ে বললেন, 'কি বলছিস মা?'

আমি আমার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম। বললাম, 'উত্তর দিন।'

এবার আস্তে আস্তে ওঁর সেই নিখুঁত কাটের সুগৌর মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটি প্রসন্ন হাসির আলো। ওঁর আলতা-রাঙা ঠোঁটে ফুটে উঠল একটু মৃদু মধুর হাসির আভাস।

বললেন, 'এ প্রশ্নের আবার উত্তর কি রে? তুই আমার মা যে, তাই।'

'এখানের সবাই আপনার মা।'

'তুই হচ্ছিস ব্রহ্মময়ী মা।'

'না। আমি সাধারণ একটা মেয়ে।'

উনি মিষ্টি হেসে বলেন, 'তুই কি, তা কি তুই নিজে জানিস? তুই কি নিজেকে দেখতে পাস? যেমন আমি পাচ্ছি?'

আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল।

আমার মনে হল সার্চলাইট জ্বেলে উনি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন।

ভয়ে থর থর করে উঠল ভিতরটা।

আমার ভিতরে এখন কিসের কুটিলতা উঁকি মারছে সে তো আমি জানি। জানি, সেকথা ওই দেবোপম প্রৌঢ় মানুষটি সম্পর্কে ভাবাও মহানরক, তবু আমার মনের মধ্যে ছিল সে সন্দেহের গ্লানি।

আমি ভাবছিলাম ওঁর ওই কাজল পরার মতো চোখে যে দৃষ্টি, সে কি পিতৃদৃষ্টি? যে কণ্ঠ আমায় 'দেবীমা' বলে আদরের সম্বোধন করছে, সে কি পিতৃকণ্ঠ?

এ সন্দেহ দেখতে পাচ্ছেন তবে উনি?

আমার কিছুক্ষণ আগের সাহসটা হারিয়ে গেল। আমি আস্তে বললাম, 'তা হোক আমার লজ্জা করে। সবাই তো শিষ্য, সবাই সমান।'

উনি বললেন, 'এই তো পরীক্ষায় জয়ী হলি। আরও পরীক্ষা আসবে। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে তো সীতাদেবী হবি।'

তখন মনে হল ওঁর দৃষ্টিতে যে আলো, সে আলো স্বর্গের আলো। ওঁর কণ্ঠে যে মাধুর্য, সে মাধুর্য মন্দাকিনীর ধারার। মরমে মরে গেলাম।

মাথা হেঁট করলাম।

বাইশ

সেদিন বাড়ি ফিরেই দেখলাম শিপ্রা এসেছে।

শিপ্রা আসা মানেই দুরন্তর চিঠি আসা।

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর।

মনে হল ও যেন আমার উদ্ধারকর্ত্রী হয়ে এল। ভগবান বলে যদি সত্যি কেউ থাকে, তাহলে যেন এই চিঠিতে দুরন্তর ফেরার খবর থাকে।

কিন্তু থাকবে কেন?

সাত বছরের পাঁচটা বছর তো মাত্র শেষ হয়েছে। আরও সবচেয়ে দীর্ঘ দু'টো বছর।

সবচেয়ে দীর্ঘ বৈকি।

শুনেছি কোথায় নাকি কোন্ জেলখানায় একটা কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের আসামি উনিশ বছর এগারো মাস কতদিন যেন কারাযন্ত্রণা ভোগ করে মুক্তির কয়েকটা দিন আগে যন্ত্রণা অসহ্য মনে হওয়ায় আত্মহত্যা করেছিল। জানি না গল্প না সত্যি, তবু এটা ঠিক প্রতীক্ষার শেষ প্রহরটাই সবচেয়ে দীর্ঘ।

শিপ্রা বলল, 'তোকে দেখে মনে হচ্ছে অমিতাভবাবু এসে মাথার চুল ছিঁড়বে। এ তো রীতিমতো বৈরাগিনী অবস্থা! ঘরে আবার এই সব ঠাকুর-দেবতা!'

হেসে বললাম, 'তুই তো সবই জানিস।'

'জানি। কিন্তু এও জানি, জগতে সবচেয়ে বদলায় মানুষের মন।'

'তোর জানার জগতের বাইরেও অনেক কিছু আছে। বল এখন খবর। চিঠি আছে?'

ও একটু হেসে বলল, 'আছে চিঠি, কিন্তু তোর দুরন্তর নয়, নিতান্তই আমার।'

বলে একটা নেমন্তন্নর চিঠি বার করল। ছেলের অন্নপ্রাশন।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল।

জানি না কিসের সেই রাগ।

আশাভঙ্গের?

না হিংসার?

হয়তো তাই। মনে হল ও যেন আমার এই অস্বাভাবিক জীবনের সামনে ঘটা করে দেখাতে এসেছে ওর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের ঐশ্বর্যের ভাব।

রুক্ষ গলায় বললাম, 'তুমি তো জান, এখন আর এসব সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিই না আমি।'

শিপ্রা ম্লান গলায় বলল, 'খোকার মুখে-ভাত এ আর এমন কি সামাজিক ব্যাপার? ক'জনকে তো মাত্র বলছি।'

'ক'জনকে কেন? চিঠি-পত্তর ছাপিয়ে দিব্যি তো—'

ও আরও ম্লান গলায় বলল, 'চিঠিটা আমার সাধ। লোকেদের ছেলের ভাতে পাই। তা যাওয়া যদি নেহাত অসম্ভব হয়, জোর করব না।'

আমি হঠাৎ হেসে উঠলাম।

বললাম, 'বাবা, মেয়ে একটু ঠাট্টা বোঝে না। যাব, যাব, যাব। তোর খোকাকে আশীর্বাদ করতে যাব। তবে জানিস তো বৈষ্ণবের ভেক? খেতে-টেতে বলিস না। বলিস ওর শরীর খারাপ।'

ও কি বুঝল কে জানে।

বলল, 'আচ্ছা।' তারপর আস্তে আস্তে উঠে গেল।

আর হাসল না।

হয়তো ভাবল আমি আর ওদের জগতে নেই।

ভাবলাম, নাঃ, একটু সেজে-গুজে যেতে হবে নেমন্তন্নে। কলেজের বন্ধুরা আসবে। হয়তো শিপ্রার মুখে আমার বৈষ্ণবের ভেক-এর গল্প শুনেছে, হয়তো কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে আছে কেমন না জানি হয়ে গেছি আমি। তাজ্জব করে দেব তাদের। সাজে ঝলসাব, হাসিতে কথাতে ঝলসাব।

শিপ্রারও অভিমান ভাঙবে।

তেইশ

কিন্তু শিপ্রার অভিমান ভাঙবার এত গরজ কেন আমার? ভালোবাসার দায়?

ভেবে দেখলাম তাই বটে, তবে সে ভালোবাসাটা শিপ্রার জন্যে নয়। দুরন্তর ভালোবাসার দায়ে আমি শিপ্রার মন রাখতে বসছি। শিপ্রা রেগে গেলে যদি চিঠির ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়!

ন'মাসে ছ'মাসে তবু আসে তো খবর।

জানতে তো পারি ও বেঁচে আছে।

শিপ্রা চলে গেলে হঠাৎ খুব কাঁদলাম, জানি না কেন। শিপ্রাকে আঘাত করলাম বলে? চিঠি পাইনি বলে? নাকি সেই তখন মাথা হেট করে ফিরে আসতে হয়েছিল বলে?

মনে হল হয়তো তাই।

সেই গ্লানিই আমাকে রুক্ষ করে তুলেছিল।

তখন মনে হতে লাগল, দেবতা না ছাই, লোকটা সম্মোহন জানে। আর জানে কথার চাতুর্য। কথার চাতুরিতেই দেবতার আসনের টিকিট সংগ্রহ করে রেখেছে।

যেই অসুবিধেয় পড়ে যায়, সেই কথার জাল ফেলে। অগ্নিপরীক্ষা, অনেক কিছু বলে আমাকে জব্দ করে ফেলে। আমি আর যাব না। আমার আর ভেক-এর দরকার নেই। মাকে বলব, 'আশা করে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু পেলাম না ওখানে।' বউদিকে বলব, 'তোমরা এত ভক্তি কর তাই বাজিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।'

তারপর?

তারপর বলব, 'আমি আবার পড়ব। এম. এ-টা দিয়ে ফেলব।'

দু'টো বছর ওতেই কেটে যাবে। তার মধ্যে আমাকে কেউ জ্বালাতে আসবে না। তাছাড়া মা-র সেই ভয়ঙ্কর আবেগটা চলে গেছে। মা যেন মেনেই নিয়েছেন আমার এই জীবন। আমি মা-র কাছে না-শুলেও মা-র হেঁসেলে যে খাই, সেটাতেই মা-র সুখ।

আর—আর হয়তো বা—এই সংসার রণক্ষেত্রে প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে একান্ত নিঃসহায় হয়ে পড়ার থেকে, এই পৃষ্ঠবলটুকু মা-র কাছে এখন ভাগ্যের দান বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া বউদির বোনের সঙ্গে মা-র মেয়েকে তুলনা করে মা যেন অনেকটা উঁচু আসনে উঠে গেছেন।

দিদি থাকে রেঙ্গুনে, মেজদি কোয়েম্বাটুরে।

ওরা কদাচ আসে। অথবা আসে না। ওদের সঙ্গে এ সংসারের নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে, হয়তো বা মা-র সঙ্গেও। দূরে থাকতে থাকতে বুঝি মন থেকেও দূরে চলে যায়। মা-র ব্যবহার দেখলে মনে হয়, একটাই মেয়ে আমি মা-র।

দু'-এক বছরে দিদিরা কেউ একটা চিঠি দিলে, মা আমায় বলেন, 'ওরে বেবি, তুই-ই একটা উত্তর দিয়ে দে। আমার তো সেই সাতজন্ম দেরি হবে!'

বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে আমার জন্মের আগে, মেজদির আমার নিতান্ত শৈশবে। দেখেছিই বা কবে? তবু আমিই চিঠি লিখি গুছিয়ে গুছিয়ে। অনেকদিন পরে দিদিরা সে চিঠির উত্তর দেয়, আমাকে নয়, মাকে। হয়তো লেখে, 'বেবি বেশ গুছিয়ে চিঠি লিখতে শিখেছে।' হয়তো লেখে, 'বেবির বিয়ের বয়েস পার হয়ে গেল। আমাদের কোন্‌কালে বাড়িছাড়া করে দিয়েছ। কোলের মেয়েটিকে বেশ কোলে রেখে দিয়েছ।'

দূরে থাকলেও বয়সের হিসেবটা ঠিক রেখেছে।

কিন্তু আর কি চিঠি আসে দিদিদের?

কই?

বহুদিন তো আসেনি।

মাকে হঠাৎ জিগ্যেস করলাম।

মা ভাঁড়ারের দরজায় বসে চালের কাকর বাছছিলেন। আমার ঠাকুরের ভোগ হয়, একটি কাঁকর থাকলে চলে না।

আশ্চর্য, এ সব যে আমি শিখলাম কোথা থেকে!

মা হঠাৎ আমার মুখে এরকম একটা সংসারী কথা শুনে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এসেছিল।'

'কার? বড়দির? না মেজদির?'

আঃ, কতদিন এই নামগুলো উচ্চারণ করিনি। বেশ লাগল।

মা তেমনি ভাবেই বললেন, 'দু'জনেরই।'

'কই বলনি তো আমায়? জবাব দেওয়া হল না।'

মা আস্তে বললেন, 'দিয়েছি। আমিই দিয়ে দিয়েছি। তুমি ব্যস্ত থাক।'

সহসা লক্ষ্য পড়ল, মা আর আমায় 'তুই' বলেন না। কতদিন বলেন না?

আমার অভিমান হল। বড়ো মেয়েদের চিঠি মা নিজে লিখেছেন বলে নয়, আমাকে 'তুমি' বললেন বলে।

অথচ মা আমায় 'তুমি' করে কথা বলছেন অনেকদিন। বেবির বদলে আলতো করে 'দেবী'ও বলেছেন কতদিন যেন। দাদাও যেন ওই 'ব' আর 'দ'য়ের মধ্যবর্তী কি বলে।

বউদি অবশ্য দেবী বলে না, কিন্তু বেবিই বা কবে বলে? ডাকেই না তো!

হঠাৎ আমার সেই পুরনো নামটার জন্যে ভয়ানক মন কেমন করে উঠল। মনে পড়ে গেল দুরন্তর সেই প্রথম আদরের অভিব্যক্তি।

বেবি, বেবি! কচি খুকু! আহা-হা! লজেন্স খাবে খুকু? ডল্ পুতুল নেবে?

মনে হল এসব নিশ্চয়ই আর মনে নেই ওর। ও বিচ্ছিরী রকম বদলে গেছে। ও হয়তো কাটখোট্টা হয়ে গেছে, হয়তো নিগ্রোদের মতো দেখতে হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে ভাবতে বসলাম ওইসব, তারপর কাঁদতে বসলাম।

বসলাম ঘরের দরজা বন্ধ করে সন্ধ্যার ধ্যান-ধারণার ছুতোয়।

কেঁদে কেঁদে বললাম, 'জীবনের সব সোনার দিনগুলো বরবাদ করে দিয়ে সোনা কুড়চ্ছো তুমি! ফিরে এসে যদি আমায় না পাও?'

তারপর চোখ মুছে উঠলাম।

মনের জোর করে বললাম, পাবে না কেন, আমি তো আর সত্যি বদলাচ্ছি না।

আর ও যদি বদলে আসে? ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্‌ করে দেব সেই বদল।

চব্বিশ

পরদিন বাড়িতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

শানু এল তার নতুন বরকে নিয়ে।

শুনলাম আগে থেকে নাকি নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

বউদি দেয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'কী আর করব, মায়ের পেটের মা-মরা ছোটোবোন, ফেলব কি করে? ভাই-ভাজ তো ত্যাগ করেছে, ও বেচারী যায় কোথায়?'

সত্যি, যায় কোথায়? আদর খাবার একটা জায়গা তো দরকার ওর।

অতএব এল।

নতুন শাড়ি-গহনায় ঝলমলিয়ে ঠিক নববিবাহিতার মূর্তিতেই এল। চোখের কোণে সেই ঔজ্জ্বল্য, মুখের হাসিতে সেই মাধুর্য। আগেকার লাজুক লাজুক কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত ভাবটা আর নেই, মুখে-চোখে আর এক মোহময় লজ্জার আবেশ।

আগে আমি দেখিনি, মা এসে চুপি চুপি বলেছিলেন, 'যা-ইচ্ছে হচ্ছে এখন সংসারে। শানু তো বর নিয়ে নেমন্তন্নে এল। মাংস রান্না হচ্ছে ঘটা করে। চপ-কাটলেটও হবে মনে হয়।'

সব কিছু শুনে হঠাৎ মনে হল, এখন খাবার ঘরের টেবিলে বসেই ওসব খেতে পারবে শানু সবার সামনে।

তার মানে 'বাধা' জিনিসটা কেবলমাত্র একটা লোকাচার।

লজ্জা জিনিসটা শুধু একটা কাগজের দেয়াল।

তাহলে আমারও কিছু ভাবনার নেই।

আমিও আবার আমার এই ব্রহ্মচর্যের খোলস ফেলে সহজেই রঙে রসে উথলে উঠতে পারব।

মা বললেন, 'সিঁদুর পরেছে সিঁথি জুড়ে।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বিয়ে হয়েছে, পরবে না কেন?'

মা ভয়ে ভয়ে সরে গেলেন।

মা-র তাঁর এই দেবীকন্যার বিরক্তিতে বড়ো ভয়।

পঁচিশ

আমি অবশ্য নিজে উঠে দেখা করতে গেলাম না। শানুই এল একসময়।

ঘরের বাইরে অস্ফুট একটু কণ্ঠ শুনলাম, 'এই হচ্ছে দিদির ননদের ঠাকুরঘর।'

শানুও আমায় আর 'বেবি' বলল না, বলল 'দিদির ননদ'।

তারপর ঘরে এসে দাঁড়াল দু'জনে হাসিমুখে।

শানুর মুখে নবোঢ়ার রং, শানুর বরের মুখে নতুন বরের খুশি। ওরা যে পরস্পরকে ভালো-বেসেছে তাতে সন্দেহ নেই।

এতক্ষণ ভাবছিলাম, দেখা হলে বলব শানুকে, 'দেখলে তো শানু, জীবন জিনিসটা কত দামী?

দেখলে তো ওকে হারিয়ে ফেললেই 'হারিয়ে গেল' বলে পরকালের পথ খুঁজতে বসতে নেই। আবার তাকে আহরণ করে নিতে হয়।'

কিন্তু বলতে পারলাম না।

হঠাৎ ওদের সামনে নিজেকে ভারি বেচারি মনে হল। মনে হল, আমাকে ওরা করুণার দৃষ্টিতে দেখছে। আমি ওসব কথা বললে ওরা হেসে উঠবে। বলবে, তুমি জীবনের বোঝ কি হে?

অতএব আমি 'দেবী মা'র খোলসে ঢুকে পড়লাম।

খুব নরম মিষ্টি আর করুণার হাসি হেসে বললাম, 'সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় শানু!'

শানুর বরটা একটু প্রগল্‌ভের মতো বলে উঠল, 'আর আমায় বুঝি খুব খারাপ দেখছেন?'

আমি আরও মিষ্টি হেসে ওকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললাম, 'তোমায় তো আগে দেখিনি ভাই!' মনে হল অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলাম ওদের থেকে।

তারপর ওদের হাতে আমার ঠাকুরের প্রসাদ দিলাম।

আর তারও পর শানু ছোট্ট একটি রুপোর মালা দিয়ে আমার ঠাকুরকে প্রণাম করে লাজুক হেসে বলল, 'আমার মানত ছিল।'

চলে গেল তারপর।

অনেকদিন পরে এ বাড়িতে হাসি আমোদ হই হুল্লোড় শোনা গেল। দাদার খোলা গলার হাসিটা যেন অপরিচিত মনে হল।

ছোট্ট একটি পাষাণ দেবতার ভারে পাহাড় চাপিয়ে রেখেছি আমি সংসারে, আজ ওরা সে সংসারে আর একটা জানলা খুলে একটু নিশ্বাস নিচ্ছে।

শুনলাম দাদার ছেলেটা নাকি এই ক'ঘণ্টাতেই মেসোর পরম ভক্ত হয়ে গেছে। বলছে নাকি মাসির সঙ্গে আসানসোলে চলে যাবে।

আচ্ছা, নিত্য হাজার ইষ্টনামের অবদানেও ঈর্ষা জিনিসটা যায় না কেন?

মঠে দিদিরা আমায় ঈর্ষা করে, আমি তুচ্ছ শানুকে ঈর্ষা করছি। অথচ ওই ছেলেটার দিকে ফিরেও তাকাই না আমি, যে ছেলেটা পিসিকে না ভজে মাসিকে ভজতে চাইছে।

ছাব্বিশ

পরদিন বউদিকে তাজ্জব করে দিয়ে ওর ঘরে গিয়ে বললাম, 'এই বউদি শোন, তোমার কী সব বেনারসী-টেনারসী আছে বার কর তো! আমায় ধার দাও একটা ঘণ্টাকয়েকের জন্যে।'

বউদি হাঁ করে তাকাল।

আমি মজা পেলাম।

আবার তেমনি হাল্কা গলায় বললাম, 'আরে শোন তাহলে, নিজের ভালো শাড়ি-টাড়ি তো পরে পরে ঠিক করেছি, এদিকে শিপ্রা ছেলের ভাতের নেমন্তন্ন করে গেছে। ভীষণ নাকি ঘটার ব্যাপার, খুব সেজেগুজে যাবার হুকুম।'

এটা বানালাম। লজ্জা ঢাকলাম একটু।

কিন্তু তাতে কি?

আমার সব কিছুই তো বানানো। সবই তো মিথ্যে। সমুদ্রে শয়ন যার, গোস্পদে কি ডর তার?

বউদি কৃতার্থমন্য হয়ে ওর সমস্ত দামী শাড়িগুলো আলমারি থেকে বার করে খাটের ওপর স্তূপাকার করে রাখল। তারপর একখানা সাদা জরির ছোটো ফুটকি দেওয়া গাঢ় সবুজের হালকা বেনারসী তুলে সাবধানে বলল, 'এটা তোমায় খুব মানাবে।'

সরু একটা মুক্তোর মালাও দিল ভয়ে ভয়ে, দিল মুক্তোর কানবালা।

আমার ঘরে আয়না নেই, বউদির ঘরেই সাজতে বসলাম আয়োজন উপকরণ নিয়ে।

বউদি খুব সাবধানে বলল, 'ড্রেসিং-টেবিলে পাউডার-টাউডার সবই আছে। তোমার পুরনো বন্ধুবান্ধবরা আসবে সবাই। কত সাজবে তারা!'

বলে চলে গেল।

হঠাৎ ভারী আশ্চর্য লাগল। আর ভারী লজ্জা হল।

মনে হল বউদির প্রতি এতদিন অবিচার করে এসেছি। মনে করেছিলাম শাড়ির প্রসঙ্গে বউদির মুখে হয়তো একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠবে।

কিন্তু বউদির চোখের কোণে বাষ্পের আভাস দেখলাম।

তাই তাড়াতাড়ি পালাল বউদি।

তার মানে আমার জন্যে তার মনেও অনেকখানি মমতা সঞ্চিত আছে। আমার এই অকারণ কৃচ্ছ্রসাধনে দুঃখ পায় বউদি। হয়তো গতকাল যখন শানুর পাতে ভেটকীর ফ্রাই ভেজে ভেজে দিচ্ছিল, তখন আমার জন্যে ওর মন কেমন করছিল। জিনিসটা একদা ভারি প্রিয় ছিল আমার।

মনে ভাবলাম, কাল থেকে বউদির সঙ্গে আর একটু ভালো ব্যবহার করতে হবে। বড্ড যেন অগ্রাহ্য করি। ওর আবিষ্কৃত মঠটাকে দখল করে নিয়ে আমি ওকে অবজ্ঞার চোখে দেখি। এটা ঠিক নয়, এটা অসভ্যতা।

তারপর বউদির মান রাখতেই যেন বউদির বড়ো আয়নাদার ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সাতাশ

কিন্তু এ কী!

কতদিন পরে নিজেকে দেখলাম আমি!

এ কী হতশ্রী চেহারা হয়েছে আমার!

আমার মঠের দিদিরা আমায় বলে, 'কী রূপ!'

আমি সে প্রশস্তি পরিপাক করি।

আমার গুরুদেব বলেন, 'মা আমার পূর্বজন্মে ব্রজের গোপিকা ছিল।' আমি নতমুখে সে গৌরব গ্রহণ করি, আর বড়ো আরশীতে না দেখলেও নিজে মনে ভাবি আমি আমার এই কৃচ্ছ্রসাধনের জ্যোতিঃপ্রলেপমণ্ডিত কৃশতনুতে, এই তৈলবিহীন রুক্ষ চুলে ঘেরা মুখে, সত্যই অপরূপা।

আর এ-কথাও ভাবতে ছাড়ি না, মঠে আমার প্রাধান্যের মূলে হয়তো এই রূপও কিছু কাজ করে।

কিন্তু আজ এই এক দাম্পত্যজীবনের বহু চিহ্নমণ্ডিত ঘরের যুগলশয্যায় স্তূপীকৃত করা শাড়ির পাহাড়ের চোখ-ধাঁধানো বর্ণবৈচিত্র্যের মাঝখানে বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের খালি হাত আর সরু হলদে পাড় ধুতি পরা হতশ্রী চেহারাটা এনে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গহাসি হাসল।

যেন দুয়ো দিল আমায়।

যেন বলে উঠল, 'কী মুখ্যু, কী মুখ্যু! মশা মারতে কামান দেগেছে!'

সেই ব্যঙ্গহাসির দিকে তাকিয়ে আমি সহসা হিংস্র হয়ে উঠলাম। উগ্র হয়ে উঠলাম। আমি বউদির সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ নিয়ে নিখুঁত করে সাজালাম নিজেকে।

আশ্চর্য, কিছুই তো ভুলে যাইনি।

কাজল পরলাম সরু রেখায়, কুঙ্কুমের টিপটি আঁকলাম সযত্নে, কানে দোলালাম মুক্তোর কানবালা, গলায় সরু মুক্তোর হার।

হিংস্র জবাবের মনোভাব থেকে কখন যেন শোকাচ্ছন্নের মতো অবস্থা ঘটল। মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইলাম নিজের প্রতিচ্ছায়ার দিকে।

মনে হল বিয়ের সাজ সাজছি আমি।

জানলা দিয়ে এসে পড়া পড়ন্ত সূর্যের 'কনে দেখা আলো' সেই ভাবনাকে আরও মধুর করে তুলল।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না, দাদা ঘরে ঢুকল অফিস থেকে এসে। কোমল স্নেহের গলায় বলল, 'নেমন্তন্নে যাচ্ছিস? বন্ধুর ছেলের ভাতে? পৌঁছে দিয়ে আসব?'

তার মানে দাদা ঘরে ঢোকবার আগেই খবর শুনেছে। আর দাদার মনটা খুশি হয়েছে সে খবরে। দাদার স্নেহের সুরটাই সেই খুশির সাক্ষী।

কিন্তু আমার এ কী হল?

আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বয়ে যাওয়া এক দুর্দান্ত লজ্জার ধাক্কা যেন বিদ্যুতের শক-এর মতো ধাক্কা মেরে ছিটকে সরিয়ে দিল আমায় আয়নার কাছ থেকে। ভয়ঙ্কর রাগ হল দাদার উপর, ভয়ঙ্কর রাগ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর। সারা শরীরের মধ্যে ধ্বনিত হল, ছি ছি ছি! এ আমি কী করেছি!

আটাশ

কেমন করে যে ছিটকে সে ঘরের থেকে চলে এসেছিলাম তা জানি না, কেমন করে যে সেই শাড়ি-গহনাগুলোর ভারমুক্ত হয়েছিলাম, তাও জানি না। শুধু মনে আছে খুব হাঁপাচ্ছিলাম।

এই সময় বুড়ি, গোপালের মা এসে দরজায় দাঁড়াল, 'দিদি, তোমার গাড়ি এয়েছে।'

গাড়ি এসেছে!

কোথাকার গাড়ি?

শিপ্রার পাঠানো?

আরে না না, মঠের গাড়ি। হরিচরণ এনেছে। কনে দেখা আলো মুছে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে গেছে যে। আরতির সময় হয়েছে।

কৃতজ্ঞতায় মনে মনে দেয়ালে মাথা কুটে বললাম, 'ঠাকুর, তুমি আছ, তুমি আছ।' তারপর স্নানের ঘরে ঢুকে ধুয়ে ফেললাম মুখের সব রং, মুছে ফেললাম চোখের কাজল, কপালের টিপ। আলনা থেকে নিজের দুধ-সাদা শাড়ি-ব্লাউজটা পরে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেলাম, 'ভীষণ ভুলে গিয়েছিলাম বউদি! আজ যে মঠে একটা বিশেষ উৎসব। শিপ্রার বাড়ি থেকে কেউ নিতে এলে বলে দিও।...তোমার শাড়ি-টাড়িগুলো অগোছালো করে রেখে গেলাম বাপু—'

বউদির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবার সঙ্কল্পটা পালন করলাম। 'বউদি' বলে ডাকলাম, অনেকগুলো কথা বললাম।

কিন্তু বউদি কি বুঝল আমি ভালো ব্যবহার করেছি? নাকি সেও ছি ছি করে উঠে নিশ্বাস ফেলল।

জানি না কী করল।

আমি তো গাড়িতে উঠে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

যেমন নিশ্বাস ফেলে লোকে আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার হয়ে নিজের এলাকায় পৌঁছে যেতে পারলে।

কিন্তু আততায়ী কে?

তাও জানি না। ভেবে দেখবারও সময় নেই, আরতির সময় পার হয়। হরিচরণ পড়ি মরি করে

গাড়ি চালাচ্ছে। মঠের ব্যাপার, ঘড়ির কাঁটায় চলে। মুখের রং তুলতে যেটুকু দেরি করে ফেলেছি আমি, তাতেই দেরি।

তবু দেরি হল না, ঠিক সময় এসে পা দিলাম মঠের চৌহদ্দিতে, মালঞ্চ আর তুলসীবনের কেয়ারির মাঝখানের পথ দিয়ে যখন নাটমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন আরতির ওয়ার্নিং বেল বাজছে। ঢং ঢং ঢং।

যে যেখানে ছড়িয়ে আছে, এসে স্থির হয়ে বসবে, তাই এই জানান।

আমি নাট-মন্দিরে উঠলাম না, অভ্যস্ত নিয়মে চত্বরের পাশ দিয়ে চলে গেলাম বিগ্রহের ঘরের পিছনে। ভক্তপদধূলি মাথায় ঠেকিয়ে সিঁড়িতে পা দিলাম। উঠে গিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দাঁড়ালাম যেখানে শঙ্কর মহারাজও দাঁড়িয়ে আছেন জীবন্ত বিগ্রহের মতো। সেই দীর্ঘোন্নত গৌরকান্তি, সেই গায়ের রঙে এক হয়ে যাওয়া দুধে-গরদের ধুতি-চাদর, সেই আজানুলম্বিত গোড়েমালা, সেই শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান চন্দনচর্চা। মাথা নুইয়ে এল।

সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলাম।

এই প্রথম এই প্রণাম।

আমি কখনও আমার ওই মঠের দিদিদের কিংবা ব্রহ্মচারী দাদাদের মতো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি না, ওটা দেখলে আমার হাসি পায়, সেকেলে লাগে, অতিভক্তি মনে হয়। আমার প্রণামের ভঙ্গি নতজানু হয়ে আস্তে চরণে মাথা ঠেকানো। চরণে মানে চরণের প্রান্তে। চরণ স্পর্শ করা নিষেধ।

কিন্তু আজ আমি 'সেকেলের' মতো লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহে গেল। লজ্জার নয়, আনন্দের।

গুরুদেব আজ ইচ্ছে করে নিয়ম ভাঙলেন, স্পর্শ দিলেন মাথায়। তার মানে বুঝতে পেরেছেন আমার চাঞ্চল্য। তাই তাকে প্রশমিত করতে—

কী দয়া, কী করুণা!

ভাগ্য আমার জন্যে এত ঐশ্বর্যও তুলে রেখেছিল!

আরতি অন্তে হরিরলুঠের কাড়াকাড়ির সময় গুরুদেব নিজে আমার হাত টেনে নিয়ে একটি সন্দেশ তুলে দিলেন, বললেন, 'মায়ের মনে আজ বড়ো চাঞ্চল্য, তাই না? বড়ো ভয় পেয়েছিস?'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। সত্যিই কি অন্তর্যামী?

নইলে কেমন করে জানলেন, ভয় পেয়েছি! আগে হলে হয়তো ভাবতাম, বুঝতে পারবেন না কেন, মানুষ চরানোই তো পেশা। হয়তো ভাবতাম, গুরু হবার আগে থট্‌রিডিংটা শিখে নিতে হয় বোধহয়।...কিন্তু আজ আর সে কথা মনে এল না। আজ আমি অবাক হলাম, বিহ্বল হলাম। তার মানে খোলসের চাপে আমার সত্তাটা তরলিত হয়ে যাচ্ছে।...ছদ্মনামের আড়ালে আমার সত্যিকার নামটা ঢেকে যাচ্ছে। আর তাতে আমি প্রতিবাদ করে উঠছি না, বরং যেন একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করছি।

আচ্ছা, আজও কি রাত্রে বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে ভাবব, 'লোকটা জাদু জানে?' ভাবব, 'আমাকে কবলিত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে কেন ও?'

কিন্তু বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত কি হই আজকাল? রাত্রে কি পায়চারি করি? স্নানের ঘরে গিয়ে শাওয়ারের তলায় মাথা পাতি?

কই, মনে পড়ছে না তো?

কবে শেষ এ রকম করেছিলাম?

ভুলে গেছি।

আজকাল বহুক্ষণ কীর্তনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মিলিয়ে দোহার দিতে, আর কীর্তন গান গাইতে

এত পরিশ্রম হয় যে, রাতে যে-পাশে শুই, সকালে সেই পাশে উঠি। তার মানে খোলসটা ক্রমশ এঁটে বসছে। আমি সেটা রোধ করতে পারছি না। আমি যেন দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করছি।

উনত্রিশ

পরদিন কিন্তু ভয়ানক একটা গ্লানি নিয়ে উঠলাম। মনে হল দাদা-বউদির কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। বাস্তবিক কী হাস্যকর কাণ্ডই করলাম কাল! কী দরকার পড়েছিল সাজবার, আর সাজ ঘোচাবার?

হঠাৎ হরিচরণের উপরও রাগ হল। ও যদি ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হাজির না হত! আমাকে নিয়ে যেন কে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বিকেলবেলা শিপ্রা এল।

বলল, 'জানতাম আসবে না।'

'জানতে?'

'তা ছাড়া কি? আমার ছেলের কি এত ভাগ্যি হবে?'

'এই ছিঃ, তোমার ছেলেকে দেখে আসব একদিন।'

'দেখা যাক কবে সাতমণ তেল পোড়ে।'

কথার পালা শেষ করে ও কাজের কথায় এল। বলল, 'এই দেখ কাণ্ড কি এসেছে। ভাবলাম তুমি আসবে, তোমরা হাতেই দেব। তা এলেই না।'

তারপর ব্যাগ থেকে চিঠি বার করল।

দুরন্তর চিঠি।

লিখেছে—

'ভয়ঙ্কর একটা সুখবর দিচ্ছি নাও। কিন্তু খবরদার শুনে যেন আহ্লাদে হার্টফেল করে বোসো না। শুধু বিগলিত হও, উল্লসিত হও। শোনো, আমার ওপরওলার সঙ্গে সাংঘাতিক রকম ভাব করে ফেলে একদিন আমার জীবনের সব কথা বলে বসেছিলাম, তার ফলে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার দু'মাস ছুটি মঞ্জুর করেছে বিয়ে করে ফেলবার জন্যে। আবার তার সঙ্গে যাতায়াতের খরচা। ভাবতে পারো? অবশ্য ওটা একা আমার।...নিকষ কালো মুখে দুষ্টু দুষ্টু হেসে বলল—ফেরার সময় তোমার খরচা আছে। বউকে নিয়ে আসবে। ওটা কিন্তু কোম্পানি দেবে না। তবে ফিরে এসে আলাদা বাড়ি পাবে।... ভারি ভালো লোক! তাছাড়া—আমার কাজে এত বেশি সন্তুষ্ট যে নিয়ম ভেঙে সুযোগ দিচ্ছে। আমার দলের আর সবাই আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষিত। এর পর আবার যখন একটি সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে ফিরব, রাগে বোধহয় আমার মুখ দেখবে না।'

তারপর টাকাকড়ি, এখানের ব্যাঙ্ক ওখানের ব্যাঙ্ক, তার নিয়মকানুন, কত কি যেন লিখে শেষকালে লিখেছে, 'একমাস পরেই রওনা দিচ্ছি। তার আগে তোমায় আমার এখনকার একটা ফটো পাঠাব, যাতে দেখে সহজে চিনতে পার। কে জানে যদি বদলেই গিয়ে থাকি।...এই একমাস বোধহয় রাত্রে ঘুমোতে পারব না, কারণ এখন থেকেই যা রোমাঞ্চ হচ্ছে।...এখানে এসে তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা নেই। আগে ভয় ভয় করত, এখন সাংঘাতিক ভাবে এই বন্য সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে গেছি। দেখ, তোমাকেও পড়তে হবে প্রেমে।...আরে না না, তুমি শুধু আমার প্রেমে ডুবে থেকো।

ইতি

তোমার শ্রীদুরন্ত।'

কতদিন ধরে কোনো অজানিত দেশে পড়ে আছে দুরন্ত, কেমন তার কাজ, কেমন সহকর্মীরা, কেমনই বা প্রভু, কী তাদের ভাষা, কী আচার-আচরণ, তবু ওর চিঠির ভাষা বদলায়নি। যে ভাষাটা ঠিক ওর মুখের ভাষারই মতো। কারণে অকারণে 'ভয়ঙ্কর,' 'সাংঘাতিক', 'অদ্ভুত,' 'অপূর্ব'।

ভাষা বদলায়নি, তার মানে স্বভাব বদলায়নি।

অথচ আমি আমার নিজের কেন্দ্রে থেকেও ভয়ঙ্করভাবে বদলে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি কি আমার কেন্দ্রে আছি?

শিপ্রা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

কারণ শিপ্রা বুঝে গেল আমার সেই বদলটা। এতদিন ধরে ও আশা করেছিল, প্রয়োজন ফুরোলেই আমি আমার এই মিথ্যাচরণ ভেঙে ফেলে প্রকাশিত হব, কারণ ওকে আমি ষড়যন্ত্রের সাক্ষী রেখেছিলাম। ও বলেছিল, 'তোর বিয়ের দিন আমি তোকে সাজাব।' বলেছিল, 'শবরীর প্রতীক্ষার আর-এক ইতিহাস সৃষ্টি করছিস তুই।'

কিন্তু আজ বুঝতে পেরে গেল আমার জগৎ আর ওর জগৎ ভিন্ন হয়ে গেছে। বুঝতে পারল, ভয়ঙ্কর সুখবরবাহী ওই চিঠিটা আমাকে আর এখন উল্লসিত করে তুলতে পারল না। খুব ভালো করে পড়লামও না আমি।

ত্রিশ

নাঃ, সত্যিই ভালো করে পড়তে পারিনি।

ওর সুখবরটা হঠাৎ যেন আমার বুকে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিয়েছিল। মনে হল যেন একখানা লোভের হাত এগিয়ে আসতে চাইছে আমার শান্তির বাসা ভেঙে দিতে।

মনে হল সে হাত অশুচি।

তবে? আমি কেন এগোতে দেব সে হাত?

আমি আমার নিভৃত শান্তি, আমার শুভ্র পবিত্রতা কলুষিত করতে দেব কেন?

কে ও?

আমার একদার মাস্টারমশায়ের আশ্রিত একটা বন্য বর্বর বাজে ছেলে। লেখাপড়া ছেড়ে টাকা টাকা করে ছুটে গিয়েছে আফ্রিকার জঙ্গলে। কে জানে কী খাচ্ছে কী না-খাচ্ছে, কী অপবিত্রতার মধ্যে জীবন যাপন করছে, ওর ওই লোভের হাতে নিজেকে সমর্পণ করব আমি?

ছিঃ! কেন?

এক সময় একটু ছেলেমানুষী ভালোবাসার খেলা খেলেছিলাম বলে? সেই দাবিতে ও আমায় টেনে নিয়ে যাবে আরও বর্বরতার মধ্যে?

না না, অসম্ভব।

ওর সঙ্গে আর আমার জীবনের ছন্দ মিলবে না।

আমার জীবনের ছন্দ শান্ত স্নিগ্ধ শুদ্ধ।

কিন্তু পুজো করতে বসে মন বসাতে পারছি না কেন?

বারে বারে ওই দেবমূর্তির জায়গায় একটা অশান্ত অস্থির-মূর্তির ছায়া পড়ছে কেন? ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা বোধ করছি কেন? এ কি অশুচি চিন্তার গ্লানির যন্ত্রণা? না খোলস ভেঙে পড়বার আকুতি?

আমি বুঝতে পারছি না।

আমার ভয় করছে।

মনে হচ্ছে ওই প্রবল হাত আমায় এই শান্তির ছন্দের মধ্যে থাকতে দেবে না। টেনে নিয়ে যাবে, লুঠ করে নেবে।

নিক তবে, সর্বস্ব নিক আমার।

নিজের তৈরি যে জালে আটকে পড়ে ছটফট করছি আমি, সে জাল থেকে উদ্ধার করুক আমায় ছিঁড়ে খুঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করে।

লজ্জা করবে?

কই, শানুর তো লজ্জা করল না?

শানু তো মুছে-ফেলা সিঁথিতে আবার সিঁদুর তুলেছে। তবে আমার এই কুমারী সিঁথির শুভ্রতা রক্তিম করে তুলতে লজ্জা কি? সেই রক্তিম সিঁথি নিয়ে আমি তো হাততালি দিয়ে বলতে পারব সবাইকে—দেখ, এতদিন কেমন ঠকিয়ে এসেছি তোমাদের! এই অভিনয়টি না করলে তোমরা আমায় প্রতীক্ষার স্বস্তি নিয়ে টিকতে দিতে কি?

আচ্ছা, কাল থেকেই কি তবে সেই হাততালিটা দিতে আরম্ভ করব আমি? সকালে উঠে সবাইকে দেখাব এই চিঠিটা? তারপর বলব—

একত্রিশ

নাঃ, বলিনি সকালে উঠে।

আগে আসুক ও।

কে বলতে পারে হঠাৎ ওই ছুটিটা না-মঞ্জুর হয়ে যাবে কি না।

যেমন চলছে তেমনিই চলুক তবে।

এই আমাদের পুজো-জপ-ভোগ-আরতি-কীর্তনের ফুল দিয়ে মালা গাঁথা।

হ্যাঁ, এক-একটি দিনকে এক-একগাছি ফুলের মালার মতোই লাগে আমার।

যোগ হতে থাকে মালার সঙ্গে মালার, যেমন যোগ হয় জপের সঙ্গে জপের।

তার সঙ্গে দিন গুনছি কবে ওর ছবি আসবে।

কিন্তু ছবি এল না।

ছবির আগে নিজেই চলে এল।

ও সমুদ্রের ভেসে এল না, আকাশে উড়ে উড়ে এল।

বত্রিশ

তখন কনে দেখা আলো ঝিকমিক করছে, আমি স্নান সেরে কপালে চন্দনসাজ করে নিরাভরণ নির্মল দেহে আমার সেই দুধ-সাদা মিহি শাড়ি-ব্লাউজ পরে অপেক্ষা করছি হরিচরণের গাড়ির শব্দের হঠাৎ দাদা এসে ঘরে ঢুকল।

একটু যেন উত্তেজিত, একটু যেন বিস্মিত।

'দেবী, দেখো তো কে একজন এসে দেখা করতে চাইছে তোমার সঙ্গে—'

দাদা কোনো নাম করেনি, তবু আমি বুঝতে পারলাম, আমার সমস্ত শরীর হঠাৎ হিম হয়ে গেল। আমি কিছু বলতে পারলাম না, শুধু তাকিয়ে রইলাম দাদার দিকে।

দাদা নিজেকে একটু সামলে নিল, বলল, খুব সম্ভব তোমার কোনো গুরুভাই-টাই হবে। বলছে পশ্চিম আফ্রিকায় ছিল অনেক দিন। তুমি নাকি জানো আসবে। জাহাজে আসার কথা ছিল, হঠাৎ প্লেনে সিট পেয়ে—'

দাদা নিজেকে সামলাল, আমি বেসামাল হলাম। আমি থরথরিয়ে উঠলাম। তাই কী বলব বুঝতে না পেরেই বুঝি উত্তেজিত গলায় বলে উঠলাম, 'পাগল নাকি!'

'কী? তুমি চেনো না?'

'কক্ষনো না।'

'কী আশ্চর্য! তবে কি কোনো বদলোক—' দাদা বলল, 'কিন্তু দেখলে তো—'

আমি স্থির গলায় বললাম, 'হয়তো বাড়ি ভুল করেছে।'

'কিন্তু তোমার নাম-টাম বলল—একবার দেখবে নাকি?'

'কোনো মানে হয় না দেখা করবার।'

বললাম আমি স্পষ্ট স্থির গলায়।

কোনো মানে হয় না দেখা করবার।

কারণ আমি তখনই সেটা স্পষ্ট টের পেলাম, কোনো মানে হয় না দেখা করবার। দাদা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হরিচরণের গাড়ির আওয়াজ পেলাম। পরিচিত হর্ন।

আমি বললাম, 'আমি যাচ্ছি। বাড়ি ভুল করেছে সেটাই বুঝিয়ে দাও গে।'

হয়তো সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দাদার পক্ষে শক্ত হত, হয়তো ও কিছুতেই বুঝতে চাইত না। কিন্তু ওর ভাগ্যই ওকে বুঝিয়ে দিল, নিঃশব্দে সহজে, যে ভাগ্য ওকে বসবার ঘরে বসিয়ে না রেখে ফুটপাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

হয়তো গাড়িটাকে আসতে দেখেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, হয়তো শুধু শুধুই। স্থির থাকতে পারছি না বলে।

আমি ওর সামনে দিয়ে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। আমার কানে এক টুকরো গরম সীসে এসে ঢুকল। কিন্তু সেটা আমি কানে রাখব কেন? ও তো 'দেবী' বলল না, বলল 'বেবি'।

যে নাম সবাই ভুলে গেছে, আমি নিজেও ভুলে গেছি।

আমি দেবী। দেবী মা। মঠ থেকে নিয়মিত আমার জন্যে গাড়ি আসে, কারণ আমি সুরে সুর না মেলালে কীর্তনে প্রাণসঞ্চার হয় না। এর বেশি আর কি চাইবার থাকতে পারে জীবনে?

তেত্রিশ

আজ আর দেরি হয়নি।

হরিচরণ আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে। আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আরামদায়ক সিটে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছি। আর আমার ভয় নেই, কারণ আমি কুমিরের হাঁ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি।

এখন আমি শান্ত আর আত্মস্থ মহিমায় মঠের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে মালঞ্চ আর তুলসীবনের মাঝখানের কেয়ারি-করা পথটি ধরে নাট-মন্দিরের বাঁধানো চত্বরের পাশ দিয়ে অভ্যস্ত অধিকারের ভঙ্গিতে এগিয়ে যাব বিগ্রহের ঘরের পিছনে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাব বারান্দায়, মন্দির প্রদক্ষিণ করে এসে দাঁড়াব বিগ্রহের সামনে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আর এক জীবন্ত বিগ্রহ। যার পরনে গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়া রঙের দুধে-গরদের ধুতি-চাদর, যে চাদর খসে খসে পড়ে বার বার উদ্ভাসিত করে তোলে দীর্ঘোন্নত সুগঠিত দেহদ্যুতি। কপালে তাঁর চন্দনলেখা, গলায় আজানুলম্বিত গোড়েমালা, মুখে অলৌকিক করুণার হাসি।

এ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাব আমি? এর চেয়ে পরম পাওয়া আর কি আছে?

—ঃ ঃ—

বিবাগী পাখি • শুধু তারা দু'জন

নতুন প্রহসন

ততোধিক • দুই নায়িকা

কুমিরের হাঁ

Price : ₹ 125.00
ISBN : 978-81-7267-104-4
9 788172 671044
www.nirmalsahityam.com